প্রবাস বন্ধু

অবন্তী বঙ্গ, বয়স ১৬

শারদীয়া সংখ্যা ১৪৩১

১৪৩১ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : শারদীয়া সংখ্যা : 2024

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
গদ্য		
চার সন্তান নিয়ে দুর্গার রূপকল্পনার সুলুক সন্ধান	চিত্ত ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	4
কালের আবর্তনে শারদোৎসব	অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস (ফিনিক্স, অ্যারিজোনা)	8
রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	11
বৈষম্য-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	15
হিন্দু জাতীয়তাবাদ	সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	18
দেশী শব্দের বিলেত গমন	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	23
আত্মরক্ষার ত্রিশূল	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	25
কমল-সংবাদ অথ ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথা	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	28
অনির্দেশ্য নওয়েগাঁও নাগঝিরা	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	29
উৎসব	হেনা দাস (কলকাতা, ভারত)	40
বন সুন্দর ও মানুষগুলিও	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	41
হুইটস্টোন ব্রিজ	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	46
ঝিলম গাছের তলা	সিদ্ধার্থ সিংহ (কলকাতা, ভারত)	49
আন্নামা	শুভা আঢ্য (অস্টিন, টেক্সাস)	70
মহা নির্বাণের পথে	মৈত্রেয়ী সরকার (কলকাতা, ভারত)	74
মননে আসাম	অমিত কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	78
উড়ান	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	84
ফেলিদিদি	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	86
চিলেকোঠার আয়না	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	88
অমানিশা	নন্দিতা ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	90
ইচ্ছে হয়ে ছিলি	ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর, ভারত)	91
ঈশ্বর	সুকেশ সাহনী অনুবাদ: বেবী কারফরমা (কলকাতা, ভারত)	95
অরুন্ধতী	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	95
কান্নাফুল	মল্লিকা ব্যানার্জী (আমেদাবাদ, ভারত)	100
একটি আষাঢ়ে গল্প	সুশোভন অধিকারী (শ্রীরামপুর, ভারত)	104
টিভির খবর	শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় (ন্যাশভিল, টেনেসি)	106
ফেরা	আনন্দিতা চৌধুরী (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	108
গোধূলি বেলায়	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	111
প্রশ্নের তোপ	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	113
লালিমার হারজিত	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	117

অঙ্কন নব্যাণশা বিশ্বাস (বয়স ৯) (ফিনিক্স, অ্যারিজোনা) 3, 53, 69

কবিতা

আগমনী, অবিচার শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত) 53, 54
সোনালি স্মৃতি বাপন দেব লাড়ু (মেদিনীপুর, ভারত) 54
রাজনীতির সহজপাঠ, একাকিত্ব সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো) 55, 56
দেশের প্রশ্ন প্রদ্যুৎ কুমার গুপ্ত (লস্ অ্যাঞ্জেলস্, ক্যালিফোর্নিয়া) 57
অ মৃতকথা বিষ্ণুপ্রিয়া (ইউ এস এ) 58
দুঃসময়, শুনেছ কি শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত) 58, 59
সমুদ্রগুহা নূপুর রায়চৌধুরী (অ্যান আর্বার, মিশিগান) 59
বিচার সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস) 60
অহল্যা বান্ধবী প্রভাস দাশ (কলকাতা, ভারত) 61
কবিকে, নিষ্ক্রিয় উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস) 62, 68
পাহাড় আর আদি নিবাসী যমুনা বীনী নাদর (অরুণাচল প্রদেশ, ভারত) 63
অনুবাদ: বেবী কারফরমা (কলকাতা, ভারত)
মাতৃত্ব নারীত্ব ও লজ্জাবস্ত্র নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস) 63
মনসঙ্গীত ১, মনসঙ্গীত ২ অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস) 64, 64
ইচ্ছে হলে কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত) 65
ভালবাসার বীজগণিত অজয় সাহা (কলকাতা, ভারত) 65
রবীন্দ্র জয়ন্তী-১৪৩১, পিতার শংসাপত্র রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস) 66, 66
ভোরের দোয়েল পাখি পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত) 67
এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত) 67
ক্রোধ সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত) 68
দুর্গা এবার আসবেন না দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (মেদিনীপুর, ভারত) 69

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

অশ্বিন ১৪৩১, অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র:

অবন্তী বঙ্গ, বয়স ১৬

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

সহযোগিতায়: ঋত্বিক চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

আমরা অতীত দেখেছি | বর্তমান দেখছি | কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না; তাই নানান ভাবনায় ভবিষ্যতের ছবি আঁকার চেষ্টা করি | এ হ'ল সেই আশার আশা – সেটা যাতে আশামাত্র হয়ে না রয় তারই অভিলাষ |

মানব জীবন নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত, মানবই তার প্রতিকার করতে পারে; শুধু চাই সচেতনতা ও সহমর্মিতা | প্রকৃতিকে ভালবাসে না এমন মানুষ দেখা যায় না, তবে তাকে উপভোগ করার সঙ্গে আমাদের এক বিরাট দায়িত্বও আছে | আমরা যেন ক্রমাগত এটা-সেটার মাধ্যমে প্রকৃতিকে দূষিত করে না তুলি | প্রকৃতির দূষণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনও দূষিত করে তুলতে পারে; সেই সহজ কথাটা আমরা নিজেদের স্বার্থের কারণে ভুলে থাকি | দূষণ শুধুমাত্র দূষিত পদার্থ দিয়েই হয় না | সমাজে নারীদের সমান অধিকার এবং সম্মান না দেওয়া, তাদের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা, খেয়াল খুশিমতো তাদের ওপর অত্যাচার করা, অসহায় মানুষের সুযোগ নিয়ে সুবিধে-মতো নিজেদের সাধ মিটিয়ে নেওয়া – সে সবও অবশ্যই সমাজ-দূষণের পর্যায়ে পড়ে |

এমনকি গণ্যমান্য দেশেও নারীর নিজের শরীরের ওপরে কুটিল রাজনীতিবিদদের অধিকার বর্তাবে!

কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালের মধ্যে যে অমানবিক অত্যাচার এক নারীর শরীর নিয়ে হয়েছে সেই শাস্তির সীমা নির্ধারণ করা কি সম্ভব? কোন নিক্তি দিয়ে তার বিচার করা যাবে? সারা দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে এই নৃশংস আচরণ | ধিক্কার সেই অপরাধী আসামীদের! ছিঃ! সত্য যদি প্রকট হয়, একতা যদি অটুট থাকে তাহলে প্রমাণ লোপাটের যেমনই ব্যবস্থা করা হোক না কেন, অপরাধীরা লুকিয়ে থাকবে কতদিন!

আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় পৃথিবীতে দুখানা যুদ্ধ চলছে, সেখানেও নিরপরাধ মানুষ নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছে | ওয়ার ক্রাইম ঘটেই চলেছে একের পর এক – তারও কোনো প্রতিকার নেই | মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও বর্বরতা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে; এই সবের প্রতিকার অতি আবশ্যক |

দুর্গাপুজো আসছে – আমরা প্রচন্ড ধুমধামের সঙ্গে নারীরূপী, মাতৃরূপী দুর্গার আরাধনা করব, অথচ পাশাপাশি চলতে থাকবে নারীদের ওপর যথেষ্ট নির্যাতন! এর সুরাহা কোথায়? আমরা সাময়িকভাবে প্রতিবাদ করি ঠিকই, তারপর সময়ের কবলে ঢাকা পড়ে যায় সেই সচেতনতার ঢেউ | আবার যখন কোনও নারী নির্মমভাবে ধর্ষিত হবে বা অত্যাচারিত হবে তখন আবার উড়বে প্রতিবাদের ঝান্ডা! এটাই কি তবে সমাজের চিরস্থায়ী চিত্র! এই চোখ ধাঁধানো বৈষম্যের চিত্র যুগে যুগে আমাদের সামনে উঠে এসেছে, আমরা কি তাহলে বার বার এমন করেই হারতে থাকব! সাম্য যেখানে সামাজিক বিকাশের মূলমন্ত্র; সেখানে কেন এমন অযাচিত বৈষম্য! পুজো আছে, সে থাক; কিন্তু ন্যায় বিচার চাইই-চাই | এই কপটতা, ভণ্ডামি, দ্বিভাব সহ্য করা বা মেনে নেওয়া ঠিক নয় |

'সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার' এবং 'বঙ্গ বিভূষণ' সম্মানপ্রাপ্ত প্রয়াত কবি ৺শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪- ২০১৮) মহাশয়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল এই বছর | জন্ম শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল 'পদ্মশ্রী' ও 'দেশিকোত্তম' পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রয়াত স্বনামধন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষারদ ৺শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র-র (১৯২৪-২০১১) | এগুলি ছাড়াও আরো বেশ ক'টি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তাঁরা | তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সম্মান এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি |

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটির শিল্পী অবন্তী বঙ্গ, বয়স ১৬ | অবন্তী হিউস্টন বঙ্গ সমাজের অনলস সদস্য তথাগত (রাজা) ও দেবলীনা বঙ্গর কন্যা | অবন্তীকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাই |

পত্রিকায় যাঁরা সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই |

পত্রিকার পক্ষ থেকে সকলের জন্য শারদ শুভেচ্ছা রইল |

মালবিকা চ্যাটার্জী

{পত্রিকায় অনুল্লিখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে}

অসুরবিনাশিনী

শিল্পী: নব্যাণশা বিশ্বাস (বয়স ৯)

চার সন্তানসহ দুর্গার রূপকল্পনার সুলুকসন্ধান

চিত্ত ঘোষ

"Every myth is psychologically symbolic. Its narratives and images are to be read, therefore, not literally, but as metaphors."

Joseph Campbell

প্রতি শরতে মৃন্ময়ী দুর্গা আসেন তাঁর চার সন্তান লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক এবং সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু দুর্গার আদি কল্পনাতে কি এঁরা ছিলেন? একটু পিছনে যাওয়া যাক, অবশ্যই প্রাপ্ত ইতিহাসের পথে।

প্রথমেই যা উল্লেখ্য, তা হ'ল শিবের সঙ্গে শক্তির বিবাহের কল্পনা খুব একটা প্রাচীন নয়। কারণ এই কল্পনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য অংশে অনুপস্থিত। শিব সেখানে অন্য সব দেবতাদের মধ্যে একজন।

বর্তমানে মা কালীর পায়ের তলায় শিবের শয়ান, তা যে পালযুগে চামুণ্ডা বা নৈরাত্মার পায়ের তলায় থাকা শব থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে – সে তথ্যও সুপ্রতিষ্ঠিত।

তবে দুর্গা আদিমাতৃকা। পুরাণ মতে আবিশ্বের সবাই তাঁর সন্তান। তাঁর মধ্যে শিব স্বয়ং অন্তর্ভুক্ত। ব্ল্যাশফেমির জন্য সাধ করে মনগড়া তথ্য নয়, এর গূঢ় ইঙ্গিত পুরাণেই আছে। স্মরণে থাকতে পারে অ্যান্টনি কবিয়ালের গান ভোলাময়রার প্রতিস্পর্ধী রূপে। "যে শক্তি হইতে তোমার উৎপত্তি সে শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ!" তিনি মাতৃগমনকারী বলে ভোলাকে গাল পেড়েছিলেন কিন্তু তা ছিল পুরাণ ছেঁচেই। সে প্রসঙ্গে বিস্তারে না গিয়ে এখানে যা বলা যায় তা হ'ল হিন্দু পুরাণ কথক ও লিপিকাররা বর্ণাশ্রম প্রথা বাঁচিয়ে সবাইকে নিয়ে থাকার ও চলার সামাজিক প্রবণতা বজায় রাখার জন্য অনেক সময় অনেক রকম জোড়াতালি আর গোঁজামিল মিশেল দিয়েছেন। তারার কোলে শিব, এই বিবর্তনজাত মিশেলের একটা নির্দিষ্ট ল্যাণ্ডমার্ক। বারাসাতের চন্দ্রকেতুগড়ে এমন এক মাতৃকামূর্তি পাওয়া গেছে যেখানে রমনী মূর্তির কোলে দেখা মেলে একজন খর্বাকৃতি পূর্ণবয়স্ক রাজপুরুষের।

শিবের সঙ্গে শক্তির বিবাহের কল্পকাহিনী তৈরী করেছিলেন অবশ্যই কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য অংশে এ কাহিনীর বিন্দুবিসর্গ বিবরণ নেই। তথাপি ধর্ম সর্বত্রগামী।

বাংলা নববর্ষকে একমাত্র ধর্মমুক্ত মানবতাবাদী উৎসব এমন দাবী তুলে অধুনা একদল পশ্চিমবঙ্গীয় বিদ্যেবোঝাই বাবু-বিবিবৃন্দ ঢাকা বাংলাদেশকে কপি পেস্ট করে কলকাতায় নববর্ষের যে হুজুক আমদানি করছে তার সারবত্তাকে হেলায় উড়িয়ে দেয় সেই ধর্মীয় লোকাচার, যার আবর্তন বাংলায় পয়লা বৈশাখের নববর্ষ প্রচলনের পিছনে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব ও নীলাবতীর বিবাহের উৎসব ঘিরে। এর শুরুয়াত শশাঙ্ক অথবা জয়নাগের যুগে এই মর্মে কিছু গূঢ় ইঙ্গিত বঙ্গ ইতিহাসের নানা চর্চায় ধরা পড়েছে। ফলে বাংলা নববর্ষে যারা ধর্মমুক্ত বাঙালিয়ানা খুঁজতে হেদিয়ে উঠেছেন তাদের হাতে হিজিবিজি আঁকার জন্য থাকে শুধু সুকুমার রায়ের পেনসিল।

পুরুষ নারী নির্বিশেষে জীবমাত্রই প্রকৃতির সন্তান, সেই সুবাদে শিব ও নীলাবতীও প্রকৃতির অংশ এবং এদের বিবাহের উৎসবে কিছু দূরদর্শী সেই অনাগত সহজ আন্দোলনের পদধ্বনি পেয়েছিলেন যা পরবর্তী পালযুগে নাঢ়া ও নাঢ়ীর নেতৃত্বে আরও বিস্তৃততর হয়ে ছড়িয়ে পড়বে বঙ্গভূমি জুড়ে।

ধর্ম বাদ দিয়ে কোনও বৃহৎ সম্প্রদায় বা জাতি আদৌ সম্ভব কি? সংক্ষিপ্ত অভ্রান্ত উত্তর – না। বাঙালি কেন, পৃথিবীর কোনও জাতিই ধর্ম বাদ দিয়ে গঠিত হয়নি। বাঙালি জাতিকে ঐতিহাসিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় প্রকৃতিমাতৃকাধর্ম দিয়ে।

প্রসঙ্গে ফিরি –

মাতৃকা হলেন আদ্যা ও নিত্যা। তিনি প্রকৃতি, তিনি জগদকারণ; তাঁর কোনও কনসর্টের প্রয়োজন নেই, চেতন ও অচেতন, জীব ও জড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর থেকে সৃষ্ট, সবই তাঁর অংশ, তাঁর সন্তান। প্রকৃতি হলেন অব্যক্ত। অবাঙমনসগোচর। চতুর অতি সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণবর্ণ সংখ্যাগুরু নিরক্ষর মানুষকে তার স্বরূপ বোঝানোর জন্য তাকে মাতৃকারূপের খাঁচায় পুরে পুজোআর্চা শুরু করে। তারা বুঝেছিল এই মাটি বা ধাতু নির্মিত দেবীরূপ মাতৃভক্ত সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির গোচর। বলাই বাহুল্য সন্তানসহ মাতৃকারূপ সবসময় সব মানুষের কাছে এক গভীর স্নেহের আশ্বাস, প্রাণের আরাম। নাস্তিকদের প্রকৃতি নীরস নিরাকার এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সেই চিন্তা সমাজে শিকড় গাড়ার আগেই কাজে লেগে

গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ বর্গ। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতির ধারণা প্রখর রকমের বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী। তথাপি তাকে জ্ঞানমার্গ ও বুদ্ধি চর্চায় আটকে রেখে সাধারণ মানুষের কাছে ব্রাহ্মণ্য বৃত্তির দীর্ঘ সংরক্ষণের জন্য প্রকৃতিকে মাতৃরূপে গড়ে তোলা হ'ল। না হলে যে তাদের চলে না, পুজোর সময় কষা মাংসের বদলে প্রোটিন ট্যাবলেটে যেমন আমাদের চলে না। এর পর শুধু বিবর্তনের পালা। মনুষ্য মস্তিষ্ক থেকে ক্ষরিত কল্পনার রসে তার নানা রূপ পরিগ্রহণ।

বাংলায় প্রথম মহিষমর্দিনী মূর্তি পঞ্চম শতকে উত্তর বাংলাদেশে মহাস্থানের কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি সিংহবাহিনী নন। তাঁর চারটি হাত। এরপরের মহিষমর্দিনী অষ্টম শতকে উত্তরবঙ্গে বাণগড়ের কাছে পাওয়া গেছে, কিন্তু ইনিও সিংহ ছাড়া, তবে এঁর ছটি হাত। দুটি মূর্তিরই সঙ্গে সহচর, অনুচর বা সন্তান কেউ নেই। মহিষাসুরমর্দিনীর ইতিহাস জানাচ্ছে যে ভারতে হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই একটি "মহিষমেধ" উৎসব প্রচলিত ছিল (উল্লেখ্য, হরপ্পা সভ্যতার আগে এলামাইট সভ্যতায় এ জাতীয় উৎসব প্রচলিত ছিল, সেখানে মহিষের বদলে বৃষমেধ হতো)।

পালযুগে যখন সিংহবাহিনী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনীর উপাসনা শুরু হ'ল তখন মূর্তিতে মাতৃকা একক। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অষ্টভুজা এসে বাংলায় যে দশভুজা হলেন, তার পেছনে চন্দ্রকেতুগড় সভ্যতার দশায়ুধার ছায়া আছে বলে দাবী উঠেছে এবং তা সঙ্গত কারণেই। একইভাবে, মাতৃকার রূপ কল্পনা যে এরপর মধ্যযুগে সপরিবারে জনমানসপটে অঙ্কিত হবে, তার পেছনেও সুপ্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গারিডাই সভ্যতার মাতৃকা উপাসনার অবচেতন প্রভাব আছে প্রমাণ করা সম্ভব। কারণ এই সপরিবার মাতৃকার প্রথম পরিকল্পনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গারিডাই সভ্যতায় যে রূপ পরিগ্রহণ করেছিলেন তার সপ্রমাণ তথ্য পেশ করে দিয়েছেন। (প্রসঙ্গত পালযুগের মূর্তিরা বৌদ্ধতন্ত্র প্রভাবে চারজন যোগিনীসহ উপাস্য ছিলেন। এই ডাকিনী বা জ্ঞানী যোগিনী, হাঁকিনী বা ভৈরবী অর্থাৎ ভয়াবহ হাঁক দিতে পারতেন যে যোগিনী, শাকিনী বা শঙ্খিনী বা সুবেশা যোগিনী এবং লাকিনী বা রঙ্কিনী অর্থাৎ চর্চিকামূর্তিতে যিনি ভয়ানক জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুধাতুরা। অর্থাৎ চার সহচরসহ মাতৃকার উপাসনার একটা ফরম্যাট পালযুগে ছিল যদিও, তা দুর্গার নয়, তারার)। চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া সেই চার সন্তানসহ মায়ের অপরূপ ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি, বঙ্কিমের ভাষা ধার করে বললে, মা যা ছিলেন, সেই ছবি গুগুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায়।

শুধু একটি বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: গুগুলের তথ্যভান্ডারে মাথা ঢোকাবার আগে মনে রাখা দরকার আন্তর্জালকে অন্ধবিশ্বাস করলে বিপদ পদে পদে। বিভ্রান্ত করার মতো প্রচুর মশলার ভুবনজোড়া হাটে এমন সব প্রিফ্যাব্রিকেটেড অভিমত বিকোয়, যা দিয়ে ট্রুথের মেকআপে পোস্ট ট্রুথের চাষ আবাদ হয় জোর কদমে। লিখিত প্রায় প্রতিটি ধর্ম তার টেক্সটের প্রকৃত প্রতিপাদ্য থেকে সরিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কাজটা আগেও হতো, কিন্তু তার গতি ছিল বেশ ঢিলে। গুগুল নামক সার্চ এঞ্জিনের দৌলতে তা এখন আলোর গতিতে ছড়াচ্ছে। রাজনীতি, বিশেষ করে ডানপন্থা তাতে খুল্লাম খুল্লা সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ইন্ধন জুগিয়ে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে এক মারণযজ্ঞ থেকে অন্য মারণযজ্ঞে জড়িয়ে দিচ্ছে। বহু দৃষ্টান্তের অন্যতম বর্তমান ভারতের শাসককুলের বেশরম মদতে রাম ও গরুড় নামে হিন্দু, হিন্দি, হিন্দুত্বের ভৈরব নৃত্য। তাদের পোষ্য জনতার ইনডক্ট্রিনেটেড গ্রে ম্যাটারে কে ঢোকাবে বিষ্ণু পুরাণের সেই অমোঘ শ্লোক, "বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।" সহজ বাংলা বা হিন্দিতেও মানেটা এক – ভারতে যারা বাস করে তারা ধর্ম, বর্ণ, জাত নির্বিশেষে ভারতের সন্তান। মা 'দুর্গা'র সন্তান কল্পনাতেও তারই প্রভাব।

উৎসবমুখর শারদীয়ায় স্মরণ করতে ও করাতে চাই যে, ষোড়শ শতকের আগেই গৌড়বঙ্গে সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশপ্রহরণধারিণী মাতৃকার এই সন্তানসহ শারদীয়া উপাসনা শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে, কারণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে মা দুর্গার মূর্তি এভাবে কল্পিত –

"বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর। বৃষ আরোহণ শিব মস্তক উপর। দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী। পরম পুলকে দেবগণ করে স্তুতি।" অর্থাৎ কার্তিক গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী নিয়ে এই যে রূপকল্পনা, সেটা মধ্যযুগে শুরু।

দুর্গার বাঁদিকে ধনদাত্রী লক্ষ্মী এবং ডানে জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী কন্যারূপে পরিচিত হলেও মনুবাদী শাস্ত্রপ্রভাবিত পুরাণ ও লোকবিশ্বাস অনুসারে তারা নাকি আদি শক্তির ভিন্ন ভিন্ন

প্রকাশ। আদি শক্তি তিন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন – সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মার জ্ঞানশক্তিরূপে সরস্বতী, পালনকার্যে বিষ্ণুর পালনকারিণী শক্তিরূপে মহালক্ষ্মী এবং সংহারকার্যে শিবের প্রলয়কারিণী শক্তিরূপে মহাকালী, যিনি দুর্গা থেকে অভিন্ন। এমতানুসারে দেবী দুর্গা স্বয়ং বিষ্ণুশক্তি মহালক্ষ্মীর প্রকাশ। তাই তাঁর মন্ত্রে নারায়ণী, বৈষ্ণবী শব্দের পুনঃ ব্যবহার। দুর্গাপূজার আবশ্যকীয় অঙ্গ হ'ল শালগ্রামশিলা বা নারায়ণশিলার অর্চনা। নারায়ণশিলা পূজা না করে ব্রাহ্মণরা দুর্গাপূজা করেন না।

দুর্গার বামে লক্ষ্মীর সাথে আছেন সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহর্তা গণেশ এবং ডানে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক দেবসেনাপতি কার্তিক। বেদউত্তর ধর্মচর্চায় চারজন দেবতা হয়ে উঠেছিলেন সমাজের চারবর্ণের প্রতীক – সরস্বতী বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী ও সত্ত্বগুণস্বরূপিণী তাই ব্রাহ্মণগণের প্রতীক। বীরত্ব ও তেজের প্রতীক কার্তিকেয় ক্ষত্রিয় শক্তির প্রতিনিধি। দেবী লক্ষ্মী অন্ন, শস্য, সমৃদ্ধি ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ বৈশ্যদের দ্বারা সম্পাদিত কৃষিকাজ ও ব্যবসার মাধ্যমে করা কাজের অধিশ্বরী। বাকি থাকল গণপতি গণেশ, যিনি গণদেবতারূপে শ্রমিকশ্রেণী বা শূদ্রদের গোষ্ঠীপতি। হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্থ ভাবনায় যে এক ধরনের সমন্বয়ী রসায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার সংকেত চার বর্ণের প্রতিনিধি এই চার দুর্গা সহচর।

কিন্তু বেদ ও সমকালীন হিন্দু স্ক্রিপচার বা সেক্রেড টেক্সটের কোথাও দুর্গার এমন বর্ণনা নেই। যেমন বেদের দেবীসূত্রে আছে – "অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাম চিকিতুষী যজ্ঞিয়ানাম / তাং মা দেবা ব্যাদধূ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্।" অর্থাৎ আমি জগতের ঈশ্বরী, ধনপ্রদায়িনী। আমি পরম ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁদের যজ্ঞ করা হয় তাঁদের মধ্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠা। বর্ণিত এই রুদ্রশক্তি কালে কালে পরমা দুর্গাতে রূপান্তরিত হলেও তার সঙ্গে থাকা চার সহচরকে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনায় সবকটি বর্ণের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল বলে অনেকে দাবী করেন। দাবীর পুরোটাই অযৌক্তিক বলা যাবে না।

যাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবনায় স্থিত তাঁদের ব্যাখ্যায় দেবীর পদতলে যে মহিষাসুর শূলবিদ্ধ অবস্থায় আছে, দেবীর বাহন সিংহ যাকে কামড় দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করছে সে মনুষ্যমনের আসুরিক প্রবৃত্তির প্রতিরূপ আর পশুরাজ সিংহ সেই মনের বিপ্রতীপ প্রতীক। অধ্যাত্মবাদীরা পশুরাজ সিংহরূপী মনের উপর ধর্মরূপী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন মনের অসুররূপী দানবিক প্রবৃত্তিগুলোকে ত্রিশূলাঘাতে বিনাশ সাধনের রূপক হিসাবে।

কিন্তু বেদ বেদান্ত ও উপনিষদ (যদিও বেদান্তের অংশ) নিয়ে বেবি বুমার, মিলেনিয়াল থেকে টেক সর্বস্ব প্রজন্মের কে আর মাথা ঘামায়। এক্সট্রা কারিক্যুলার জ্ঞান লাভের জন্য তারা আগে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ধর্মব্যবসায়ীদের কথা শুনত, এখন তাদের প্রায় সবাই জড়ো হয়েছে ভুবনগাঁ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিভার্সিটিগুলোতে। সেখান থেকে মাথায় জ্ঞান গুঁজে অতি পন্ডিত, যারা বেদকে ঢাল বানিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও নিজমত প্রতিষ্ঠা করতে নানারকম ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে, বলা ভাল নেবার সুযোগ পাচ্ছে। কারণ বিংশ শতাব্দী উত্তর হিন্দুসমাজে বেদ তো দূরের ব্যাপার, গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থ নিয়ে সীমিত অ্যাকাডেমিক চর্চা ছাড়া সাধারণ্যে কোন কৌতূহল নেই; ফলে তাদের অনায়াসে বিভ্রান্ত করে নিজ মতে দীক্ষিত করা খুব সহজ। বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতার ঢালাও প্রশ্রয়ে এই প্রচারক সম্প্রদায় বেদকে কেন্দ্র করে নানারকম অপপ্রচার, অর্ধসত্য, অর্ধশ্লোক ও বিকৃত অর্থ বোঝাই করে রামকেন্দ্রিক সনাতন ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে প্রবল বিক্রমে।

এখন দেখা যাক বেদে কী আছে –

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে –

"তাং অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম,
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরমে নমঃ।"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক-১০/২)

অর্থাৎ অগ্নিবর্ণা তপ প্রদীপ্তা সূর্য, (বা অগ্নিস্বরূপিণী) যিনি কর্মফলের প্রার্থিত হন, সেই দুর্গাদেবীর আমি শরণাপন্ন হই, হে সুন্দররূপে, ত্রাণকারিণী, তোমাকে নমস্কার।

ঋগবেদে দেবীসুক্ত যা দুর্গাপূজায় চন্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ করার বিধি আছে, সেখানে দেবীকে পরমা প্রকৃতি, নির্বিকারা ও জগতের ধাত্রীরূপে বর্ণিত আছে।

সমস্ত দেবতার তেজ হতে দেবীদুর্গার আবির্ভাবের পর দেবী দুর্গা দেবতাদের ঋকমন্ত্রে নিজের পরিচয় দিলেন বলে দেবী পুরাণে উল্লিখিত আছে; আর সেই ঋকমন্ত্রই হ'ল ঋগবেদের দেবীসুক্ত। এছাড়া বেদের রাত্রিসুক্তে কালী, শ্রীসুক্তে

লক্ষ্মী এবং বাণীসুক্তে সরস্বতীর বন্দনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেদ দেবতাদের মহিমাতে রূপ ও পূজাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আর বেদকে স্বীকার করলে পুরাণকেও স্বীকার করতে হবে। কারণ, বেদ এবং বেদান্ত নিজেই পুরাণকে স্বীকার করেছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে – 'ইতিহাস ও পুরাণসমূহ হ'ল পঞ্চম বেদ। অথর্ববেদ বলছে "ইতিহাসস্য চ বৈ পুরাণস্য চ... ।" যেহেতু বেদ পুরাণকে শাস্ত্র বলে স্বীকার করেছে, তাই পুরাণ মতেই দেবী দুর্গার রূপ ও পূজাপদ্ধতি প্রণীত হয়েছে। আবারও যদি বৈদিক ধারায় চোখ রাখা যায় শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় মিলবে অম্বিকাদেবীর সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালীর কথা কিংবা কেন উপনিষদে দেবী উমার কথা, যারা দেবী দুর্গারই অপর নাম হয়ে উঠেছে।

যাজ্ঞিকা উপনিষদেও দুর্গার গায়ত্রী আছে – "কাত্যায়নার বিমতে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।" এখানে দুর্গা সম্বোধন পদে দুর্গি হয়েছে। এতে কাত্যায়নী বা কন্যাকুমারী দুর্গার অপর নাম তা বলাই বাহুল্য। এছাড়া গোপাল তাপনী উপনিষদ, নারায়ণ উপনিষদ ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থেও দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেবীভক্তদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আদ্যাস্তোত্রে প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে "যঃ পঠেৎ সততং ভক্তা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ।" অর্থাৎ, যিনি আদ্যাস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষ্ণুর প্রিয় হন। সেখানে আরো বলা হয়েছে – "বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা, সুখদা মোক্ষদা সদা"– অর্থাৎ, দেবী দুর্গা বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী। অর্থাৎ বিষ্ণু বা কৃষ্ণভক্তি দান করাটাই দেবীর কৃপার চরম পর্যায়। শ্রীশ্রী চন্ডীতেও তাই উল্লেখ আছে – "যা দেবী সর্বভূতেষু ভক্তি রূপেণ সংস্থিতা।" তিনিই জীবের মধ্যে ভক্তিরূপে বিরাজ করেন। চৈতন্য ভাগবতে (মধ্যখন্ড ১৬৬.১৭০) মহাপ্রভু যখন দেবী দুর্গার আবেশ নেন, তখন ভক্তগণ দেবীর স্তুতি করে বলেন –

"জগৎস্বরূপা তুমি, সর্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা তুমি বিষ্ণুভক্তি।"

ভক্তি স্ত্রী গুণ মনে করা হয়, তাই আমরা বলি ভক্তিদেবী।

দেবী দুর্গার বৈষ্ণবী নামের অর্থ শ্রীশ্রী চন্ডীতে বলা হয়েছে –

"যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

যে দেবী সর্বভূতে (সর্বজীবে) বিষ্ণুমায়ারূপে বিরাজ করেন, তাঁকে বারংবার নমস্কার।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখন্ডে দুর্গা সম্পর্কে (৫৭/২১) বলা হয়েছে –

"বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপিণী।
সৃষ্টৌ চ বিষ্ণুনা সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্তিতা।"

যিনি বিষ্ণুভক্তা, বিষ্ণুরূপা এবং বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী, বিষ্ণুকর্তৃক সৃষ্টিকালে সৃষ্টা হন, তিনিই বৈষ্ণবীরূপে আহূতা হন; অর্থাৎ, তিনি বিষ্ণুর শক্তি ও বিষ্ণুর পরম ভক্ত হবার কারণে তাঁকে বৈষ্ণবী বলা হয়। এজন্য শ্রীশ্রী চন্ডীতে বলা হয়েছে – "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি অনন্তবীর্যা, বিশ্ববীজস্য পরমাসি মায়া।" আবার, তাকে পরমা প্রকৃতি বলা হয়, কারণ তিনি পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের প্রকৃতি। নারায়ণের প্রকৃতি বলেই তিনি শ্রীশ্রী চন্ডীর বহু শ্লোকে নারায়ণী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। এখানে লক্ষণীয়, যদি শিবই পরম পুরুষ হতেন, তাহলে পরমাপ্রকৃতিকে নারায়ণী না বলে শিবানী নামের আধিক্য থাকত। এমনকি দেবীর প্রণাম মন্ত্রেও আমরা দেখি –

"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমঃস্তুতে।"

ভারতে কাশ্মীরের হিমালয়ে ত্রিকূট পর্বতের গুহায় দেবী দুর্গার অতি প্রসিদ্ধ এক মন্দির 'বৈষ্ণোদেবীর মন্দির', যেখানে দেবী দুর্গা বৈষ্ণবী নামে খ্যাত। এখানে দেবীর এরূপ নামকরণের কারণ এখানে দেবী দুর্গা বিষ্ণু-স্বরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের ধ্যানে রত রয়েছেন। দেবীর ধ্যানে যেন বিঘ্ন না হয়, সেজন্য প্রভু শ্রীরামের পরমভক্ত হনুমানজী সর্বদা সেখানে অবস্থান করেন। নবরাত্রি পূজার সময় সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ শক্তি উপাসকগণ দেবী মায়ের দর্শনার্থে সেখানে সমবেত হন।

মধ্যযুগে প্রথম চার সন্তানসহ মা দুর্গার টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া যায়। পন্ডিতদের অনুমান, সিংহসহ মহিষমর্দিনী মূর্তি এসেছে সপ্তম শতাব্দী থেকে। অর্থাৎ, বুদ্ধযুগ থেকে হিন্দুযুগে প্রত্যাবর্তনের গোড়ার দিক থেকে মহিষমর্দিনী মূর্তি আস্তে আস্তে সিংহবাহিনী হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের মহাস্থানের কাছে পাওয়া ছোট পাথরের ফলকে খোদাই করা আনুমানিক পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর দেবীমূর্তিই বঙ্গদেশে পাওয়া প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী মূর্তিরূপে স্বীকৃত। মহাস্থান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত

ওই চতুর্ভুজা মূর্তির দক্ষিণপদ মহিষের মস্তকে রাখা, উপরের প্রধান দক্ষিণহস্তে খড়্গ, প্রধান বামহস্তে মহিষের পুচ্ছ ধরা, অপ্রধান দক্ষিণহস্তের শূল বিদ্ধ করছে মহিষকে এবং অপ্রধান বামহস্তে রয়েছে খেটক বা ঢাল। সেই মূর্তিতে সিংহ অনুপস্থিত। ধারাবাহিকতার বিচারে পরবর্তী মূর্তিটি অষ্টম শতাব্দীর। পাওয়া গিয়েছে গঙ্গারামপুরে। এই অঞ্চলটি বাংলার অন্যতম প্রাচীন প্রত্নক্ষেত্র বাণগড়ের নিকটবর্তী। এখানকার ষড়ভুজা মূর্তির হাতে যে আয়ুধ বা অস্ত্রগুলো রয়েছে তার মধ্যে ত্রিশূল, বাণ এবং ধনুকে চিহ্নিত করা যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানে পাওয়া মূর্তির মতোই বঙ্গদেশে পাওয়া মূর্তিগুলিও মহিষমর্দিনী এবং সিংহবাহিনী রূপে বিভক্ত। প্রাচীনকাল থেকে অন্তত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ওই দুই রূপের মূর্তিই পুজো করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবত আরও পরে ওই দুই রূপের মূর্তি মিলেমিশে সিংহবাহিনী-মহিষমর্দিনী মূর্তি তৈরি হয়েছে।

এনামুল হকের বাংলার মহিষমর্দিনী মূর্তির তালিকা থেকে জানা যায়, বাংলায় চর্তুভুজ থেকে দ্বাবিংশভুজা মোট ৬৯টি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তাদের ভিতর অষ্টভুজা ২৮টি, দশভুজা ২১টি। মূর্তিগুলির অধিকাংশই মহিষমর্দিনী। সিংহবাহিনী সংখ্যায় মাত্র দশটি। তবে ওইসব মূর্তির সবই পাথরের তৈরি। এবং ওই সমস্ত মূর্তির সঙ্গে কোথাও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের মূর্তি যোগ করা নেই। এই ঐতিহাসিক অন্বেষণ যে ইঙ্গিতে থিতু হতে চায় তা হ'ল মূল দুর্গামূর্তির সঙ্গে ওই সমস্ত মূর্তি যোগ করা হয়েছে মাটির তৈরি প্রতিমা তৈরির যুগে এবং সম্ভবত সেটা বাংলার মধ্যযুগের আগে হয়নি। যদি ধরে নেওয়া যায়, কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' অনুসরণে বাংলায় দুর্গাপুজোর ব্যাপ্তি ঘটেছে তবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের পর থেকে দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের প্রতিমাও একচালার মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু স্মরণে রাখুন, চন্দ্রকেতুগড়ের এই সপরিবার/সানুচর/চার সহচর পরিবেষ্টিত মাতৃকামূর্তি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের, আজ থেকে মোটামুটি একুশশো বা বাইশশো বছর আগেকার।

কালের আবর্তনে শারদোৎসব

অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

আমরা এমন একটি প্রজন্ম যারা সভ্যতা, পৃথিবী ও জীবনচর্যার কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তনের সাক্ষী। যারা আশি এবং নব্বই দশকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেছি, তারা একসময়ে দেখেছি মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমনির্ভর একটি সংঘবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা... আবার আজ আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সোশ্যাল মিডিয়া ও চ্যাট-জিপিটির ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতারও সাক্ষী। প্রতিনিয়ত পরিবর্তন যেন ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে আর মধ্য ত্রিশ-চল্লিশের মানুষ জীবনের সেই সুতো হাতে দাঁড়িয়ে আছি, যা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরেও কত না জানি যুগান্তকারী পরিবর্তন, ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে এখনো অটুট ও নিবিড়। চরৈবেতি এই জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করা সীমিত জায়গায় অসম্ভব। আজ দেবীপক্ষের প্রাক্কালে আমরা বাঙালির হর্ষ-বিষাদের, স্বপ্ন দেখার, আশা ভরসার প্রধান উৎসবের কথাই বলব। কালের সরণি বেয়ে মা দুর্গার আরাধনা কেমন করে ও কীভাবে বনেদি বাড়ির গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বায়নের সঙ্গী হয়ে উঠল, তেমনই একটু ফিরে দেখা এই লেখায়।

কথিত আছে, দিনাজপুর ও মালদার জমিদাররা বাংলায় ১৫০০ সালের শেষ দিকে সর্বপ্রথম দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেন। অন্য সূত্রে পাওয়া যায় ১৬০৬ সালে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ অথবা নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার শারদীয়া দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করলে দেখা যায় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর বিজয় উদ্‌যাপনে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং শোভাবাজার রাজবাড়ির নবকৃষ্ণদেবের হাত ধরে এই পুজোর সূচনা। জমিদার বাড়ির সাবেকি পুজো থেকে হাজার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের সর্বজনীন – থুড়ি, 'বিশ্বজনীন' হয়ে ওঠা ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়! একসময় সাধারণ মানুষের জন্য পুজোর দ্বার উন্মুক্ত ছিল না, আর আজ এই আনন্দ-উৎসব সর্ব-ধর্ম-বর্ণ-দেশ নির্বিশেষে এক মহামিলন উৎসব। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মা দুর্গার চালচিত্রের বর্তমান যে রূপ, যেখানে দশভুজা দেবী চার সন্তানসহ সপরিবারে বিরাজমান – এই চালচিত্র প্রথম ব্যবহৃত হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরেই। সম্ভবত, গাঙ্গেয় বঙ্গদেশেই

প্রথম চারদিনের পুজোর চল হয়। এর একটি বিশেষ কারণ আছে – গঙ্গার তীরের মাটি দিয়ে চিন্ময়ী মায়ের অনিন্দ্য সুন্দর মূর্তি তৈরি করা যায় এবং যেহেতু মাটির তৈরি মূর্তি বেশিদিন রাখা যায় না, তাই তাকে আবার গঙ্গার জলেই বিসর্জনের প্রথা চালু হয়। বাকি ভারতে দেবতার মূর্তি পাথর বা ধাতু নির্মিত হলেও এবং নয়দিন ধরে নবরাত্রি উদ্‌যাপন হলেও বঙ্গদেশে মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তির চারদিনের পুজোই প্রচলিত হ'ল।

১৭৯০ সালে হুগলির গুপ্তিপাড়ার বারোজন যুবক চাঁদা তুলে একসাথে দেবীর আরাধনা করেন। 'বারো ইয়ারি' কথা থেকেই 'বারোয়ারি' শব্দের প্রচলন। কাশিম বাজারের রাজা হরিনাথ ১৮৩২ সালে মুর্শিদাবাদের পৈতৃক ভিটের পুজো কলকাতায় নিয়ে আসেন। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে সর্বসাধারণের জন্য দুর্গাপুজো করেন। ১৯১৯ সালে বাগবাজারে সার্বজনীন পুজোর সূচনা হয়। এর কিছুদিন পরেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ১৯২৬ সালে 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' সকলের জন্য আয়োজন করল দুর্গোৎসব। এই সময়েই বাঙালির সার্বজনীন দুর্গাপূজা স্বদেশী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই জাতীয়তাবাদী মানসিকতার খানিকটা আভাস মেলে। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরে দিল্লিতে ১৯১০ সালে প্রথম দুর্গাপূজা শুরু হয় দিল্লি দুর্গাপূজা সমিতির উদ্যোগে। এভাবেই ধীরে ধীরে মা দুর্গা অভিজাতের কোল ছেড়ে বাংলার ঘরের মেয়ে হয়ে গেলেন।

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মা দুর্গার রূপের পরিবর্তনও তাৎপর্যপূর্ণ। শোলার সাজ ও ডাকের সাজ, এই দুই প্রকার সনাতনী সাজ প্রধানত জনপ্রিয় ছিল। আজকাল অবশ্য অভিনব থিমের কারিগরির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। শিল্পীদের সুচারু প্রতিমা ও মণ্ডপ সজ্জাকে কেন্দ্র করে ক্লাবে ক্লাবে পুজোর লড়াই এক বহুচর্চিত বিষয়। পুজো আসার নির্ঘন্ট এলে যেন বাঙালির জীবনটাই পাল্টে যায়। প্যান্ডেলের বাঁশ ফেলা, শপিং মলে গিজগিজে ভিড়, গড়িয়াহাট-হাতিবাগানে ততোধিক চেঁচামেচি করে দরদাম, নতুন ছাপানো পুজোসংখ্যার পাতা উল্টানো আর মায়ের নাড়ু তৈরির আপডেট নেওয়া... এমনিভাবেই এক একটা দিন কাটে; পুজো আসছে! বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠা খুশির আবেগ – এতেই মা দুর্গার বাপেরবাড়ি আসার সার্থকতা। আমাদের বাংলায় পুজো মাত্র পাঁচদিনের নয়; পুজো ঠিক ততদিনের – যখন থেকে কুমোরটুলিতে খড়ের উপর মাটির প্রলেপ লাগানো শুরু হয় আর শিল্পীর ঘরে বায়নার টাকায় ছেলের স্কুলের মাইনে দেওয়া হয়। পুজো ঠিক ততদিনের, যখন সারা বছর অপেক্ষার পর ঢাকীর দল মন্ডপের

শিল্পী: অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, যখন গ্রাম-শহরের কাপড়ের দোকানি খুশি চোখে সারাদিনের লাভের হিসেব কষে, যখন বাড়ির কাজের মাসি, দারোয়ান, ড্রাইভার পুজোয় বাড়তি বকশিশ পায়, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা এই উৎসবকে ঘিরে করে-খেয়ে বাঁচে, বাড়ির মানুষকে আরেকটা বছরের জন্য গরম ভাত সুনিশ্চিত করে; পুজো ঠিক ততদিনের। পুজো সারা বছরের আশায় বুক বাঁধার। মফস্বল হোক বা মহানগরী কলকাতা, মা দুর্গার পুজো যেন শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় উৎসবের গন্ডিতে আটকে থাকে না, বাচ্চা-বুড়ো, গরিব-বড়লোক, হিন্দু-মুসলমান, রাজনৈতিক-উদারবাদী, গোঁড়া-সাংস্কৃতিক, পুরনোপন্থী-আধুনিক সকলেই মত-পার্থক্য ভুলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। পুজো-পার্বণ, উৎসব-উদ্‌যাপন তো পৃথিবীর সব প্রান্তেই হয়... আমাদের দেশে মহারাষ্ট্রের গণপতি বাপ্পা থেকে সাউথের তিরুপতি – আরাধনার সুবিশাল আয়োজন সব জায়গাতেই। কিন্তু একটি ধর্মীয় উৎসবকে যে এই মাত্রার শিল্প পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এমন বিপুল শ্রেণীর মানুষের সাপোর্ট সিস্টেম করে তোলা যায়, তা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বে একমেবদ্বিতীয়ম।

সেকালে বাবুদের পুজোয় জলসা বসত। সার্বজনীন পুজোতে তারই রেশ ধরে পুজোর সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজিত হতে থাকে। আরও পরে শুরু হয় শারদীয়া উপলক্ষ্যে পুজোর গান রেকর্ড করার চল। আজও শারোদোৎসবে সাংস্কৃতিক চর্চার ধারা অব্যাহত। দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে শিল্পীরা আমন্ত্রিত হন পুজোর নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। আজকাল সিনেমা তারকাদের দিয়ে প্রথমা-দ্বিতীয়াতেই পুজোর উদ্বোধন

করা হচ্ছে। পুজো উদ্‌যাপনের অভিনব আঙ্গিক, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মুহূর্তের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে নিরন্তর। ঐতিহ্য-পরম্পরার এই নির্যাস আরো দূর দূরান্তে আনন্দে, অনুভবে ও উৎফুল্লতায় বিকশিত হয়ে চলেছে। সত্যি কথা বলতে কি, অতি গোঁড়া প্রকৃতির মানুষও স্বীকার করতে বাধ্য যে আজ এই ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, ইনস্টাগ্রামের দৌলতে দেশ-কাল-সীমার সব গন্ডি মুছে গিয়েছে।

এখনো প্রচুর সংখ্যায় পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয়; তবে বহু ক্ষেত্রে আজকাল অনলাইন ভার্সনটাই বেরোয় | যাঁরা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে স্বচ্ছন্দ, তাঁদের জন্য অসুবিধাজনক হলেও অনেক বেশি মানুষের পত্রিকা পড়ার সুযোগ অধিগম্য হয়েছে; ঠিক যেমন আমাদের 'প্রবাস বন্ধু'।

পুজোর দিনগুলোয় বাঙালির রসনা নিবারণে নিরামিষের সঙ্গে আমিষ খাবারও আজকাল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে | পুজো, মন্ডপসজ্জা, ফ্যাশন, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতিচর্চা এই সব কিছুতেই নিত্য নতুন আধুনিক ট্রেন্ডের প্রভাব লক্ষণীয়। বড় বাজেটের পুজোগুলো বেশিরভাগই স্পন্সরশিপের মহিমায় পুরোপুরি কমার্শিয়ালাইজড্। পারিবারিক পুজোর ঐতিহ্য অনিবার্যকারণ-বশত এখন অনেকটাই ম্লান। আমাদের সময়ে পাড়ার দাদারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করত। মোড়ে মোড়ে তখন কিশোর কুমার না হয় আশা ভোঁসলের রোমান্টিক গানের কলি বাজত; বিজ্ঞাপনের ভিড়ে পাড়া ঢেকে যেত না | আকাশের দিকে তাকালে দেখা যেত ঘন নীল সমুদ্রে দুধসাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ভেলা ভেসে চলেছে। মা দশভুজা যেন ততক্ষণে কৈলাস ছেড়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপেরবাড়ির পথে পা বাড়িয়েছেন। এই সঙ্গে যাঁদের কথা না বললেই নয় – পাড়ার গম্ভীর জ্যেঠু, ব্যাচেলর দাদা, গাছকোমর করে আঁচল জড়ানো মাসিমা... সবাই মিলে দল বেঁধে ঠাকুর আনা থেকে শুরু করে ভোগ রান্না, অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ, দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন সবকিছু সুচারুভাবে সামলাতেন! এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞটি অনায়াসে উৎরে দিতে যাঁদের জুড়ি মেলা ভার, সেই মানুষরা ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছেন প্রবল আধুনিকতার আবহে।

আমরা যারা মফস্বল, গ্রাম, শহরতলিতে বড় হয়েছি তাদের কাছে পুজোর স্মৃতি অন্য রকমের, অনেকটা সাদা-কমলা শিউলির সামিয়ানার রঙের মতো। পুজোর ঠিক আগেই হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা শেষ হতো। মহালয়ার ভোরে গোটা পাড়াজুড়ে গমগম করত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মন্দ্রিত কণ্ঠস্বর – "ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"..., বাবা, কাকার তর্পণ শেষে বাড়ি ফেরা, মা, কাকিমার মুড়কি-নাড়ু তৈরির সুবাস, দর্জির দোকানে ছিট কাপড় নিয়ে লাইন দেওয়া এসব মিলিয়ে মিশিয়েই পুজো এসে পড়ত। পুজোর খাবার মানেই ছিল ভোগের খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি, পায়েস। তার সাথে বিকেলে মন্ডপে ঘুরতে ঘুরতে ফুচকা, এগরোল, মাংসের চপ। নবমী মানেই পাঁঠার মাংস আর ভাত। শেষ দিনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কুঁচো নিমকি, গজা, ঘুগনি, জিলিপি পেটপুরে খেয়ে বিজয়ার প্রণাম সেরে আসা। পুজো স্পেশাল বুফে প্যাকেজ তখনো হেঁসেলের মনকাড়া গন্ধটাকে কেড়ে নিতে পারেনি।

কালে কালে মানুষের রুচি বদলায়। ঋতু বদলায়, যেমন – আমাদের ছোটবেলায় ভোরের কুয়াশা, শীত শীত ভাব জানান দিত পুজো এসে গেছে। এখন সম্পূর্ণ বিপরীত – সারা বছরই গরমের প্রকোপ। শরৎকালেও পশ্চিমবঙ্গে গলদঘর্ম অবস্থা, সেইসঙ্গে লোকসংখ্যাও বিপুল হারে বেড়েছে। অতিমারীর পরে সমস্ত কিছুই যেন ছন্দ থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল – এখন আবার তাল ফিরছে একটু একটু করে। আবার আলোর মালায় সেজে উঠছে রাস্তাঘাট, আবার ধুনুচির ধোঁয়ায় ও ঢাকের বোলে মেতে উঠছে শহর। কাল হোক বা আজ, এই প্রাণঢালা উৎসবের একটি নিজস্ব রঙ ও গন্ধ আছে... তা কোনোদিনও পুরনো হয় না। সিঁদুররাঙা বরণডালা, কোলাকুলির উষ্ণ বন্ধন, অঞ্জলির ফুল, কাশফুলের হাতছানি, জলে ভেসে যাওয়া মায়ের মুকুট – এই সবকিছুর মাঝেই দেবীপক্ষ আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে ও থাকবে।

শিল্পী: অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

শেলী শাহাবুদ্দিন

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত যে রবীন্দ্রনাথের লেখা, তা শুধু রবীন্দ্র রচনার মেধার জন্য নয়, বাঙালির আত্মার সাথে রবীন্দ্র চেতনার বন্ধনের গভীরতা তার মূল কারণ। ধর্ম, সীমান্ত, আর রাজনীতি যতই জাতের মেকি দেয়াল তৈরী করে থাকুক না কেন সকল দেশেই মৌলবাদী ছাড়া আর প্রায় সকল বাঙালির সাংস্কৃতিক মনন একই সূত্রে গাঁথা। আমি তাঁদের কথা বলছি। মুসলমানপ্রধান পূর্ব পাকিস্তানে এবং তারপরে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী প্রশাসন ও মৌলবাদীদের অবিশ্রান্ত বাধা ও আক্রমণ সত্ত্বেও কীভাবে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মুসলমানের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন, আমি তার কথা বলছি।
নজরুল এবং আরো সব বাঙালি কবিও বাঙালির আত্মার অংশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন ঐতিহাসিকভাবে।

আমার শৈশব কেটেছে কাকা-কাকিমার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে। আট বছর বয়স পর্যন্ত আমি কবি ইকবাল ছাড়া আর কোনও কবির নাম জানতাম না। আট বছর বয়সে, ১৯৫১ সালে আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরি, তখন আমি বাংলার চাইতে উর্দু ভাল বলতে পারি। এরপর ১৯৫৩ সালে আমি সরাসরি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে আমি রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়ি। আমার মধ্যে রবীন্দ্রভক্তির বীজ বপন করেন মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, কবি ও সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, যিনি আমার মেজ বোন 'ছুট্টু'।
দেশ বিভাগের সময় বা তার আগে থেকেই পূর্ব বাংলার অনেক পরিবারেই যে রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রভক্তি প্রবল ছিল তার একটি উদাহরণ সেলিনা পারভীন।

সহায় সম্বলহীন নির্যাতিতা সেলিনা পারভীন তাঁর ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙিয়ে সারা জীবন যেভাবে সাধনা করে গেছেন, তার সঙ্গে একলব্যের সাধনার তুলনা করা চলে। ছবিও আঁকতেন সেলিনা পারভীন। ছবিগুলির ক্যাপশন ছিল সবই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। যেমন –
"আমি বহু বাসনারে প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে"
"খুঁজিতেছি কোথা তুমি, কোথা তুমি, যে অমৃত লুকোনো তোমায়, সে কোথায়?"
"পশ্চিমপানে অসীম সাগর, চঞ্চল আলো আশার মতো কাঁপিছে জলে।"
"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।" ইত্যাদি।
এই ছবিগুলি আমাদের দেশের বাড়ির দেয়ালে টাঙানো থাকত; ফলে বছরের পর বছর ওই ছবিগুলি আর তার ক্যাপশন আমার মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। ক্যাপশনগুলি আমার মনের মধ্যে স্থায়ী মূল্যবোধ হয়ে দাঁড়ায়।
দুর্ভাগ্য আমাদের, যুদ্ধের কারণে সেলিনার এইসব ছবি আর কবিতাগুলি হারিয়ে যায়।

বাবার সাথে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ছুট্টুর লড়াইয়ের একটি ঘটনা আমি উদ্ধৃত করছি তাঁর জীবনী গ্রন্থ থেকে।

"মফস্বল শহরে কবিতার বই তখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক বই ছুট্টু তখনি সংগ্রহ করে ফেলেছেন। ছুট্টুর রবীন্দ্রভক্তি ছিল প্রবল। তাঁর ছবিগুলির ক্যাপশনেও সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার রবীন্দ্রভক্তির মূলেও ছুট্টু। গল্পগুচ্ছ আর সঞ্চয়িতা ছুট্টুর কাছ থেকে নিয়েই আমার প্রথম পাঠ।

কিন্তু বুড়ো বয়সে দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে বাবা রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে গেলেন। জটিল বিষয় হ'ল বাবা তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করেন। বাবার পান্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, প্রায় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন, বয়স, ইত্যাদি সব মিলিয়ে আমাদের মাঝখানে একটা প্রবল অদৃশ্য দেয়াল ছিল। বাবাকে আমরা ভয় পেতাম।

কিন্তু ছুট্টু পৃথিবীর কোন দেয়াল মানতেন না। বাবা সে সময় ছুট্টুর ওপর অনেক রকম মানসিক অত্যাচার করতেন। দুজনের মধ্যে অনেক ঠান্ডা লড়াই আমি দিনের পর দিন চলতে দেখেছি। কিন্তু ছুট্টু যখন ইচ্ছা নিজের খেয়াল খুশিমত এই দেয়াল ডিঙিয়ে অনায়াসে বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারতেন। সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। আমি অবাক হয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বাবা তখন সুবোধ বালকের মতো কিছুক্ষণের জন্য ছুট্টুর বাধ্য হয়ে থাকতেন।

একদিন কোন কারণে ছুট্টু ঠিক করলেন বাবাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনাবেন। বাবা কিছুতেই শুনবেন না। বলেন, 'এসব শোনাও পাপ।'

কিন্তু ছুট্টু শোনাবেনই | আমি আড়াল থেকে দুরু দুরু বুকে দেখছি, আর মনে মনে আল্লা আল্লা করছি | অবাক হয়ে দেখি শেষ পর্যন্ত ছুট্টুই জিতেছে | বাবা শান্ত হয়ে বসে ছুট্টুর কাছ থেকে গীতাঞ্জলি শুনছেন | ছুট্টু অনেকগুলি কবিতা পড়ে শোনালেন | একসময় বই বন্ধ করে ছুট্টু বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার বলুন |'

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, 'ও বেটা কোরানশরীফ থেকে টুকেছে |'

ছুট্টুর মুখ তখন হাসি আর আনন্দে উদ্ভাসিত | বাবা যে কবিতাগুলির সর্বোচ্চ প্রশংসা করছেন, সেকথা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম |" (১)

১৯৬১ সালে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি | তখন একসময় দেখি রবীন্দ্রনাথ আমাদের আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত | এই সম্পর্কের অন্যতম ক্যাটালিস্ট ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন | আবার অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলাদেশের সকল আন্দোলনে প্রেরণার কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ এবং আরো সব বাঙালি কবি | কিন্তু সকল কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন আন্দোলনের প্রধান শক্তি |

ভাষা আন্দোলনের সময় ভাষা ও আন্দোলন নিয়ে অনেক গান তৈরী হয়েছিল দেশের আনাচে কানাচে | রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার ভিত্তিতে প্যারোডি তৈরী হয়েছিল শাসকদের আক্রমণ করে | এখনও অসংলগ্ন কয়েক লাইন মনে আছে |

'একখানি ছোট গদি আমি একেলা,
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা |
রাশি রাশি ভারা ভারা, / ঘুষ খাওয়া, হ'ল সারা,
ক্রোধভরা জনমত খর-পরশা, / খাইতে খাইতে ঘুষ এল বরষা |
যত চাও তত লও স্বজন তরে,
কিবা আছে? আর নাই, দিয়েছি ভরে |
এখন বাঁচাও মোরে জানাজা পড়ে |
শূন্য প্রাসাদপুরে রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল আজব ভুঁড়ি |'

(এখানে একজন প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন, অন্যজন আজব ভুঁড়ি, খাজা নাজিমুদ্দিন) |

সাতচল্লিশের ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চা যদিও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তা ছিল আংশিক | শিক্ষিত সমাজের এক অংশের কাছে রবীন্দ্রচর্চা ছিল অপরিহার্য | কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের এক রক্ষণশীল অংশ রবীন্দ্রবর্জনের পক্ষে ছিলেন | বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর সমাজের প্রগতিশীল অংশ আবহমান বাংলার শিল্প সংস্কৃতির চর্চায় উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়ে ওঠে | রবীন্দ্রচর্চার প্রসার ঘটে তার অংশ হিসাবে | কিন্তু তখনো এদেশে রবীন্দ্রচর্চা ছিল আংশিক ও সীমিত | সম্ভবত শিক্ষিত সমাজের ভেতরে দ্বিজাতিতত্ত্বতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের দ্বৈত ভূমিকার কারণে সাধারণ অসাম্প্রদায়িক মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ তখনও রবীন্দ্রচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেনি |

কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল আয়ুব খানের সরকার পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গলা টিপে ধরে | পূর্ব-পাকিস্তানে আয়ুব খানের নির্বাচিত গভর্নর মোনায়েম খান এই বিষয়ে আয়ুব খানের চাইতেও উৎসাহী ছিলেন | তখনকার দিনের একটি বহুল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ছিল এই যে, অর্ধশিক্ষিত গভর্নর মোনায়েম খান একবার খুব বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে কতিপয় বুদ্ধিজীবীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমরা হিন্দুর লেখা রবীন্দ্রসঙ্গীত না শুনে নিজেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারো না?"

অনেকেই মনে করেন, মোনায়েম সত্যই এই প্রশ্ন করেছিলেন | শেষ পর্যন্ত এই মোনায়েম খানের উৎসাহে একসময় পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় | ফলে হয় হিতে বিপরীত | পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনে বিদ্রোহের যে ছাইচাপা আগুন এতদিন ধিকিধিকি জ্বলছিল, এই নিষেধ সেই আগুনকে আরো উস্কে দেয় | এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মৌলবাদী ছাড়া আর সকল বাঙালি অপমানিত বোধ করে, এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে |

ইতিপূর্বে বাঙালির জীবনযাত্রা, বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতি, এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বহু বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের বিদ্রূপ, ভীতি প্রদর্শন, ও অপমান সইতে হতো প্রতিদিন | প্রায় বিশ বছর সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি সেটা সহ্য করেছে বিস্ময়কর নীরবতায়! কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার

পরে তারা হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে। মনে হয় বাঙালির চরিত্রে এক ভীরু নিরীহ বেড়াল বসবাস করে, যে কোণঠাসা হয়ে গেলে হঠাৎ বাঘ হয়ে যায়। এর প্রমাণ আমরা দেখেছি উভয় বাংলায় বার বার।

কিন্তু এই বিদ্রোহ অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয়নি। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার পরে প্রথমে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা বিভিন্ন ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গোপনে গান গেয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা করেন। তারপর তাঁরা কিছু কিছু নির্বাচিত অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুরু করেন গ্রেফতার এড়িয়ে।

ঐতিহাসিকভাবেই এদেশে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সেসময় এইসব রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিংহভাগ অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায়। সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যেসব মহান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এই বিপজ্জনক কাজ শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সঞ্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, অজিত রায়, কলিম শরাফী প্রমুখ। ঢাকা মেডিকেল কলেজে এঁরা তখন গান গাইতে আসতেন। আমরা তরুণ ছাত্ররা তাঁদের পাহারা দিতাম। আমরা জানতাম যে আমাদের প্রাণ থাকতে তাঁদের কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। এই আইন অমান্য আন্দোলনের জনসমর্থন কালক্রমে এত প্রবল হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী সামরিক সরকার তাদের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে, করেছ একী সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

আইয়ুব-মোনায়েমের দুষ্টবুদ্ধির ফলাফল ছিল তাই।

এই সময় থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার জনপ্রিয়তা ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তখন থেকে যে গতি সঞ্চারিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল তার অন্যতম নিয়ামক শক্তি। এই আন্দোলনের অন্যতম উৎস ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালির ক্ষোভ ও ক্রোধ। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় এই যে, পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান উৎস ছিল পশ্চিমা শাসকদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘটে ভাষা আন্দোলন দিয়ে। বাঙালির দৈনন্দিন জীবন যাপন, বাঙালির সংস্কৃতি, এমনকি বাঙালির ধর্মাচরণ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে দেশ বিভাগের পর থেকে শেখানো হয়েছিল বর্ণবাদী বাঙালি ঘৃণা। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি প্রতিদিন পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে অপমানিত হতো তাদের দৈনন্দিন আচরণ, খাওয়া-পরা, শিল্প-সাহিত্য, এবং তার ধর্মাচরণ ইত্যাদি সব সাধারণ বিষয়ে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি সাধারণ মানুষ প্রথমে বুঝতেও পারেনি। সেটি সামনে নিয়ে আসেন 'জাতির পিতা' শেখ মুজিবুর রহমান।

বিদ্রূপ, অপমান, ভীতি প্রদর্শন, ও অন্যান্য সামাজিক অসম্মানের ফলে শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মনে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে চলেছিল, ভাষা আন্দোলন ও রবীন্দ্রলাঞ্ছনার কারণে তার সাথে যুক্ত হয় মানুষের মনের প্রচন্ড আবেগ। ঊনসত্তরের সামরিক শাসনবিরোধী গণআন্দোলনের সময় থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অবধি এই আবেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করে। ধূমায়িত ক্ষোভ একসময় বিদ্রোহের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়।

ঊনিশ'শ একাত্তর সালে যে সকল দেশপ্রেমিক বাঙালি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে না পেরে অবরুদ্ধ বাংলায় সীমাহীন আতঙ্ক, উদ্বেগ, আশা-নিরাশা, আর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন, প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করেছেন, প্রতিদিন পুনর্জীবন লাভ করেছেন, তখন কারা ছিলেন তাঁদের অন্তরের প্রধান তিন মৃতসঞ্জীবনী শক্তি? এই তিনজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও শেখ মুজিবুর রহমান। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্কটে সংগ্রামে যাঁরা অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্র-নজরুল-মুজিব ছিলেন প্রধান তিন শক্তি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দুই প্রধান আধ্যাত্মিক শক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল।

মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কত বিপুল ছিল তার প্রমাণ শুধু এই সত্যেই প্রকাশিত, যে তাঁরই রচিত কবিতা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল হক লিখেছেন, *"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টাতে আমি সোনামুড়ার মেলাঘর ক্যাম্পে ট্রেনিংয়ে ছিলাম। এ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পটি ছিল 'কে' ফোর্সের অধীন। আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছেন গেরিলা*

কমান্ডার ক্যাপ্টেন হায়দার। একদিকে দেশের জন্য যুদ্ধ করব এ উদ্দীপনা বুকের ভেতর, অন্যদিকে অনভ্যস্ত কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে গজারি শাল সেগুনের বিশাল বনে কয়েকটি টিলার ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টাঙানো তিরপলের তাঁবুর নিচে সহযোদ্ধারা একসঙ্গে রাত কাটাই। পাহাড়ে জঙ্গলে ঝুপ করে রাত নেমে এলে কোনো আলো জ্বালানো যেত না। বিভীষিকাময় এমন রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত আর দেশাত্মবোধক গানগুলো আমাদের প্রত্যেকের চেতনায় তরল আগুন জ্বেলে দিয়ে আত্মবিসর্জন দেওয়ার শক্তি সঞ্চার করত।"(২)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিজয়ের আবেগের সাথে ভাষা ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বাঙালি কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক বিষয়ক আবেগ একত্রিত হয়। শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখাসহ রবীন্দ্রচর্চার এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ঘটে এই নবীন রাষ্ট্রে। ধর্মান্ধ মৌলবাদী ব্যতীত প্রায় সমগ্র শিক্ষিত সমাজ রবীন্দ্রচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখানোর জন্য সারা দেশে গড়ে ওঠে ছোট বড় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে শ্রোতার সংখ্যা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় গণমাধ্যমগুলিতে রবীন্দ্রচর্চার প্রসার ঘটতে থাকে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। তার গভীর কারণ ছিল এই ইতিহাস।

ঊনিশ'শ পঁচাত্তর সালের স্বাধীনতা বিরোধী নৃশংসতা ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে মৌলবাদের যে পুনরুত্থান ঘটে, তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে দেশে অসাম্প্রদায়িক সমাজ যে সকল উপাদান ব্যবহার করেন, পুনরায় তার অন্যতম শক্তি হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। পঁচাত্তর পরবর্তী পাকিস্তানপন্থী শাসকশ্রেণী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের কাঠামো যখন উচ্ছেদ করে, তখন থেকে তারা জাতীয় পোশাক ও জাতীয় পতাকাসহ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বহু উপাদান পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথের গায়ে হাত দিয়ে তাদের যে শিক্ষা হয়, তার ফলে তারা কোনোদিন জাতীয় সঙ্গীতের গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করেনি, এবং রবীন্দ্রচর্চায় বাধা দিতেও সাহস পায়নি। অবশ্য মৌলবাদীরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাদের বিষোদগার কোনদিন বন্ধ করেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পার হয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য এই আবেগ কি আজ স্তিমিত? কালের প্রবাহে যে কোনও বিষয়ে আবেগ স্তিমিত বা সীমিত হয়ে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়টি হয়তো বাংলাদেশের বাইরের বাঙালির পক্ষে বুঝে ওঠা দুরূহ। অধ্যাপক কবির চৌধুরী একবার বলেছিলেন, *"রবীন্দ্ররচনা পাঠ আমার কাছে ইবাদতের মতো।"* সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদীরা তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়ে কোতলের ফতোয়া দিয়েছিল।

পঁচাত্তর পরবর্তী সমগ্র আশি এবং নব্বই দশকে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক মানুষ যখন বাংলাদেশে মৌলবাদীদের অত্যাচারে আতঙ্কিত, আক্রান্ত, এবং পরাজিত, তখন রবীন্দ্র-নজরুল অতিমানবের মতো তাঁদের চৈতন্যে প্রবেশ করে তাঁদের মনোবল আগলে রেখেছিলেন।

মৌলবাদের উত্থানে বিপর্যস্ত উপমহাদেশে আজ যখন আবার আমাদের মনে পরাজয়ের ভয়, তখন আমাদের অন্তর্দৃষ্টিতে সেই অতিমানব পৃথিবীর সকল পর্বত-প্রান্তর-মহাসমুদ্রের ওপরে দাঁড়িয়ে, ওপরের আকাশ ছাড়িয়ে, জ্যোতির্মন্ডল ছাড়িয়ে, সৃষ্টিকর্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য গাইছেন,

"বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।"

বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আমার বিশ্বাস, যতদিন বাঙালির প্রাণে রবীন্দ্র-নজরুল বিরাজ করবেন, ততদিন মৌলবাদের সাধ্য নেই মহামানবের পাহাড় অতিক্রম করে বাঙালিকে ধ্বংস করে। শেক্সপীয়রকে ধ্বংস না করে যেমন ইংরেজ জাতিকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে ধ্বংস না করে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:-

১. শহীদ কবি ও সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের জীবন ও মৃত্যু। শেলী শাহাবুদ্দিন। প্রকাশক – স্বদেশ শৈলী। ১৮/১ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা – ১০০০।

২. নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা অনির্বাণ শিখা। আনোয়ারুল হক। যুগান্তর। ২৫ মে, ২০১৮।

বৈষম্য-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস

ভজেন্দ্র বর্মন

এখন বিশ্বে বৈষম্য, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এত বেড়েছে যে বলা যেতে পারে, লোকজন কারো না কারো উপর কম-বেশী ক্ষুব্ধ থাকে। খুব নিকট না হলে একজন অন্যকে পর ভেবে সন্দেহ বা ঘৃণা করে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। একটু ঊনিশ-বিশ হলে ভ্রুকুঞ্চন করে এড়িয়ে যায়। বেশী রেগে গেলে গালমন্দ বা হাতাহাতি করতে এগিয়ে আসে। কোন কারণে কেউ নীচু মনে হলে তাকে তুইতোকারি করে। আমরা সবাই মানুষ হলেও একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে সর্বদা তফাৎ খুঁজতে চেষ্টা করি। পছন্দ না হলে সত্য বা মিথ্যা রটনার বিপরীতে মত পোষণ বা ক্রোধ প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করি না; ফলে ব্যক্তিগত কোন্দল-সংঘাত অহরহ ঘটে। একই ব্যাপার সমাজ বা দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোন সমাজ বা দেশ নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যদের হেয় ভাবলে বা কারো ন্যায্য অধিকার খর্ব করলে বৈষম্যমূলক আচরণ ঘটে। রাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র কারণে বা কোন অজুহাত দেখিয়ে এক দেশ অন্য দেশের উপর দোষারোপ কিংবা বিরূপ আচরণ করে, কখনও তা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। এখানে যুদ্ধের অর্থ হ'ল আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে শত্রু দেশের চরম ক্ষতিসাধন, শিশু-সন্তান-নারীসহ হাজার হাজার মানুষের প্রাণ হারানো এবং অগুনতি আহত ও পঙ্গুদের আর্তনাদ। কেন এমন করা হয় তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এসব বুঝতে পারলে মানুষ সম্ভবত নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করার চিন্তা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রাখলে শান্তিতে সহাবস্থান করাও সম্ভব হবে। এক দেশ অন্য দেশকে হয়রানি বা আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। অতীতের ঘটনাপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে বলা যায় বৈষম্য, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মূল কারণগুলো অনেক ধরনের হতে পারে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

১) মানুষের ত্বকের রঙ –

মানুষ সাদা, কালো, হলুদ ও বাদামি রঙের হয়। প্রত্যেকটি রঙ আবার হালকা, স্বাভাবিক বা গাঢ় হতে পারে। রঙের বৈচিত্র শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যাপার। এ দিয়ে মানুষের গুণাগুণ বিচার করা যায় না। তবু অনেকেই মানুষের ত্বকের রঙের ভিত্তিতে তার প্রতি ভাল বা মন্দ ধারণা পোষণ করতে চান। কেউ যদি মানুষটির গুণাগুণ যাচাই করতে না চান, তখন তিনি না জেনেই হিংসামূলক আচরণ করেন। এতে ভুক্তভোগী মানুষটি অহেতুক বৈষম্যের শিকার হন। কিছু কিছু উন্নত এবং অনুন্নত দেশে লোকজনের মধ্যে এ ধরনের বৈষম্যের প্রবণতা বড্ড বেড়ে গেছে। দুঃখজনক হলেও সামান্য ব্যাপার বা উস্কানির দ্বারা ত্বকের রঙ নিয়ে তোলপাড় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে চলছে। কোন কোন দেশে, বিশেষত অনুন্নত অঞ্চলে ত্বকের রঙ দিয়ে সমাজে বা পরিবারে স্থান নির্ধারণ করা হয়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে বর্তমানে ত্বকের রঙের উপর ভিত্তি করে দেশের নাগরিকদের উঁচু ও নীচু শ্রেণী হিসাবে গণ্য করতেও দেখা যায়।

২) গরীব-ধনী –

ধনী দেশ ও গরীব দেশ নূতন কিছু নয়। পৃথিবীতে দেশের সম্মান অনেকটাই অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তির উপর বর্তায়। দেশে গরীবের সংখ্যা অনেক বেশী হলে সেটি গরীব বা অনুন্নত দেশ হিসাবে গণ্য হয়। মানুষের আর্থিক অবস্থা দিয়ে গরীব এবং ধনী বিচার করা হয়। এটা আবার দেশ বিশেষে ভিন্ন রকম হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কারো বেতন বৎসরে ১৫,০০০ ডলার বা তার কম হলে তিনি দারিদ্র সীমার মধ্যে পড়েন। পৃথিবীর অন্যত্র এটা অন্য রকম। কেউ দিনে ২.১৫ ডলার (বৎসরে ~৭০০ ডলার) বা তার কম আয় করলে তাকে দারিদ্র সীমার মধ্যে ধরা হয়। কোন কোন দেশে তাদের নিজস্ব দারিদ্র সীমা থাকে (যা বহু দেশে খুবই সামান্য অর্থ)। এখন নিজস্ব দারিদ্র সীমা অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্র জনগণ যথাক্রমে ৪৫.১%, ৩০.৭% এবং <১%। আর্থিক বৈষম্য মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এবং তাদের মধ্যে বিভাজন ও ঘৃণা-হিংসা-বিদ্বেষ জাগ্রত রাখে।

৩) দেশী-বিদেশী –

বর্তমানে দ্রুত যাত্রা ব্যবস্থা, মুঠোফোন, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্তর্জাল-নির্ভর সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে সংবাদ ও বিভিন্ন তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। উন্নততর জীবন অথবা দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে লোকজন আইনত বা বেআইনিভাবে নিজদেশ থেকে অন্য দেশের অভিবাসী হতে চায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক কারণে হাজার হাজার মানুষ বিদেশে, বিশেষ

করে ধনী দেশে প্রতিনিয়ত পাড়ি জমায়। কোনও মানুষের ভাষা, উচ্চারণ ভঙ্গি, শিক্ষার মান, শারীরিক গঠন, আচরণ বা ত্বকের রঙ ভিন্ন হলে মানুষ সহজেই তাকে বিদেশ থেকে আগত বলে বুঝতে পারে। অনেক দেশে স্থানীয় মানুষকে সন্দেহবশতঃ অভিবাসীদের প্রতি কম-বেশী অসহিষ্ণু হতে দেখা যায়। দেশের প্রশাসনকে শরণার্থী বা অভিবাসীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে দেখা যায়। বর্তমানে যুদ্ধ, খরা, এবং বন্যা-জনিত কারণে খাদ্য উৎপাদনে সমস্যা, প্রকট অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সাম্প্রদায়িক কোন্দল ও হত্যাকান্ড ঘটার জন্য মানুষের নিজদেশ পরিত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়া বেড়েই চলছে। সে কারণে নাগরিক আর শরণার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেড়ে যাচ্ছে।

৪) মানুষের ধর্ম –

পৃথিবীতে কমপক্ষে ৪,২০০ রকম ধর্ম আছে। তবে মাত্র কয়েকটি ধর্ম প্রাধান্য পেয়ে আসছে। সেগুলো শতকরা কত ভাগ মানুষ দ্বারা পালিত হয় দেখা যাক। খ্রীষ্টান-৩০.৭%, ইসলাম-২৪.৯%, হিন্দু-১৫.১%, বৌদ্ধ-৬.৬%, ঐতিহ্যিক চীনা-৫.৬%, শিখ-০.৩% এবং ইহুদী-০.২%। এই ছয়টি ধর্ম ৮৩.৪% মানুষের। বাকি থাকছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ২.৪%, এবং ধর্ম নিরপেক্ষ অথবা ধর্মহীন-১৪.২%। প্রায় সব দেশে একাধিক ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। তথাকথিত কট্টর ধর্মভিত্তিক দেশেও পুরুষ পরম্পরায় আদি নাগরিক হিসাবে, সাংবাদিক হিসাবে, শরণার্থী হিসাবে, শ্রমিক-কর্মচারী বা ভ্রমণকারী হিসাবে অন্য ধর্মের মানুষ দেখা যায়।

সকল ধর্মের প্রধান নীতিমালা এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও কিছু কিছু দিক দিয়ে তারা ভিন্ন। প্রতিটি ধর্মে ধর্মনিষ্ঠ মানুষ বিশেষ স্থানে প্রার্থনা করে। এক বা একাধিক ধর্মগ্রন্থ পড়া এবং পালন করাও তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। প্রতি বৎসর কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান সামাজিকভাবে পালন করে। বাহ্যিকভাবে মিল থাকলেও গ্রন্থে বর্ণিত কাকে প্রার্থনা করা হয়, প্রার্থনা পদ্ধতি, প্রার্থনা ঘর, ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি এবং ধর্মীয় সংস্কার জনিত পার্থক্যের জন্য মানুষ বিভিন্নভাবে ধর্ম পালন করে। অনেক ধর্মাবলম্বী ধর্ম পালনের এই বৈচিত্রকে গ্রহণ করতে পছন্দ করে। কিন্তু কিছু মানুষ নিজ ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কঠোর অবস্থান নিতে চায়; এবং সুযোগ পেলে সংখ্যালঘুদের হয়রানি বা উচ্ছেদ করতে দানবিক আচরণেও লিপ্ত হয়। এজন্য তারা জঘন্য কাজ, যেমন লুঠতরাজ, বাড়িঘর চুরমার, ভূমি দখল, অগ্নিকান্ড, হত্যাকান্ড ও মেয়েদের হরণ-নিপীড়ন করতে দ্বিধাবোধ করে না। অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের দেশ ত্যাগ করা ছাড়া বাঁচার উপায় থাকে না। কোন কোন উন্নত দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভোটে জয়লাভ করতে সুবিধা হবে ভেবে সংখ্যালঘু এবং অভিবাসীদের প্রতি নানারূপ মিথ্যাচার করে তাদের বিপন্ন করে। অন্যত্র, বিশেষ করে অনুন্নত গণতান্ত্রিক দেশে, সংখ্যালঘুদের ভোট পাবার জন্য কোন কোন দল তাদের নিরাপত্তা ও নানাবিধ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়; যদিও সেসব প্রতিশ্রুতি সবসময় রক্ষা করা হয় না।

৫) শিক্ষিত-অশিক্ষিত –

উন্নত দেশের তুলনায় অনুন্নত দেশে অশিক্ষিত মানুষের হার অনেক বেশী। ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস (World Atlas) অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরে অশিক্ষিত মানুষের হার যথাক্রমে ১৪% এবং ৪%; তুলনায় বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোর অশিক্ষিত মানুষের হার হ'ল – বাংলাদেশ- ৪০%, শ্রীলংকা-৯%, ভারত-৩১% এবং পাকিস্তান-৪৫%। স্বভাবতই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ তাদের আর্থিক অবস্থার জন্য সমাজের নিম্নস্তরে স্থান পায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ছেলে-মেয়েরাও শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থাকে। যে দেশে আর্থিক বৈষম্য প্রকট, দেখা যায় সে দেশের অগ্রগতি শুধু উচ্চ সমাজের মধ্যেই সীমিত। এও দেখা যায় যে অশিক্ষিত মানুষ সহজেই প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হয়। তারা ন্যায় বিচার পায় না, তাই তাদের বেশীরভাগই সব অত্যাচার-অবিচার নীরবে সহ্য করে।

৬) রাজনীতি –

এখনও কোনো রাজনৈতিক পদ্ধতি পাওয়া যায়নি, যা সবদিক থেকে উত্তম এবং সবার জন্য মঙ্গল ও গ্রহণযোগ্য। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে দুই বা তার অধিক প্রধান রাজনৈতিক দল থাকে। দলের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিকও হতে পারে। এরা সবাই ক্ষমতায় থাকতে চায়, সেজন্য প্রতিটি দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত বেশি প্রতিযোগিতা। উন্নত দেশে রাজনীতি কর্ম পরিকল্পনা ও নীতিভিত্তিক হওয়ায় কোন দল কী নীতি মেনে চলবে এবং কী করবে বোঝা যায়; মানুষ তখন পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করে। অন্যত্র তা হয় না;

সেখানে সাধারণত কোনো নেতা বা দলকে পছন্দ করে মানুষ ভোট দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায়।

প্রায়ই দেখা যায় যে একবার জিতলে সে দল আর ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। এসব দেশে প্রায় সকল সময় সরকারী দলের সাথে বিরোধী দলের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। গণতান্ত্রিক দেশে বাক স্বাধীনতা আছে বলা হলেও জায়গা বিশেষে সরকার নানা কারণ দেখিয়ে তা খর্ব করে। আইনের অপপ্রয়োগ করে এবং জবরদস্তি স্বীকারোক্তি নিয়ে অথবা নূতন দমন-মূলক আইনের ফাঁদে ফেলে বিরোধী দলের লোকজনকে জব্দ করা হয়। বিরোধী নেতারা ভুয়া মামলায় জেল হাজত থেকে হত্যা-গুমের শিকার হন। স্থিতিশীলতার অভাবে দেশের মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলা দেখতে পায় না। অনেক সময় সরকারী দল বড় কিছু ভুল করলে বা চরম দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনাচারে লিপ্ত হলে প্রাপ্ত মেয়াদ শেষ না হতেই জনগণ আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটায়। বিশৃঙ্খলার ধরন অনুযায়ী আবার নির্বাচন হয় অথবা সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থাকলে সাধারণত কিছুকাল পর নির্বাচন হয়। যদি কোন কারণে তা না হয় তখন হরতাল, ধর্মঘট ও অবরোধ দানা বাঁধে, যার ফলে সেনাবাহিনী বাধ্য হয় নির্বাচন দিতে। দেখা যায় এরকম রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংঘর্ষ হওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। তাতে প্রাণহানি, ভাঙচুরসহ নানাবিধ অরাজকতা ঘটে; বার বার নেতা ও দল বদল হতেই থাকে।

এখনও পৃথিবীর কয়েকটি দেশে কট্টর স্বৈরতান্ত্রিক বা রাজতন্ত্র বিদ্যমান। এসব দেশে জনসাধারণের বাক স্বাধীনতাসহ অনেক অধিকারই থাকে না বললে অত্যুক্তি হয় না। সেখানে ঘোষণার মাধ্যমে অনেককিছু চালানো হয়। দেশের প্রশাসন কড়াকড়িভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবাদীরা মৃত্যুদণ্ডসহ চরম শাস্তি পায়।

৭) নারী-পুরুষ –

অতীতে নারীদের অবলা-দুর্বল মনে করা হতো। দুর্ভাগ্যবশত এখনও তা করা হয়। এখন বেশ কয়েকটি দেশে নারীরা নেতৃস্থানীয় পদে রয়েছেন। অনেক দেশে তাঁরা কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকাও পালন করছেন। এসব কারণে নারীদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকলেও এখনও নারীর অধিকার ও সামাজিক অবস্থান দেশ বিশেষে ভিন্ন রকম। নারীরা এখনও ক্ষেত্রবিশেষে নিজ বাড়িতে, স্কুল-কলেজে কিংবা কর্মস্থলে পুরুষদের মতো সমান মর্যাদা বা নিরাপত্তা পান না। নারীরা অভিযোগ করলে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ-শাসিত প্রশাসন তাদের দোষারোপ করে। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায়, চাকুরি স্থানে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রায় সকল দেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে কম-বেশী বৈষম্য দেখা যায়। এটাও সত্য যে কিছু কিছু দেশে নারীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেখানে নারীদের জন্য আইনগুলো মধ্যযুগীয় বর্বরসুলভ। দেশের অর্ধেক নাগরিকের পূর্ণ সমতা না থাকা একটা বিরাট বৈষম্যের ব্যাপার। এটা পুরুষরা স্বীকার করলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে মানবতার একটা বিরাট অংশ কলঙ্কমুক্ত হবে বৈকি।

৮) দুর্নীতি –

অনেক ধরনের দুর্নীতি সমাজে ছড়িয়ে আছে। এতে এক পক্ষ লাভবান হয়, অন্য পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নিগৃহীত হয়। আর্থিক দুর্নীতিতে কালো টাকা পেয়ে কেউ কেউ ফুলে-ফেঁপে উঠে। বিপরীতে অন্য পক্ষ অহেতুক হয়রানির শিকার হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে কেউ কোনকিছু পাওয়ার অযোগ্য হয়েও তা পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ন্যায্যত যার পাওয়া উচিৎ সে বঞ্চিত হয়। যোগ্যতার বদলে দুর্নীতির ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ হলে এসব বেআইনি কাজের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিও বৈষম্যের স্বীকার হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে দেশ ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেসব কর্মকান্ড বা বিষয় মানুষের মধ্যে বৈষম্য ও ক্ষোভ বাড়ায় এবং দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তার কয়েকটি উদাহরণ রইল – ঘুষ, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, ব্যাঙ্ক তহবিল তছরূপ, দরপত্রে জালিয়াতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, অমেধা-ভিত্তিক নিয়োগ, অহেতুক হয়রানি, অন্যায় পক্ষপাত, অর্থ পাচার, মিথ্যাচার, ভাঁওতাবাজি, ভুয়া মামলা এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য পীড়ন-নিপীড়ন। চুপিসারে দুর্নীতি চললে সমাজে ততটা প্রচার পায় না। এসব অন্যায় কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে চলতে থাকলে ক্ষুব্ধ-বঞ্চিত মানুষ দলবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। এতে অবাক হওয়ার কারণ নেই। বিশ্বের কিছু দেশে এর অনেক নজির রয়েছে।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে মানুষের মধ্যে বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করা হয়েছে প্রধানত ত্বকের রঙ, আর্থিক অবস্থান,

বিদেশীদের অভিবাসন, ধর্ম বিভেদ, শিক্ষার পরিধি, রাজনীতি, নারী ও পুরুষের অধিকারে অসমতা এবং দুর্নীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে। এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে আছে এবং হয়তো বা থেকেও যাবে। আমরা যদি সমাজে এইসবের ক্ষতিজনক দিকগুলো বোঝার প্রচেষ্টা চালাই এবং সমাজের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারি, তাহলে মানুষে-মানুষে সহাবস্থান সহজতর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

Inequalities with No Solution

An inequality has no solution if it states something false.

Examples:

$3 < -3$

$9 < x < -9$

$|3x + 1| < 0$

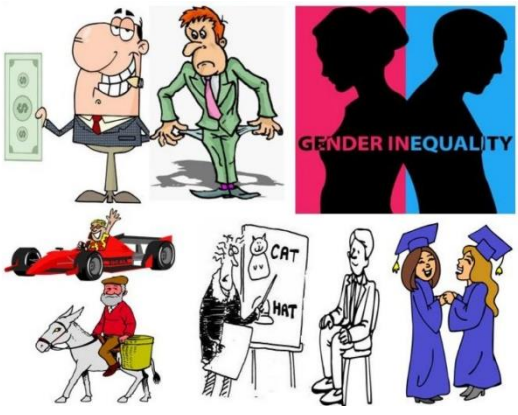

হিন্দু জাতীয়তাবাদ

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে এক সংঘাত শুরু হ'ল, যা ছিল একাধারে বৌদ্ধিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক। যেহেতু কলকাতা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু, তাই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর উদ্যোগে যে ভাবগত আন্দোলন শুরু হয়, সেটিকে বলা হয়, ভারতীয় পুনর্জাগরণ অথবা Indian Renaissance-এর সূচনা। এই নবজাগরণের মধ্যেই নিহিত ছিল পরবর্তীকালের, অর্থাৎ বিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদের বীজ। এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ।

ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়, যিনি ছিলেন হিন্দুদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। ১৮২৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভা' যা পরে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে খ্যাতি লাভ করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত রামমোহন রায় পশ্চিমী সংস্কার আন্দোলনের ন্যায় হিন্দু সমাজের কুসংস্কারকে দূরীভূত করে তাকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল হিন্দু সমাজে রূপান্তরিত করার কাজে ব্রতী হন। যার ফলস্বরূপ 'সতীদাহ প্রথা' রদ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশব চন্দ্র সেন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাঞ্জাবে ফিরে ব্রাহ্মসমাজের অনুপ্রেরণায় 'আর্য সমাজ' নামে একটি হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সূচনা করেন। তিনি মনে করতেন, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রাচীন বর্ণপ্রথার একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন রূপ। তিনি আর্যসমাজকে একটি আন্দোলনমুখী সংগঠনরূপে গড়ে তুললেন; যদিও তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন এবং বেদকে সমস্ত ধর্মের মূল বলে মানতেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান যেসকল হিন্দুদের বলপূর্বক ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে

ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তাদের 'শুদ্ধি আন্দোলন'-এর দ্বারা নিজধর্মে ফিরে আসার সুযোগ করে দেন। ইতিমধ্যে বাংলায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'-এর পুনরুত্থানের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও উনিশ শতকের শেষার্ধে ভাষা, অঞ্চল, জাতপাত, সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে একটি সুদৃঢ় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু তাই নয়, শিকাগো থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের কলম্বো থেকে সুদূর উত্তর ভারতের আলমোড়া পর্যন্ত উদ্দীপনাময় বক্তৃতাসমূহের দ্বারা তিনি হিন্দু সমাজের যুব সম্প্রদায়কে উদ্বেলিত করে তুললেন। এর পরবর্তীকালে ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাজুড়ে 'বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি' গড়ে উঠল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'যুগান্তর গোষ্ঠী'। এই সমস্ত বিপ্লবী প্রচেষ্টার মূল তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, যিনি ১৯১১ সালে কারামুক্তির পর তাঁর বিখ্যাত 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ'-এ বললেন যে তাঁর মতে হিন্দু তথা সনাতন ধর্মই ভারতের জাতীয়তা এবং ভারতবর্ষ একটি দৈবিক সত্ত্বাসম্পন্ন ভূখণ্ড। এই ভাষণের দ্বারা হিন্দু জাতীয়তাবাদ, হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষ এই তিনটি একীভূত রূপ ধারণ করে, পরবর্তীকালে যা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করল।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার পরেই ১৯০৭ সাল থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আর্যসমাজ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠা হয়। কোথাও কোথাও এই হিন্দুসভাগুলির নাম হয় পরিলক্ষিত সনাতন সভা। ১৯১৫ সালে হরিদ্বারে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিরা সমবেতভাবে 'অখিল ভারত হিন্দুসভা' অথবা 'হিন্দু মহাসভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২০ সাল থেকে হিন্দু মহাসভা হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শকে একটি সুসংহত এবং নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ রূপ দেয়। এই সময় থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের একটি অংশের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার সূচনা ঘটে। আর মুসলিমদের সম্পর্কে তাদের একইসঙ্গে ভীতি ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। এর দুটি কারণ ছিল। একটি হচ্ছে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে মুসলিমদের ঘনিষ্ঠতা, যেটা শুরু হয়েছিল ১৯০৯ সালের 'মর্লে-মিন্টো' সংস্কারের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের পৃথক নির্বাচকমন্ডলী ঘোষণার দ্বারা। আর অপরটি হ'ল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে অনুষ্ঠিত 'খিলাফত আন্দোলন'।

ইতিমধ্যে খিলাফত আন্দোলনকে গান্ধীজী তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সম্মিলিত করেন। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করা। তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিন্নাহ প্রমুখেরা এই বিষয়ে বিরোধিতা করেন, কিন্তু গান্ধীজী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। ফলত তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পক্ষে বিষময় হয়ে দাঁড়াল। কারণ, তুরস্কের প্রগতিশীল যুবসমাজ কামাল পাশার নেতৃত্বে মুসলিম সমাজের ধর্মগুরু খালিফাকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং খালিফা পদটির সমাপ্তি করলেন। সেই সাথে ভারতের খিলাফত আন্দোলনেরও সমাধি ঘটল। অপর দিকে গান্ধীজীও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে মৌলবাদী মুসলিমরা ব্রিটিশদের বদলে হিন্দু সমাজের ওপর বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ চালাল। ফলে ১৯২০ দশকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হ'ল। যার দায় থেকে তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা গান্ধীজীকে কোনো মতেই রেহাই দেওয়া যায় না। এছাড়া ইতিমধ্যে সুদূর দক্ষিণে কেরালায় মোপলা বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে মোপলা মুসলিমরা ব্যাপক হিন্দু হত্যা, লুণ্ঠন চালিয়ে হিন্দু সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পেল এবং তারা চিন্তা করতে আরম্ভ করল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে ঠেকাতে গেলে হিন্দুদের দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে প্রতিরোধ করতে হবে।

হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠার পরে তার সদস্যরা কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তাদের কাজকর্ম চালাতেন, কারণ তৎকালীন কংগ্রেস ছিল সমস্ত মতের একটি মঞ্চ। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবার পরে চিত্রটি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে

গেল; কারণ গান্ধীজী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন | ফলে হিন্দু মহাসভা পন্থীদের সাথে গান্ধীজীর বনিবনা সম্ভব হ'ল না | পরবর্তীকালে ১৯৩০ দশকে বীর সাভারকারের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা একটি পৃথক রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল| প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী বীর সাভারকার ১৯২২ সালে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে অন্তরীণ অবস্থায় 'Hindutva: who is a Hindu?' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন | এই গ্রন্থে তিনিই প্রথম হিন্দুরাষ্ট্র, হিন্দুত্বকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন | এই বিষয়ে তিনি উপাসনা পদ্ধতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিলেন না| তাঁর মতে ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, জাতি, ধর্মমত এবং সংস্কৃত ভাষা এই ক'টি হিন্দুরাষ্ট্র তত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ|

সাভারকার হিন্দু জাতীয়তাবাদের তত্ত্বকে একটি সুদৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন কিন্তু এই তত্ত্বকে সঠিকভাবে রূপায়ণের কোন পরিকল্পিত রূপরেখা তাঁর কাছে ছিল না| এই তত্ত্বের কিয়দংশের ওপর ভিত্তি করে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন | আর.এস.এস প্রতিষ্ঠার আগে ডাঃ হেডগেওয়ার তৎকালীন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছেন, সাভারকারের সাথেও আলোচনা করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী জঙ্গল সত্যাগ্রহ করে 'দেশদ্রোহমূলক আইন' বা 'সিডিশন অভিযোগ'-এ এক বছর কারারুদ্ধ হন| এই সময় তিনি ভারতের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তন করেন | Christophe Jaffrelot-এর মতে, হিন্দুত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডাঃ হেডগেওয়ার আর.এস.এস-এর জন্য এক অভিনব কর্মসূচী প্রণয়ন করেন, যেটি হ'ল হিন্দুসমাজকে তৃণমূল স্তর থেকে সংস্কার করা এবং সংগঠিত করা | তার জন্য স্থানীয়ভাবে যে ইউনিট গঠন করা হ'ল, সেগুলির নাম দেওয়া হ'ল, 'শাখা'| ক্রমে আর.এস.এস একটি সবচেয়ে শক্তিশালী ও অরাজনৈতিক সংগঠনরূপে সারা ভারতে স্থান করে নিল|

হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, তপন বসু প্রমুখ, 'খাঁকি সর্টস অ্যান্ড স্যাফ্রন ফ্ল্যাগস্' পুস্তিকায় বলেন যে, আর.এস.এস আগ্রাসী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎসমুখ| আবার জনৈক সমাজবিজ্ঞানী অচিন বনায়েক, 'দি এনিমি উইদিন' প্রবন্ধে বলেছেন, হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণার মূল চালিকাশক্তি হ'ল, আর.এস.এস | আর.এস.এস-এর মুখপত্র Organizer-পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "সমস্ত মুসলমান রামকে তাদের বীর নায়ক হিসাবে মেনে নিক, তাহলেই সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটে যাবে|" আর.এস.এস-র দর্শন অনুযায়ী 'বিদেশী' মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের হাজার বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামই ভারত ইতিহাসের মূল নির্ণায়ক | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আর.এস.এস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিসাবে ডাঃ হেডগেওয়ার বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের দুর্দশা এবং পরাধীনতার জন্য বিদেশী আক্রমণকারীরাই দায়ী নয়, হিন্দুদের নিজেদের অনৈক্য, পারস্পরিক বিরোধ এবং সংগঠনহীনতাই দায়ী | তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীনকাল থেকে বিদেশি আক্রমণকারীরা এদেশে না আসলেও 'সংঘ' স্থাপনের প্রয়োজন ছিল| কারণ, একটি দুর্বল এবং ঐক্যহীন জাতি কখনই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করতে পারে না|

কংগ্রেসের নেতৃত্ব তত্ত্বের দিক থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকলেও হিন্দু জাতীয়তাবাদকে রোধ করার ক্ষেত্রে তারা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি | অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পরেই কংগ্রেস পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তন বিরোধী দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় | চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদিত হয় | যেটি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়| ১৯২৪ -এ কোহার দাঙ্গার সময় গান্ধীজী ২১ দিন অনশন করেন| কিন্তু তাঁর অনশন খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি|

যুক্তপ্রদেশের পুরুষোত্তম দাশ, ট্যান্ডন-এর মতো পরিবর্তন বিরোধীরা হিন্দু মহাসভার নেতা মালব্যের সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখতেন | এমনকি গান্ধীজীও মালব্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেননি| বেনারস ইত্যাদি স্থানে স্বরাজ্য দল বিরোধী গোষ্ঠী ও হিন্দু মহাসভা কার্যত একই সংগঠনে পরিণত হয়েছিল | মালব্য ও লালা লাজপত রায়-এর যৌথ প্রয়াসে স্বাধীন কংগ্রেস দল গঠিত হয় | এই দলটি হিন্দু মহাসভার বাহ্যিক সংগঠনের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না| নির্বাচনী প্রস্তুতি ও প্রচারের জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রত্যক্ষ মদত দেওয়া হতো| ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ এলাহাবাদ মসজিদের সামনে গান-বাজনা সংক্রান্ত বিষয়ে

মুসলমানরা বারবার সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা মানা হয়নি। এমনকি সি.আর.দাশের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল করা হয়।

১৯২৬ সালের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিভাজন স্পষ্ট রূপ নেয়। বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মহাসভা ও তাদের সহযোগিতাকারী আঁতাত জয়লাভ করে ও স্বরাজিরা হেরে যান। বাংলায় ৩৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে মাত্র একটি আসন স্বরাজ্য দল জিতে নেয়। ১৯২৭ সালের ৩০শে মার্চ মতিলাল নেহেরু পুত্র জওহরলালকে লেখা চিঠিতে আক্ষেপ করেন, "সংক্ষেপে বলতে গেলে; ভারতে কখনও এত খারাপ অবস্থা হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের যে প্রতিক্রিয়া ১৯২২-২৩ সালে শুরু হয়, তা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট করে দিচ্ছে,... জনসাধারণ কেবল একটাই শিক্ষা পাচ্ছে – তা হ'ল সাম্প্রদায়িক ঘৃণা।"

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে ও মে মাসে বম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে 'নেহেরু প্রতিবেদন' নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিবেদনের খসড়া চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯২৮ সালের ১৫ই আগস্ট, লক্ষ্ণৌতে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে এই সম্মেলনে প্রচুর কুটিল আলোচনা হয়। নেহেরু রিপোর্টে হিন্দু মহাসভাকে পর্যাপ্ত সুবিধা দেওয়া হয়। সর্বত্র যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী হলেও সংরক্ষিত আসন দেওয়া হয় একমাত্র কেন্দ্রে ও সেসব প্রদেশে, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশ পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়নি। ১৯২৭ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং ডিসেম্বরে মাদ্রাজ অধিবেশনে জিন্নাহ-র প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেও নেহেরু রিপোর্টে এই প্রস্তাব বর্জন করা হয়।

কলকাতার সম্মেলনে মালব্য, কেলকর, জয়াকর, প্রমুখের বিজয় সত্ত্বেও গান্ধীজী নেহেরু রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার বিষয়টিকে 'জনগণের জয়' বলে অভিহিত করেছেন। কলকাতার এই সম্মেলনে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করে।

১৯৩০-৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। সেইসব দাঙ্গার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এটা বলা যায় না যে, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রত্যক্ষ ও সাংগঠনিক মদত ছিল। বরঞ্চ বলা যায় বিভিন্ন স্থানে হওয়া দাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানীয় পরিস্থিতির জন্য তৎকালীন সর্ববৃহৎ কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং কিছু হিন্দু উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ও উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব এর জন্য দায়ী। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ডাকা সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি বৃহৎ আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৩০-এর 'আইন অমান্য আন্দোলন' এবং ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে ঐতিহাসিক নির্ণায়ক মুহূর্তে গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নেন। ফলত, সংগ্রামী মানুষের হতাশা ও ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল, তারই সুযোগ নিয়েছিল হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ জিন্নাহ-র নেতৃত্বে ক্রমান্বয়ে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান। দেশভাগ পূর্ববর্তী ১৯৪৬-এর যে ভয়াবহ কয়েকটি দাঙ্গা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' যার প্রত্যক্ষ মদতদাতা ছিল তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী। এই হত্যালীলার বিরুদ্ধে কলকাতার গোপাল মুখার্জীর (গোপাল পাঁঠা) নেতৃত্বে হিন্দুরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য গোপাল মুখার্জীর সাথে কোনো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের যোগাযোগ ছিল না। এছাড়া ভাগলপুর দাঙ্গা (হিন্দু দ্বারা সংগঠিত) এবং নোয়াখালির দাঙ্গা (মুসলিম দ্বারা সংগঠিত) এতেও কোনো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জন জ্যাভোস-এর মতে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন আছে, পার্থক্যও আছে। এটা ঠিক যে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ অনেকাংশে কাজ করেছে। তিনি আরও দেখাচ্ছেন যে, হিন্দু জাতীয়তাবাদ হ'ল একটি তত্ত্ব, যার ভিত্তিভূমি হ'ল একটি সাধারণ সংস্কৃতি যেটি হিন্দুত্বের ওপর আধারিত। এই তত্ত্বটির উৎস হ'ল, মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তত্ত্ব।

অপরপক্ষে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হ'ল, একটি বিতর্কিত বিষয়, যার মধ্যে নিহিত আছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক স্বার্থগুলি। এই স্বার্থগুলি সবসময়ই

অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশেষত ভারতীয় মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ও কার্যকলাপের জন্ম দেয়।

সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তাবাদ সর্বদাই একসাথে তুলনীয় নয়। কারণ, সাম্প্রদায়িকতা একটি ঐতিহাসিক অবস্থা যেটি কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব নয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটি চরমতম অবস্থা। ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার একটি সম্পূর্ণ বিরোধভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় উদ্ভূত একটি আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পুষ্ট করেছে। যার সঙ্গে জড়িত আছে ব্যক্তিগত নাগরিকত্বের দ্বারা গঠিত জাতিরাষ্ট্রের তত্ত্ব।

সুমিত সরকারের মতে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যে দুটি মূলগত ধারণা নিহিত আছে। একটি, সাম্প্রদায়িকতা ও অপরটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। এই দুটি ধারণাই আধুনিক ভারতের রাজনীতিতে একটি বিতর্কমূলক দ্বান্দ্বিক অবস্থান সৃষ্টি করে।

অনেক সময় হিন্দু জাতীয়তাবাদকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বলে অভিহিত করা হয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। এটাকে পরিভাষাগত বিচ্যুতি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিতর্ককে অনেক সময়ই অস্বীকার করা হয়। এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে কি কোনো ধারণাগত পার্থক্য আছে? তার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়। তবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ কীভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়? পিটার ভ্যান-এর মতে, জাতীয়তাবাদের একই তত্ত্বের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদ দুটিই একসাথে অবস্থান করতে পারে। এর মূলগত ধারণা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা একটি চরমপন্থী ধারণা এবং জাতীয়তাবাদ হ'ল, একটি মধ্যপন্থী ধারণা। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাকে দেখা যেতে পারে তুলনামূলক সামাজিক ধারণা হিসাবে। যেমন, একটি সরলরেখার দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে তাদের অবস্থান।

তথ্যসূত্র:-

১) The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics: 1925 to the 1990s : Strategies of Identity-building, Implantation and Mobilisation (with Special Reference to Central India) – Christophe Jaffrelot

২) আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৭০৭- ১৯৬৪ – সিদ্ধার্থ গুহ রায় এবং সুরঞ্জন চ্যাটার্জী

৩) শ্রী অরবিন্দ ও তাঁর বাণী

৪) চিন্তা চয়ন – মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর

৫) Khaki Shorts and Saffron Flags: A Critique of the Hindu Right – T. Basu, P. Datta, S. Sen, S. Sarkar and T. Sarkar

দেশী শব্দের বিলেত গমন

মৃণাল চৌধুরী

প্রবাস বন্ধু পুজো সংখ্যার জন্য লিখতে গিয়ে মনে হ'ল ভারতীয় ভাষার ইঙ্গ-যোগ নিয়ে কিছু লিখি। কয়েকদিন ভাবনাচিন্তা করে যখন লিখতে বসেছি, তখন ফেলে আসা দেশ থেকে একটি খবর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে প্রাণ জুড়িয়ে দিল। বাংলা ভাষাকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ধ্রুপদী ভাষার তালিকাভুক্ত করেছে। কারণটি কেন্দ্রের বঞ্চনা নামক একটি প্রচলিত ঘ্যানঘেনে অভিযোগ খন্ডনের সরকারী চেষ্টা নয়, একটি চমৎকার গবেষণার ফলশ্রুতি। গবেষণাটি জানিয়েছে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ২৫০০ বছর আগে। চতুর্দশ শতকের বাংলালিপিতে লেখা চর্যাপদের পান্ডুলিপির বহু শতাব্দী আগে বাংলা ভাষার জন্ম। রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা ইংরেজির জন্মও প্রায় একই সময়ে।

যাইহোক, তুলনামূলক ভাষা চর্চার সালতামামি এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমি এ কাজের জন্য উপযুক্তও নই। আমি একজন কৌতূহলী পাঠকমাত্র আর সামান্য লেখালেখি করি।

বাঙালির সম্বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। সঙ্গত কারণে আমরা এই সময়ে নিজেদের বাঙালিয়ানা খুঁজে পাই। এই খোঁজের ঝোঁকে আমি ফের একবার ফিরে তাকালাম ইংরেজি ও বাংলা, সঠিকার্থে সংস্কৃত ও তার গোত্রভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে ঘটে চলা শব্দহীন লেনদেনের কারবারে। না এই লেনদেনে বিকিকিনির ঢক্কানিনাদ নেই। জিহাদ নেই। বিবাদ বিসম্বাদ নেই। শুধু শান্ত আদান প্রদানের প্রবাহে প্রগতির পথে চলে এই যাত্রা।

ইংরেজি ভাষার যে দুর্বার গতি, তা এসেছে বিভিন্ন ভাষা থেকে বিবিধ শব্দ আত্তীকরণকে অবলম্বন করে। ইংরেজি ভাষা পন্ডিতরাই ইতিহাস খুঁড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, বর্তমান সময়ের ইংরেজিতে আছে পৃথিবীর সাড়ে তিন'শ ভাষা থেকে নেওয়া ঋণশব্দ বা লোন-ওয়ার্ডস। তাঁরা মুক্তমনে বলেও দিয়েছেন, শুনহ বিশ্ববাসী, ইংরেজি ভাষার মাত্র ২০ শতাংশ হ'ল আদি ইংরেজি।

এটাও ইতিহাসসিদ্ধ যে ইংরেজ উপনিবেশবাদ শুরু হবার আগে থেকেই এই অসবর্ণ মিলন তারা ছুতমার্গ না রেখেই চালাতে শুরু করেছে। ল্যাটিন, জার্মান, নর্ডিক, ফ্রান্স, স্প্যানিশ, আরবী, ফারসি, পর্তুগীজ, আইরিশ – সারা ইউরোপের প্রায় সবকটি ভাষা থেকে তারা ক্রমাগত শব্দ ধার করে গেছে নানা ধরনের যোগাযোগের মধ্য দিয়ে। তাগিদটা এসেছে তখনই, যখন ইংরেজরা কোনও দেশের সংস্পর্শে এসে সেখানকার বস্তু, কর্ম বা ক্রিয়ায় আকৃষ্ট হয়েছে এবং বুঝেছে তাদের জাতিতে সেগুলি গ্রহণযোগ্য হবে, অথচ তাদের ভাষায় সেগুলি প্রকাশের উপযোগী শব্দ নেই – তখন সে দেশে তাদের পরিচিতি যে শব্দগুলির মাধ্যমে, সেগুলি নিজদের জিভে ধাতস্থ করেছে। নিশ্চিতভাবেই ষোলআনা শুদ্ধতা ধরে রাখতে পারেনি, ঘটেছে ধ্বনির পার্থক্য। যুগে যুগে সেই উচ্চারণ আরও ভিন্নতর হয়ছে। এহেন শব্দঋণের মাত্রা বেড়েছে উপনিবেশ পত্তনের কাজ শুরু করার পর। তারা তখন আশ্রয় নিত অধিকৃত দেশগুলির কথ্য ও চলিত ভাষায় লেখা পুঁথিতে।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ জার্মানীর মাধ্যমে। কারণ জার্মানরাই ইউরোপে প্রথম সংস্কৃত ভাষা নিয়ে আগ্রহী হয়েছিল। ভারতীয় বণিকরা ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে বাণিজ্য শুরু করলেও ইংরেজ ভূখন্ডে পা রাখত না। উল্টোপুরান সাহেবরাই ঘটিয়েছিল। তবে সাহেবী ও বিলিতি, যা যথাক্রমে মূলত ফরাসী ও পর্তুগিজ এবং ইংরেজি ভাষা, তাদের সঙ্গে বাংলার শব্দ সংযোগ ঘটার কয়েক শতাব্দী আগে আমাদের ভাষায় ঢুকে পড়েছে আরব দুনিয়া ও মধ্য প্রাচ্য থেকে আসা সাম্রাজ্য বিস্তারকারীদের শব্দ। এই দলে ছিল আরবী, ফার্সি,

তুর্কী, আফগানীদের রমরমা। মোঘল যুগ নিকেশ করে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পর ধীরে ধীরে ভারতীয় ভাষায় ইংরেজির অনুপ্রবেশ শুরু হয়। ইংরেজরা তাদের শাসন ও শোষণ জোরদার করতে বিশেষভাবে নজর দিল ভারতীয় ভাষায়। ক্ষুরধার, ধুরন্ধর এই জাতটি বুঝে নিল ভারতীয় ভাষাগুলির প্রধান সূতিকাগার হ'ল সংস্কৃত। তখন তাদের পন্ডিতরা আদাজল খেয়ে লেগে পড়লেন সংস্কৃত চর্চায়; সাহায্য নিতে লাগলেন স্থানীয় পন্ডিতদের – এঁদের মধ্যে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ। এটা ছিল একটি দিক; অন্যদিকে, ১৮৭২ সালে ঘটল একটি উল্লেখ করার মতো ঘটনা, যা ইংরেজি ভাষায় সংস্কৃতসহ প্রধান এশিয়ান ভাষাগুলির শব্দ গ্রহণের সংগঠিত প্রথম প্রয়াস হয়ে দেখা দিল। ১৮৮৬ সালে দুই বন্ধু, স্যার হেনরি ইউল এবং আর্থার বার্নেল নামে ভারত-উৎসাহী সাহেব স্থানীয় নানা ভাষার বিভিন্ন শব্দ, যেগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করা সম্ভব নয়, সেগুলি সরাসরি নথিবদ্ধ করতে লাগলেন। দুজনের একজন ছিলেন ইংরেজ এবং অন্যজন স্কটিশ। তাঁরা সংগ্রহ করলেন ২০০০টি শব্দ, তাদের চলিত অর্থ ও উচ্চারণসহ। সবই অর্থ এবং উচ্চারণের নিক্তিতে যে নিখুঁত ছিল এমনটি নয়; এ নিয়ে বিতর্কও আছে। যেমন ধরা যাক 'বাবু' শব্দটি। ভারতীয় পরম্পরায় যার অর্থ ভদ্র, মার্জিত শিক্ষিত ও সম্মানীয় ব্যক্তি। দুই সাহেবের উপলব্ধিতে তার মানে দাঁড়িয়েছিল 'ইংরেজদের কর্মচারী, যারা শিক্ষিত ভারতীয় ও তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে যুক্ত ধনী ভারতীয়রা'। অভিধানের নামটি কিঞ্চিৎ অদ্ভুত, 'হবসন জনসন', যা ইসলাম ধর্মের দুই কিংবদন্তি 'হাসান হুসেন' নামের সাহেবী অপভ্রংশ। ১৯০৩ সালে উইলিয়াম ক্রুক এটিকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। অভিধানটি প্রশংসাও পেয়েছে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহলে; যেমন রুডইয়ার্ড কিপলিং থেকে সলমান রুশদি, অমিতাভ ঘোষ প্রমুখ সকলের কাছে। এরপর সময়ের জল যত গড়িয়েছে ভারতীয় শব্দ ততই নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে জগৎজোড়া ইংরেজি ভাষায় অনায়াসে সিঁধ কেটে চলেছে। কারণ হিসেবে আর একটি ডেমোগ্রাফিক সত্যকে স্বীকার করতেই হয়, যা হ'ল ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান ভারতীয়দের উপস্থিতি, যাদের মধ্যে বেশ প্রভাবশালী গুণীজনরাও আছেন; বিশ্বখ্যাত হরেক সংস্থা পরিচালনা করছেন তাঁদের অনেকেই। সুতরাং ভারতকে, একই সঙ্গে বাংলাকে ইংরেজরা আপাতত ভুলেও অগ্রাহ্য করার মতো হঠকারিতা দেখাবে না।

এবার দৃষ্টিপাত করা যাক ইংরেজি কথ্য ও লেখ্য ভাষায় অনবদ্য এবং বহুল ব্যবহৃত কিছু ভারতীয় শব্দের তালিকায়। ২০১৭-তে প্রাপ্ত হিসেবমতো সংখ্যাটি ছিল ৯৭০। এখন হলফ করে বলা যায় সেই সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে।

এদের কয়কটি হ'ল: –

গুরু: মূল সংস্কৃত, ভারতীয় প্রায়োগিক অর্থে যিনি শিক্ষকের থেকেও বড়, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, জীবনের আদর্শ। ইংরেজরা এর তুল্য কোন শব্দ নিজেদের দীর্ঘদিনের জানা ভাষা দুনিয়ায় খুঁজে পায়নি।

মন্ত্র: মূল সংস্কৃত, অর্থ হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বার্তা। ইংরেজিতে ঢুকে এর ব্যাপ্তি ঘটেছে মূলত ব্যক্তি ও বাণিজ্যিক সংস্থার দার্শনিক লক্ষ্য বোঝাতে।

সাধনা: মূল সংস্কৃত, কিন্তু ইংরেজিতে জায়গা করলেও সর্বজনীনতা পায়নি, ভারতীয় অনুষঙ্গই বহাল আছে।

বাংলো: উৎপত্তি বাংলা থেকে, তখনকার মতো এখনও বাগান ঘেরা সুন্দর বাড়িকে বোঝায়।

চাটনি: বাংলা, হিন্দীসহ বহু ভারতীয় ভাষায় এই শব্দটি ইংরেজি কন্ডিমেন্টকে শুধু স্বাদ আর বৈচিত্র্যের গুণেই স্থানচ্যুত করতে চলেছে।

চিতা: সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতের চিত্রা।

অবতার: সংস্কৃত থেকে সরাসরি ইংরেজিতে ঢুকে আজকের কম্পিউটার যুগে অদ্ভুত বিস্ময়কর অর্থ যেমন নিয়েছে, তেমনি তাদের 'ইনকারনেশন'কে প্রাচীণদের দলে ঠেলে দিয়েছে।

জগারনুট: আদিতে জগন্নাথ, যাকে ইংরেজরা করে দিয়েছে বিপুল ক্ষমতাবান কিছু, বিশেষ করে রাজনীতির আঙ্গিনায়।

খাট: সংস্কৃতে খট্ট থেকে হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া ও অহমিয়া খাট হয়ে ইংরেজির কট বা বিছানা হয়েছে। কটেজও ওই একই সূত্র থেকে আগত।

খাকি: আদতে ভারতীয় শব্দ, কিন্তু ইংরেজির কাঁধে চড়ে এখন একটি বিশেষ রং বোঝাতে সারা বিশ্বময় রাজত্ব করছে।

জ্যাগারি: ব্যুৎপত্তিতে তামিল শব্দ সক্কারি।

ক্যাশ: তামিল কাস্সুর (মুদ্রা) সরলীকৃত ইংরেজি।

শ্যাম্পু: এই শব্দের উৎস হিন্দী চাঁপো। শ্যাম্পু হয়ে ইংরেজরা একে বোতল বন্দী করে ১৭৬২ সালে।

অ্যানাকোন্ডা: অর্থ মহাসর্প; শব্দটি তামিলজাত। মূল শব্দ আনাই কোনদ্রান, যার অর্থ হাতির হত্যাকারী।

ভাষা এইভাবেই নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে চলে শুধু নিজেদের প্রাসঙ্গিক ও সমৃদ্ধ করার জন্য নয়, মানুষকে বার্তা দিতে যে – 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' থাকিবে সুখে। মানুষ যদি সত্যি ভাষার যাত্রাপথগুলি দেখে শিক্ষা নিত তাহলে এ বিশ্ব হতো 'শান্তি'র বাসভূমি।

বর্তমান জগতে স্বাভাবিক কারণেই ভাষার লেনদেন অবশ্যম্ভাবী। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন একে অপরের সঙ্গে যোগ সাধন করতে পারে অনায়াসে, সুতরাং এটি অবশ্যই আশ্চর্য নয় যে সেই মিলন মেলায় ভাষা আদান-প্রদানের একটি বড় রকমের ভূমিকা থাকবে। সারা জগতের ভাষার বিবর্তনে এটি অত্যন্ত আবশ্যক এবং সমীচীনও বটে!

পুনশ্চ:

আধুনিক সাহিত্যের কবি T. S. Eliot-এর প্রিয় শব্দ ছিল "শান্তি"। তাঁর "Waste Land" কাব্য শেষ হয় তিনবার শান্তি শব্দটি দিয়ে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সামান্য, তাই ভ্রাতৃস্থানীয় বন্ধুবর চিত্ত ঘোষের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তাঁর কাছে জানলাম অনেক কিছু; সেই ভরসাতেই লেখাটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম। চিত্তকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আত্মরক্ষার ত্রিশূল

বলাকা ঘোষাল

আত্মরক্ষা শব্দটা কি বাঙালি মেয়েদের মাথায় সবসময় থাকে? সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুধু কি কয়েকটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে? "থামবে কবে?" গাইছি যখন, তখনও কি আমরা ভাবছি আমার দিক থেকে কী করা যায় নিজের আত্মরক্ষার জন্য, বা নিজের প্রিয়জনের জন্য? তা যদি না করি, তবে "থামবে কবে"র বদলে কেবল হবে "কমবে কবে?" তাতে চলবে না।

আমি যখন এই ছোট্ট জিনিসটা তুলে ধরি আমার বন্ধুদের কাছে, বা দোকানে বাজারে যাদের সঙ্গে আলাপ আছে, তারা প্রায় সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। চোখ বড় বড় করে বলে –

"এটা আবার কী?"

এরা হয় পাক্কা সাদা-মেম, কালো-মেম, চিনে-মেম, বা দেশী-মেম। দু'একজন ছাড়া কেউ চেনার লক্ষণ দেখাননি। যাঁরা চিনলেন, তাঁরা কখনও কেনেননি। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই মেয়ে বড় করেছেন খুব যত্ন নিয়ে।

নিরাপত্তার ভাবনাচিন্তাকে ঘিরে চার রকমের মহিলা আছেন আমাদের মধ্যে – "আছে-আছে", "নেই-নেই", "আছে-নেই", আর "নেই-আছে"। হেঁয়ালির মতন লাগলে একটু খুলেই বলি। এই ধরুন, কারুর মনে সচেতনতাও আছে আর প্রতিকারের প্রস্তুতিও আছে। মা দুর্গাও এই দলে পড়েন। অসুরের সঙ্গে লড়বেন বলে আগে থেকেই শিবঠাকুরের ত্রিশূলটি নিয়েই এসেছেন।

বিশ্বব্যাপী অ্যামাজনের জঙ্গলে অনেকেই খুঁজে খুঁজে নিজের শখ বা প্রয়োজনের জিনিস কিনে থাকেন তো? কিন্তু আত্মরক্ষার কোনও জিনিস পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখেছেন কি? উত্তরটা আমার জানা আছে।

এখন আরেকটা জিনিস দেখাই? এটি চেনেন কি? বিদেশে থাকা বেশ কিছু লোক এটি চিনতে পারেন। এটি লঙ্কাবাটার স্প্রে। দশ ফুট কি পনেরো ফুট দূর থেকেও চোখে, মুখে, নাকে ছিটিয়ে দিয়ে অস্থির করে দেওয়া যায় মানুষকে।

বিপদ যে কত দিক থেকে না বলে হাজির হতে পারে জানা আছে কি? হয়তো বলবেন, "তা আর কী করে জানা থাকবে? ভবিষ্যতের স্বভাবই যে না বলে আসা।" বিপদের আঁচও যারা করতে পারেন না, তাকে আটকাবার ব্যবস্থাও তাঁরা নেননি। তাঁরা হলেন "নেই-নেই" দলে।

The Sanity Quadrant

নেই, আছে (- X, + Y)	আছে, আছে (+ X, + Y)
নেই, নেই (- X, - Y)	আছে, নেই (+ X, - Y)

X Axis: Safety Awareness
Y Axis: Planning for Safety

গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে পুরো বিপদের তালিকা অনেকের মুখস্থ। টিভি, মোবাইল, কাগজে কোনও ভয়াবহ খবর তাঁদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। এবার তাঁদের পথে বেরোনোর সময় বা বাড়ির সামনের দরজা বন্ধ করে শুতে যাওয়ার সময় যদি লক্ষ্য করা হয় তাঁরা কতটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন, তখন দেখা যাবে সেই কোটা এক্কেবারে শূন্য। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনায় লবডঙ্কা। এঁরা অবশ্যই "আছে-নেই" দলে।

আর যাঁরা সর্বক্ষণ ভয়ে জর্জরিত, তাঁরা রাতে ঘুমোন না। মাথার চুল হয় পেকে গেছে, নয় উঠে গেছে। পেট পরিষ্কার হয় না। অথচ ঠিক কী কারণে এত উদ্বেগ, সেটা জানলে ভাল হতো। নিরাপত্তার ব্যবস্থা সেই মান্ধাতা আমলের। অথচ ভয়টা টাটকা। বুঝতেই পারছেন, এটা হ'ল "নেই-আছে" দল।

উপরের এই চারটে দলের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট কারা বলুন তো? সবচেয়ে বোকাই বা কারা? আর সবচেয়ে হতভাগা?

তাঁদের চোখ-কান খোলা; আর নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থাও হাতের কাছে দশভুজার মতন। তবে না তৈরি মোকাবিলার জন্য! এঁরা হলেন "আছে-আছে" গোত্রের। তাঁরা বিপদের আভাসও চিনতে পারেন দূর থেকে, আর প্রতিরক্ষার হাতিয়ারও তাঁদের হাতের মুঠোয়। এঁদের ফাঁদে ফেলা সহজ নয়।

এবার বলুন আপনি কোন দলে পড়েন? যে দলেই পড়ুন না কেন, এখন একটু নড়েচড়ে সজাগ হবার সময় এসে গেছে। প্রথম ছবিটা দেখে চিনতে পারছেন না হয়তো কেউই। এটা হ'ল একটা টর্চ এবং অ্যালার্ম। বিপদ যদি খুব কাছে এসে পড়ে এটাকে চালু করে দিলেই দুষ্কৃতকারীদের চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এই টর্চের আলোও এত তীক্ষ্ণ যে হঠাৎ কারুর চোখের উপর ফেললে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তার ফলে আক্রান্ত মানুষ আততায়ীদের আওতার বাইরে চলে যাবার সুযোগ পাওয়া যায়। আর আওয়াজটাও এমনই বিদ্‌ঘুটে যে চারদিকে সাড়া জাগায়। ওটাই ম্যাজিকের মতন কাজ করে।

খারাপ লোকেরা গোপনে কাজ করতে ভালবাসে। সেখানে হঠাৎ লোক আকর্ষণ করা আওয়াজ হলে তাদের না পালিয়ে আর উপায় থাকে না। শরীরের শক্তি দিয়ে এদের সঙ্গে লড়ে জেতবার সম্ভাবনা বেশিরভাগ মেয়েদেরই কম। কিন্তু এই অস্ত্রটি আত্মরক্ষার জন্য অব্যর্থ।

ভাবছেন এসব সাহেবি ব্যাপার, দেশের মেয়েরা কোথায় পাবে এসব জিনিস! ইন্ডিয়ার অ্যামাজনেও দিব্যি পাওয়া যায়। আর বেশ সস্তাও। পেপার স্প্রে হ'ল দুশো টাকার মতন। আর

অ্যালার্ম পাঁচ'শ থেকে শুরু | তবুও আমি হলফ করে বলতে পারি ঘরে ঘরে মেয়েদের কাছে এই ছোট্ট জিনিসটি নেই, যেটি হাতের মুঠোয় দিব্যি এঁটে যেতে পারে | এটা হাতে নিয়ে রওনা হলে মা-বাবা একটু তো নিশ্চিন্ত হবেন বটেই |

তবু ধরুন কারুর কেনার ক্ষমতা নেই, বা কেনা হয়নি সেক্ষেত্রে একটা হুইসল সঙ্গে থাকলেও কিছুটা কাজ দেবে | আর অচেনা রাস্তায় অন্ধকারে হাঁটতে হলে একটা জটার-পেন ছোরা ধরার মতন হাতে রাখতে হবে | আর অবশ্যই থাকতে হবে সজাগ | সামনে পিছনে দৃষ্টি, দূরে কারা দাঁড়িয়ে, তাদের কী অভিসন্ধি, এসব জরিপ করতে হবে | চলতে ফিরতে যেটা হাতে না রাখলেই ভাল হয় তা হ'ল মোবাইল | ওই মোবাইল বস্তুটি বহু মেয়েকে এক্কেবারে মশগুল করে রেখেছে | আশেপাশে কারা কী করছে সেদিকে খেয়াল নেই | কাজেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র কাছে থাকলেই হবে না কিন্তু; ওটা ব্যবহার করার কৌশলও জানা চাই | সেটাও যথেষ্ট নয় | চোখ-কান খোলা এবং প্রস্তুতও থাকতে হবে অস্ত্র ব্যবহার করবার জন্য | এই ছোট্ট অস্ত্রটি যেন পার্সের গভীর খাঁজে বসে না থাকে | গুন্ডাকে অপেক্ষা করতে বলে ব্যাগের আনাচে কানাচে হাতড়ানো যাবে না | একটা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত জায়গায় না পৌঁছানো অবধি যেন অস্ত্রগুলো হাতের কাছেই থাকে |

একজন মহিলা বেশ কয়েক বছর জুডোর প্যাঁচের কায়দা শিখে দিব্যি পারদর্শী হয়ে উঠলেন | ভাবতে লাগলেন কোথাও কোনোদিন এটি প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে | ধাঁ করে কাৎ করে দেবেন দুষ্কৃতকারীকে | কিন্তু এমন কপাল যে সেই সুযোগ হয় কেবল ক্লাসের ফরাশে |

অবশেষে একদিন যেই না বাসে উঠতে যাবেন, চকিতে হয়ে গেল সুযোগ | পাশ থেকে এক যুবক মারল ব্যাগে হ্যাঁচকা টান | কিন্তু কোথায় গেল যুযুৎসুর সূক্ষ্ম ধরাশায়ী করা প্যাঁচ | চমকে গিয়ে উনি হাতে ধরা ছাতাটা দিয়েই মারলেন তার মাথায় | তখনকার মতন যাহোক কাজ হ'ল বটে, ব্যাগও সে যাত্রায় রক্ষা পেল | কিন্তু উনি মরমে মরে গেলেন | এতকালের এত প্র্যাক্টিস বৃথা গেল | জন্মজন্মান্তরে মহিলার সেই মাথায় বাড়ি মারা অভ্যেসই রয়ে গেল |

এবার দুর্গাপুজোয় বা কালীপুজোয় যা উপহার দিয়েছেন, তেমন থাক | উপহারের সুযোগ আরও পাবেন – মেয়েদের হাতে তুলে দিন এই অব্যর্থ আত্মরক্ষার ত্রিশূল – আওয়াজ, আলোর ঝলকানি আর লঙ্কাবাটার স্প্রে | আর তাদের বলুন সজাগ ও সচেতন থাকতে – তারা যেন "আছে, আছে"দের দলে থাকে সবসময় | দূর থেকে বিপদের আভাস যেন চিনতে পারে, সিঁদুরে মেঘ দেখে দাবানলের খবর পাওয়ার মতন |

পরিশিষ্ট:

বলাকা ঘোষালের নানা লেখার ফাঁকে একটা আত্মরক্ষার ইংরেজি বই তৈরী হচ্ছিল গত তিন বছর ধরে – 200+ Personal Safety Tips for Women – *Staying safe in a challenging world by planning in advance* | এখনকার ভয়ভীত পরিস্থিতি সেটাকে বেশ কিছুটা ত্বরান্বিত করতে পেরেছে | সেখান থেকেই একটা ছোট্ট ভাবনা এখানে পরিবেশন করা হ'ল |

বলাকা মনে করেন, আত্মরক্ষার ব্যাপারটা অনেকটা জুতো পরবার মতন | 'জুতা আবিষ্কার' কবিতায় তার প্রমাণ আছে – পৃথিবীর সব ধুলো চেষ্টা করেও দূর করা যাবে না, অতএব আশপাশটা যথাসম্ভব ঝাড়পোছ করে নিজের দুটি চরণ ঢাকলে অন্তত ওই আপদের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে | সবাই সুরক্ষিত থাকুন |

কমল-সংবাদ অথ ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

ইহা ব্রহ্মকমল নহে। তবু বেশ কয়েক রাত্রি জাগিয়া থাকিবার পরিকল্পনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া অবশেষে একদিন ভোরে ইহাদের প্রস্ফুটিত দেখিয়া মালিনী খুব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মকমল ফুটিয়াছে।

অতঃপর সপরিবারে বাহিরে আসিয়া, টুলের ওপর দণ্ডায়মান হইয়া নানাভাবে ইহার ছবি নেওয়া হইল। শুঁকিয়া দেখিলাম গন্ধ বিশেষ নাই। তবু ছবি তুলিবার অব্যবহিত পরেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কথাচ্ছলে যখন তাহাকে আমাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলিলাম, তিনি বলিলেন উহা ব্রহ্মকমল নহে, উহা এক প্রকার লিলি। ইহাও বলিলেন ভারতবর্ষে বহু মানুষ ইহাকে ব্রহ্মকমল জ্ঞান করিয়া উৎফুল্ল হইয়া থাকেন এবং নানাবিধ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি দেখাইলেও মাথা নাড়িয়া বলেন, যে ইহাই ব্রহ্মকমল। মালিনীকেও ভ্রাতার এই তথ্য বলিলাম, সেও মাথা নাড়াইল। বলিলাম, ব্রহ্মকমল কমলের ন্যায় গোলাকার হয়, ইহার তো নারীর সুশ্রী আঙ্গুল-হেন সরু সরু পাপড়ি কেবল! মাথা নড়িল। বলিলাম, ইহা ন্যূনতম সাড়ে চার হাজার ফিটেই ফুটিতে পারে, ইহা মোটেও ক্রান্তিবৃত্তীয় নহে, নিম্ন তাপাঙ্কের উদ্ভিদ; মাথা নড়িল না, কিন্তু বুঝিলাম কথোপকথন পছন্দ হয় নাই বিশেষ।

যাহা হউক, অফিস যাইবার সময় দেখিলাম ফুলগুলি ধীরে ধীরে তেজ হারাইতেছে। মনে হইল কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম, ব্রহ্মকমল ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। মনে হইল, ইহার চেয়ে তো পূজায় দিয়া, ভালমন্দ কিছু চাহিয়া লইলেই ভাল হইত। তারপর ভাবিলাম "ইহা তো ব্রহ্মকমল নহে"। ভাবিয়া, শান্তমনে গাড়িতে গিয়া স্টিয়ারিং-এ হাত রাখিলাম। ভাবিলাম, যে কমলই হউক, ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলিয়া সেই চির বরেণ্যর পানে এই উন্মুখ চাওয়াটিতে তো সেই একই নিবেদন। সে পূজা সফল করিয়াই সে ঝরিল, ঝরিবে, অনন্তকাল ধরিয়া, অনন্ত পুষ্পের সমারোহে। কে জানে, কাহার তরে এই তপস্যা, পুষ্পের, হৃদয়ের।

অনির্দেশ্য নওয়েগাঁও নাগঝিরা

অলোক কুমার চক্রবর্তী

পর্ব: ১

১৯৮১ সাল – আমি নাগপুরে সেন্ট্রাল হেড কোয়ার্টার্সে পোস্টেড। থাকি রামনগরে মামাতো দাদা দীপুদার বাড়িতে। ছয় কিলোমিটার দূরে সেমিনারি হিলস্-এর মাথায় অফিস (তখনো ওখানে টিভি টাওয়ার হয়নি। এখন জায়গাটা 'টিভি টাওয়ার' নামেই পরিচিত)। মহারাষ্ট্রে হলেও অফিসে বাঙালির সংখ্যা বিরাট, আর তাদের মধ্যে একাত্মতাও দারুণ। তার মধ্যে আমার বন্ধুস্থানীয়দের ৯০ শতাংশই থাকে সেমিনারি হিলস্ থেকে ডানদিকে নেমে অথবা সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাটে হেঁটে নেমে কাটোল রোড CPWD Colony-তে (এই শর্টকাট পথটি এখন বন্ধ)। অফিস ফেরৎ বেশিরভাগ দিনই ওখানে আড্ডা মেরে রাত বারোটায় ছ'কিমি পথ হেঁটে বা সাইকেলে ঘরে ফেরা আমার নিত্য রুটিন। এখানেই একবার কথা উঠল ডিসেম্বরে সবাই দলবেঁধে বেড়াতে যাওয়ার। প্রথমে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমাঢ়ীর নাম স্থির হয়েও খারিজ হয়ে গেল ওখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে। এদিক সেদিক নানান নাম নিয়ে চর্চা চলছে। তখন আমার বৌদি খবর দিলেন, পাশের ভাণ্ডারা জেলায় সাকোলির কাছে নাগঝিরা খুব সুন্দর বেড়ানোর জায়গা। জঙ্গল, লেক, থাকার ব্যবস্থা সব আছে। ওর পাশেই গোঠনগাঁও বাঁধ বা ড্যাম। আর এসব ব্যবস্থাপনার জন্য মনোহররাও খেডীকরকে চিঠি লিখে দিলেই হবে (তখন মোবাইল তো দূর কল্পনা, এসটিডি কলও চালু হয়নি)। খেডীকরের সঙ্গে দীপুদার বাড়িতেই আলাপ হয়েছিল। দীপুদার আশ্রয়ে ও আনুকূল্যেই উনি এখানকার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক হয়েছেন। এখন প্রচণ্ড প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী মানুষ, সাকোলিতে বাড়ি, আর 'অর্জুনি-মোরগাঁও তহশীল পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান।

তখন তো মাথা অত পাকা হয়নি, বেশ ওস্তাদি করে এক ইনল্যাণ্ড লেটারে (তখন এটা খুব চালু ছিল) ইংরেজিতে খেডীকরজীকে লিখে দিলাম যে, আমরা ১৬-১৭ জন ২৩ ডিসেম্বর বাসে সাকোলি পৌঁছাব। সেখান থেকে গোঠনগাঁও হয়ে নাগঝিরা ঘুরতে যাব। উনি যেন একটা ম্যাটাডোর ভ্যান জাতীয় বড় গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখেন আমাদের জন্য। এদিকে আমার এক প্রিয় সহকর্মী বন্ধু, অশোক নাগকে মাইথনের কাছে চিরকুণ্ডা ক্যাম্পে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম, "২২ তারিখে চলে এসো, বেড়াতে যাব" লিখে।

বিপত্তি শুরু হ'ল এর পর। বন্ধুরা ভরসা করতে পারল না, নাকি কে জানে, এক এক করে প্রোগ্রাম থেকে সরে দাঁড়াতে শুরু করল। একেক জনের একেক অজুহাত। শেষে যখন ১৭ জনটা ৫ জনে এসে দাঁড়াল, ওরা এবার আমাকেই পাল্টা চাপ দিতে লাগল এই প্রোগ্রাম পুরোই বাদ দেওয়ার জন্য। শেষ অবধি সবাই সরে গিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগল – "একা একা বেড়ানো হয় নাকি? ওসব অবাস্তব প্ল্যান ছাড়, এখানেই আমরা আনন্দ করব চল।" ময়মনসিংহ-র বাঙাল, আমারও বাঙালে গোঁ চেপে গেল। আমি কোনো কাজে নেমে পড়লে পিছিয়ে আসতে শিখিনি। এগিয়েছি যখন, একা হলেও আমি যাব। তাছাড়া, বিশ্বস্ত অশোক তো আসছেই।

বাধ্য হয়ে শেষ মুহূর্তে খেডীকরজীকে টেলিগ্রাম পাঠালাম বড় গাড়ি বুকিং বাতিল করে দুজন যাওয়ার মতো কিছু একটা ব্যবস্থা করে রাখতে। বন্ধুদের আর কিছু জানালাম না। অশোক ২২ ডিসেম্বর সকালেই চলে এল গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ধরে।

২৩ ডিসেম্বর সকাল ন'টায় নাগপুরের গণেশপেঠ বাস টার্মিনাসে এসে সাকোলির জন্য গোন্দিয়া রুটের বাসের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমাদেরই মতো বছর ২৫-২৬ বয়সী একটি ছেলের সাথে আলাপ হ'ল। ও বলল, "আপনারা নাগঝিরা তো এমনি যেতে পারবেন না। ওটা তো রিজার্ভ ফরেস্ট! অনেক টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে, গাড়িসহ পারমিশন করাতে হয়। আর নাগঝিরা, গোঠনগাঁও তো পাশাপাশি নয়! দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। তার চেয়ে হাতে যদি সময় থাকে 'নওয়েগাঁও বাঁধ'-এ চলে যান, গোঠনগাঁও-এর আগেই, খুব ভাল লাগবে। বরং গোঠনগাঁও-এর চেয়ে ভাল জায়গা। নওয়েগাঁওয়ে থাকার জায়গা আছে, গোঠনগাঁওয়ে তাও নেই।" কথায় কথায় জানা গেল, ও মনোহররাও খেডীকরকে ভালই চেনে। আরও বুঝলাম, আমার বৌদি শুধু জায়গা দুটোর নাম বলা ছাড়া বাকি সবটাই ভুল বলেছেন। ঠিক আছে, দেখি!

সাড়ে এগারোটার বাস ধরে সাকোলি পৌঁছালাম বেলা প্রায় আড়াইটে নাগাদ। বাসস্ট্যান্ডেই এক ছোট্ট হোটেলে রুটি

তরকারি খেয়ে নিয়ে খেডীকরের খোঁজে এগোলাম | মনোহররাও খেডীকর নামকরা লোক, এখানে সবাই বলে 'প্যাটেল' বা 'পাটিল', অর্থাৎ জোতদার বা অবস্থাপন্ন সম্মানীয় ব্যক্তি | সহজেই ওর বাড়ি পেয়ে গেলাম | কিন্তু বিপদ হ'ল, ওর বউ, ছোট্টখাট্টো ফরসা মহিলা, বেরিয়ে এসে মারাঠি ভাষায় জানালেন, খেডীকর বাইরে গেছেন ('আউট অফ স্টেশন' – মারাঠি লঙ্জে 'বাহেরগাঁও')| তখনো আমি মারাঠি ভাষায় তেমন সড়গড় হইনি, অল্প অল্প জানি | কাজেই আমাদের অন্য প্রশ্নের জবাবে উনি মারাঠি ভাষায় যা বললেন তার সবটা না বুঝলেও কাল ওঁকে দুপুরে পাওয়া যাবে এটুকু বুঝলাম | কী আর করা যাবে? শ্রীমতী খেডীকরকে আমরা কাল দুপুরে আসব জানিয়ে অশোককে নিয়ে বেরিয়ে এলাম | একটু অবাক হলাম, আমরা যে আজ আসব তা তো খেডীকরজীকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলাম!

স্ট্যান্ডে এসে নওয়েগাঁও যাওয়ার বাসের খোঁজ করতে জানা গেল পৌনে চারটের সময় বাস আছে | সাকোলি জায়গাটা NH-6-এর ওপর মুম্বাই থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে | বাঁদিকে চলে গেছে নাগঝিরার রাস্তা, বাস NH-6 ধরে কলকাতার দিকে কিছুটা এসে কোহামারা থেকে ডানদিকে আমরোরির পথ ধরল নওয়েগাঁও যাওয়ার জন্য | মহারাষ্ট্রের এই বিদর্ভ এলাকা বড়ই রুক্ষ, কাঁকরভরা ও পাথুরে, প্রধানত ফাইলাইট, স্লেট ও চুনাপাথরভরা জমি | মহারাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের মাটি কালচে, পূর্বাংশ লালচে সাদা | মাটি দিয়ে একটু উঁচু করা টানা রাস্তার মাঝখান দিয়ে কালো অ্যাসফল্টের পথ | দু'পাশে ফসল কেটে নেওয়া উঁচুনীচু কাঁকুরে জমি, হালকা মরা ঘাস ছেয়ে রেখেছে | মাঝে মাঝে লেবুর বাগান | আধঘন্টা মতো চলার পর দেখি দূরে বিলেতি ছবির বইয়ের পাখির বাসার মতো একটু উঁচুতে একটা দোচালা ঘর দেখা যাচ্ছে | ওরই কাছাকাছি আমাদের নামিয়ে দিয়ে কন্ডাক্টর বললেন, "বাঁদিকের ওই উঁচুতে উঠে এগোলেই নওয়েগাঁও বাঁধ গেস্ট হাউস পেয়ে যাবেন |"

নেমে দেখি জায়গাটা জনশূন্য তো বটেই, কোথাও একটা বাড়িঘরও নেই | অনেক দূরে কালচে পাহাড়ের সারি | একটু দূরে মাটিঘেঁষা এক নির্জন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, বোর্ডে নাম লেখা 'দেওলগাঁও'| বুঝলাম এটা গোন্দিয়া-বল্হারশাহ ন্যারোগেজ লাইনের স্টেশন | এখান থেকেই বাঁক নিয়ে রাস্তার সমান্তরালে রেললাইন চলে গেছে | উঁচু ওই পাখির বাসার মতো ঘরটি সিগন্যালের কেবিন | আমাদের বাঁদিকে ফাঁক ফাঁক করে দেওয়া তারকাঁটার বেড়ার ওপাশে কিছুটা জমি ছেড়ে মাটি দিয়েই বেশ একটু উঁচু করা টানা জমি চলে গেছে | ওর ওপরে সারি দিয়ে গাছ লাগানো | আক্ষরিক অর্থেই নির্জন ধূ ধূ প্রান্তরে পড়ন্ত বিকেলে আমরা দুজন আহাম্মকের মতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম |

পর্ব: ২

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে পিঠে ব্যাগ তুলে কপাল ঠুকে অশোককে নিয়ে ওই তারকাঁটার বেড়া ফাঁক করে ঢুকলাম | কিছুটা গিয়ে চড়াই ভেঙে উঠলাম উঁচু জায়গাটায় | দেখি, এটা একটা ফুট দশেক চওড়া মাটির বাঁধ, ওপাশেই কালচে সবুজ জলেভরা এক গভীর, কয়েক বর্গ কিমির হ্রদ, যার তিনদিকই নিচু থেকে মাঝারি উচ্চতার, শ'খানেক থেকে নিয়ে প্রায় হাজার দুয়েক ফুট পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ে ঘেরা | ড্যাম বা লেকের মাঝে মাঝে ছোট ছোট

দ্বীপ মতো আছে | মুগ্ধ হয়ে গেলাম প্রথম দর্শনেই | অনেকটা দূর থেকে পাখির কিচিরমিচিরের সঙ্গে যেন প্রচুর বাচ্চা ছেলে-মেয়ের কলকাকলি ভেসে আসছে, তেরছাভাবে লেকের বাঁদিকের অন্য পার থেকে | আমরা আছি লেকের দক্ষিণদিকে, আওয়াজ আসছে পশ্চিমদিক থেকে | সেই লক্ষ্যেই হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছালাম ঘন গাছগাছালিতে ঢাকা লেকের পশ্চিমপারে অল্প প্রশস্ত এক অঙ্গনে | ডানদিকে লেক, তার ওপর কাঠের সুন্দর জেটি, কয়েকটি বোট বাঁধা আছে, কয়েকটিতে কেউ কেউ প্যাডল বোটিংও করছে | দূরের দিকে লেকে নানারকম জলচর পাখি সাঁতার কাটছে | রাস্তা ও লেকের মাঝে বাচ্চাদের একটি পার্ক | স্কুল ইউনিফর্মে প্রায় শ'খানেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে পার্ক আর অঙ্গন আনন্দের হুটোপাটিতে মাতিয়ে

রেখেছে। ওরা এক্সকার্শনে এসেছে, একটু পরেই ফিরে যাবে। গাছগুলো নানা জাতের পাখির কলতানে মুখর। বাঁদিকে একটু উঁচুতে সারি দিয়ে গোটা দশেক কটেজ, তারপর ক্যান্টিন পেরিয়ে অফিস। এসবের পিছনেই প্রায় তিনতলা সমান উঁচু টিলা মতো জায়গায় অতি সুদৃশ্য এক বাংলো, তারও কয়েকধাপ উপরে আরও একটি, একটু বড় রেস্ট হাউস। অনেক উপরে একটি প্যাগোডার ছাউনির মতো মাঝে খুঁটি দেওয়া কাঠের আচ্ছাদন।

একে-তাকে জিজ্ঞাসা করে লেকের ধারে দেখা পেলাম এখানকার ইনচার্জ মিঃ ওয়াংখেড়ে-র। বেঁটেখাটো, অত্যন্ত সহৃদয় কিন্তু কমকথার মানুষ। বস্তুত এত হৃদয়বান ও উপকারী মানুষ আমি খুব কম পেয়েছি। আমাদের অনির্দিষ্ট ভ্রমণের কথা, খেডীকরের রেফারেন্স সব বললাম। সঙ্গে এও জানালাম যে, এখানে এসেছি যখন ফিরে যাব না। সব শুনে উনি হেসে ফেললেন। আসলে এখানে ঢুকতে হলে DFO Office-এ অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে অনুমতি নিয়ে, নিদেন এখানকার মেন গেটে নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে সাময়িক অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হয়। আমরা মেন গেট তো দেখিইনি, তাই টাকা দেওয়ারও ব্যাপার নেই! তারকাঁটার ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছি। তবে উনি আশ্বাস দিলেন, একে কলকাতার বাঙালি, তায় খেডীকরের লোক যখন, চিন্তা করতে হবে না। উনি বললেন, "আজ তো ঘর খালি নেই একটাও। একদম ওপরের 'অশোক বিহার ফরেস্ট রেস্ট হাউসে' অনেক ঘর, কিন্তু ওতে ফাটল দেখা দেওয়ায় মেরামতি চলছে। ওটা এখন বন্ধ। তার নীচে 'বনবিহার বাংলো' ভর্তি। নীচের কটেজও খালি নেই একটাও। তবু দেখছি। আপনারা বরং এখুনি ক্যান্টিনে রাতের খাবারটা বুক করে দিন। ওরা তো গোনাগুনতি খাবার বানায়, পরে আর পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না।" দুজনে দৌড়ালাম ক্যান্টিনে, রাতের জন্য রুটি-ডাল-সবজি-অমলেট বলে ফিরে এলাম ওয়াংখেড়েজীর কাছে। উনি বললেন, "আপনারা কি প্যাডল বোটিং করবেন? টাইম যদিও পার হয়ে গেছে, তবু আমি বলে দিচ্ছি, যান একঘন্টা বোটিং করে নিন।" মহানন্দে আমরা পাঁচ টাকা দিয়ে বোট নিয়ে লেকে একঘন্টা বেড়িয়ে ফিরে এলাম। বলে রাখি, এটা অত্যন্ত গরিবের ভ্রমণ, ফটো তোলার জন্য আছে আমার একটি Agfa Click 3 ক্যামেরা মাত্র। একটা ফিল্ম রিলে মাত্র চব্বিশটা ছবি তোলা যায়। এখনকার বেড়ুনেরা যা ভাবতেও পারবেন না। তবু তাইতেই ছবি তুলে যাচ্ছি। ওয়াংখেড়েজীকে বলেছি, কিছু না পেলে আমরা ক্যান্টিনের টেবিলে বা বেঞ্চে, নিদেন মেঝেতেও শুয়ে যেতে পারব।

অন্ধকার হয়ে আসছে। ক্যান্টিনে চা খেয়ে এদিক সেদিক ঘুরছি। ওয়াংখেড়েজী হঠাৎ এসে জানালেন, প্রতি কটেজে দুটি করে বেড আছে, সেভাবেই সবকটা ভরা। কিন্তু, প্রথম কটেজটিতে একজন সরকারী অফিসার, গোবর গ্যাসের ইন্সপেক্টর, একটি বেড নিয়ে আছেন। উনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা চাইলে অন্য খাটটি নিয়ে শুতে পারি। নামে সিঙ্গল-বেড হলেও খাটটি চওড়া আছে। আমরা তো হাতে চাঁদ পেলাম! ভাড়া? কটেজের ভাড়া দশ টাকা। আমরা অর্ধেক নিচ্ছি, তাই পাঁচ টাকা দিলেই হবে। মানে আমাদের একেক জনের ভাগে আড়াই টাকা! কয়েকধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে রেলিং দেওয়া চৌকো বারান্দা, তারপরই বিশাল মাপের ঘর, ভিতরে রান্নাঘর, বাথরুম। দরজা জানালা সবই কাচের।

ক্যান্টিনের নিয়ম অনুযায়ী রাত আটটার মধ্যে ডিনার সেরে ফেলতে হ'ল। একটি সাবধানবাণী পেলাম – রাতের দিকে এখানে লেপার্ড, ভালুক, বুনোশুয়োর ইত্যাদি নানা বুনো জন্তুর আনাগোনা হয়। বাইরে থাকা নিরাপদ নয়, অনুমতিও নেই। আমরাও লক্ষ্মীছেলের মতো টুক করে ঢুকে পড়লাম ঘরে। বিছানায় দুই বন্ধু কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে এর পরের সূচি নিয়ে চোখের ইশারায় তৈরি হতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যে, সেই গোবরগ্যাসের ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা তেমন সফল হ'ল না। খুবই বিরস বদন। আমাদের সাধারণ সৌজন্য-মূলক আলাপ বা প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত জবাব অত্যন্ত বিরসমুখে দিয়েই চুপ করে যাচ্ছেন। শুধু জানা গেল, ওঁর নাম ভি.এস. পাণ্ডোলে, বাড়ি ওয়ার্ধা জেলায়। বছর চল্লিশেক বয়স। এদিকে ভদ্রলোক কম্বলের ভিতর থেকে উঁকি মেরে আমরা কী করছি না করছি সেসব দেখেও যাচ্ছেন।

আমাদের তখনো মদ্যপানের তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি; এর আগে খাইনি এমন নয়। ক্যাম্পে প্রচণ্ড কড়া শাসনে থাকতাম। তবু কখনো যা খেয়েছি, তা অন্য এক্সপার্টদের তত্ত্বাবধানে। এবার নিজেরা এই প্রথম স্বাধীনভাবে একটি হুইস্কির 'হাফ' নিয়ে এসেছি। ছাপোষা ঘরের সন্তান আমাদের কাছে

ওটুকুই যেন অনেক বড় বিপ্লব। টেবিলে রাখা দুটো কাচের গ্লাস নিয়ে আমরা তোড়জোড় করতে করতে মিঃ পাণ্ডোলেকে অনুরোধ করলাম একটু নেওয়ার জন্য। উনি নাক দিয়ে একটা 'উঁঃ' জাতীয় শব্দ করে, খুব বিরক্তি দেখিয়ে খারিজ করে দিলেন, কিন্তু দেখছি কম্বলের ভিতর থেকে বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাদের ঢালাঢালিও দেখে যাচ্ছেন। ওঁর বুক করা ঘরেই আমরা আছি। একটু সংকোচও হচ্ছে। দ্বিতীয়বার বললাম, একই রকমভাবে খারিজ। একটু পরে তৃতীয়বার, "দেখুন, আমরাও রোজ খাই না। এই বেড়াতে এসেছি বলেই এটা আনলাম। আপনি সঙ্গে আছেন, আমাদের সঙ্গ দিলে আমরা একটু গল্প করতে করতে সময় কাটাতাম।" বলতে উনি যেন নিমরাজি হয়ে উঠে বসলেন। আমি আমার ব্যাগ থেকে একটি গ্লাস বার করার উদ্যোগ নিতেই উনি "কোই জরুরত নেহি, মেরে পাস বর্তন হ্যায়" বলেই চট করে বিছানা থেকে নেমে ওঁর ব্যাগ খুলে এক মাঝারি মাপের স্টিলের বাটি বার করে নিয়ে এলেন। আমরা কোনোমতে হাসি চেপে ওই বাটিতেই ওঁর মাপেরটুকু দিয়ে জল মিশিয়ে দিলাম। এবার ওঁর বিছানায় বসে ধীরে ধীরে গল্প শুরু করলেন।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, যাঁকে এতক্ষণ বেরসিক বিরসবদন ভাবছিলাম, এবং ইতিমধ্যেই যাঁর একটি বিশ্রী নামকরণ (গরুর পশ্চাদ্দেশের সঙ্গে মিলিয়ে) আমরা অনৈতিক-ভাবে হলেও করে ফেলেছি, তিনি আসলে এক বিশাল রসের ভাণ্ডার। গোবরগ্যাসের প্ল্যান্ট বসানো, এই গ্যাসের প্রচার ও প্রসারের কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয় তাঁকে। আর তাই গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রা ও সংসারের নানা ঘটনা, কূটকচালি, প্যাঁচপয়জার যেভাবে ধরা পড়ে তাঁর চোখে, কখনো বা নিজেকেও জড়িয়ে পড়তে হয় এসবের মধ্যে, তারই অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করে চললেন একের পর এক। ভাসুর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ছক কষছে, কেউ অসহায় মহিলার সঙ্গে ছলনা করে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার তাল করছে, কেউ অন্য দুই পরিবারের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে চাইছে নিজের স্বার্থে। আরও কতরকম! আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছি আর ভাবছি, মানবচরিত্র সম্পর্কে কী বিশাল দর্শন ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এই আপাত বেরসিক মানুষটি ধারণ করে আছেন! আসলে কেউ তো এসব শুনতে বা জানতে চায় না। তাই নিজের ভিতরেই গুটিয়ে থাকেন। হাতেধরা স্টিলের বাটিতে হুইস্কির তলানিটুকুর দিকে তাকিয়ে গভীর বিষণ্ণতায় পাণ্ডোলেজী দার্শনিকভাবে নিজের ভাষায় স্বগতোক্তি করেন, "য়া জগাত কিতী বিচিত্র মানস (mansaw) রাহতাত (এই জগতে কত বিচিত্র ধরনের মানুষ বাস করে)!" ওঁর কাছেই আরও পেলাম এই বাঁধ ও এলাকা সম্পর্কে অজানা ও চমকপ্রদ এক ইতিহাসের খোঁজ।

পর্ব: ৩

পাণ্ডোলেজী বলে চললেন – মধ্যভারতের এই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা প্রাচীনকালে প্রবল প্রতাপশালী গোণ্ড রাজাদের অধীন ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে পরাক্রমশালী গোণ্ড নৃপতি রাজা দলপৎশাহ বিয়ে করে আনেন রানী দুর্গাবতীকে। দুর্গাবতী রানী হয়ে এসেই রাজকার্য পরিচালনায় মাথা ঘামানো শুরু করলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রজাহিতমূলক কাজে। তিনি বুঝলেন যে, প্রজাদের স্থায়ী হিতসাধন করতে গেলে কৃষিকাজ ছাড়া গতি নেই। কৃষিই স্থায়ীভাবে প্রজাদের জীবিকা হতে পারে। কিন্তু কৃষির জন্য প্রয়োজন জল, আর জলের জন্য নির্ভর করতে হয় দেবরাজ ইন্দ্রের মর্জির ওপর – তিনি বজ্র দিয়ে মেঘ ভেঙে জল এনে দেবেন। রানী দুর্গাবতী এই দৈবানুগ্রহের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে থেকে জলের নিজস্ব উৎস সৃষ্টির জন্য আদেশ দিলেন প্রচুর পরিমাণ বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের। এটা ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। রাজা দলপৎশাহের রাজত্বের এই অংশে বাস করেন আদিবাসী কোহালি সম্প্রদায়ের মানুষ। ঘটনাচক্রে এই কোহালিরা ছিলেন অত্যন্ত উন্নতমানের ও দক্ষ নির্মাণকর্মী এবং আশ্চর্যরকম ভূতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভূপদার্থবিদ। আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগে যা অকল্পনীয়। প্রমাণ পাওয়া গেছে, এই কোহালিদেরই নির্মাণনৈপুণ্য ও স্থাপত্যজ্ঞানে গড়ে উঠেছে পুরী ভুবনেশ্বরের মন্দিররাজি এবং রাজস্থান, কাশ্মীর ইত্যাদির অনিন্দ্যসুন্দর লেকগুলি। রানী দুর্গাবতী গোণ্ডিয়া, ভাণ্ডারা, গড়চিরৌলি, চন্দ্রপুর ইত্যাদি এলাকা থেকেও এই কোহালি সম্প্রদায়ের মানুষদের এনে তাঁদেরই পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন এই এলাকায় কৃষিকর্ম শুরু করার। এখানে এসে তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়েরই লোকজন পেয়ে গেলেন। রাজা এঁদের উৎসাহ দিতে তাঁদের মধ্যে কৃষিজমি বিলি করে দিলেন আর 'প্যাটেল' বা 'পাটিল'

উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেসময় জমিদারি বা মালগুজারি (খাজনা আদায়কারী) প্রথা চালু হয়নি, তাই এঁরাই হলেন রাজস্ব আদায়ের অধিকারীও। কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় জলের যোগানের জন্য তৈরি করতে হবে বাঁধ ও জলাধার। এরজন্য দায়িত্ব দেওয়া হ'ল কোহালি সম্প্রদায়ের এক বিখ্যাত আদিপুরুষ বিজা পাটিল ডোঙ্গলওয়ারের বংশধর প্রবাদপ্রতিম দুই ভাই কোল্হু পাটিল ও চিমনা পাটিলকে। তাঁদের নেতৃত্বে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দেই নওয়েগাঁও লেক, অতিকায় ইটিয়াডোহ লেক, গোঠনগাঁও লেকসহ আরও অনেকগুলি বিরাট বিরাট জলাশয় ও জলাধার তৈরি হয়ে গেল। তাঁরা প্রথমেই এখানকার বারোটি গ্রামের ভূমিচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য সবার হাতে হাতে নতুন গ্রাম ও বসতবাড়ি তৈরি করালেন। প্রচুর গবাদি পশুকে কাজে লাগিয়ে জলাশয়ের কাটা মাটিতে জল ছিটিয়ে কাদামাটি তৈরি করে তাই দিয়ে পোক্ত বাঁধ তৈরি করে দেওয়া হ'ল যাতে জলাশয় বা জলাধারের জল বেরিয়ে না যায়। আবার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামা বৃষ্টির জল যাতে জলাধারে জমা হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রায় ২০০ ফুট ঢালু পথ তৈরি করা হ'ল পাহাড়ের দিক থেকে। লোকে বলে, নওয়েগাঁও বাঁধ তৈরির পর এক বিশেষ জাতের একটি মাছকে (পাণ্ডোলেজী বললেন 'ওয়াড়িস', এটি আমি চিনতে পারলাম না) তিরিশ তোলা সোনার গয়না পরিয়ে দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করে বাঁধের জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, সেই যুগে যখন দেশে তেমন পোক্ত মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল না, এই বাঁধ তৈরির শ্রমিকদের শঙ্খ ও কড়ি দিয়ে মজুরি মেটানো হতো। তাই দিয়ে তাঁরা অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারতেন। এরপর কোহালিদের জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতিই পাল্টে গেল। অরণ্যচারী জীবন ছেড়ে তাঁরা কৃষিজীবী হয়ে উঠলেন। রাজা ও রানী এঁদের অসাধারণ কাজে অত্যন্ত খুশি হয়ে কোল্হু কোহালি পাটিল ও চিমনা কোহালি পাটিলকে ওই এলাকায় রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। কোল্হু ও চিমনা-র ছিল সাত বোন। তাঁরা বোনেদের নামে একটি জলাশয় নির্মাণ করে উৎসর্গ করেন ও তার নাম রাখেন 'সাত বহিনী বাঁধ'। এখানকার মাটি ফাইলাইট ও ক্লোরাইটযুক্ত চুনাপাথরে সমৃদ্ধ। তাই এখানকার জল খুবই পরিষ্কার থাকে।

সারা মহারাষ্ট্রে পাওয়া পাখির প্রায় ৬০% প্রজাতি এবং অজস্র পরিযায়ী পাখি ছাড়াও নানা ধরনের জন্তু, যেমন লেপার্ড, স্লথ বেয়ার, বুনো শুয়োর, হরিণ, সম্বর, বাইসন ইত্যাদিতে ভরা জঙ্গল, পাহাড়, জলাশয় নিয়ে নওয়েগাঁও স্যাংকচুয়ারির আয়তন প্রায় ১৩৪ বর্গ কিমির মতো।

কোল্হু ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় রাখতে এখানে একটি পাহাড় ও তার নীচের জলাধারের নাম রাখা হয়েছে 'কোল্হাসুর' বা 'কোল্হু ড্যাম'। চিমনা কোহালি পাটিলের একাদশতম অধোপুরুষ মাধবরাও পাটিল সপরিবারে ও সসম্মানে বাস করছেন কাছেই 'ঢাবে-পাওনি' নামে এক গ্রামে। মাটির ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অথচ অজানা কাহিনীর হদিশ এক তাচ্ছিল্য করা মানুষের কাছ হতে পেয়ে আমরা যেন হারিয়ে গেলাম।

ভোরবেলায় প্রচুর পাখির ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের আলো পুবদিকের পাহাড়, লেক পেরিয়ে কাচের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে। মুখেচোখে একটু জল দিয়ে বার হয়ে এসেই ক্যান্টিনে সদ্য তৈরি ঘন দুধের চা পেয়ে গেলাম। দেখি, ওদিক থেকে মিঃ ওয়াংখেড়ে হাত নেড়ে ডাকছেন। লেকের ধারে যেতেই বললেন, "এক বয়স্ক দম্পতি লেকের ওপারে সঞ্জয় বনকুটিতে যাচ্ছেন মোটরবোটে। ওঁদের ওখানে বুকিং আছে। আপনারা যান, ঘুরে আসুন, খুব ভাল লাগবে। বোটকে বলে দিচ্ছি, আধঘন্টা অপেক্ষা করে আপনাদের নিয়ে ফিরে আসবে।"

- "ভাড়া?"

- "কিছু লাগবে না। ওঁদের পৌঁছে দিতে যাচ্ছে তো! এমনিই ফিরে আসবে। চলে যান।"

ভোরের হালকা আলোয় শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় জল কেটে চলল বোট। লেক জুড়ে অজস্র পরিযায়ী পাখি সাঁতরে

বেড়াচ্ছে। তখন এত পাখি চিনতাম না, তাছাড়া দূরবীনও ছিল না দেখার মতো। লেকের একটা দিক দিয়ে পুরো পার করে

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাহাড়ের নীচে ঘন জঙ্গলঘেরা 'মালডোঙ্গার দ্বীপে' এসে নামলাম আমরা। ছোট্ট কাঠের জেটি দিয়ে উঠে আসতেই সামনে এক রূপকথার রাজ্য যেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশ কয়েকটি ঝাঁকড়া গাছকে ভর করে তার ওপর শূন্যে পনেরো ফুট মতো উঁচুতে একটি বাংলো ধরনের বাড়ি। মহারাষ্ট্র বন দফতরের রেস্ট হাউস – 'সঞ্জয় বনকুটি'। (আমরা 'কুটির' বললেও মারাঠি শব্দটা 'কুটি')। লেকের দিকে মুখকরা অপূর্ব নকশায় সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি বাড়িটি। পাশের ঝোলানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। ঘরের মেঝে, দেয়াল, দরজা, জানালা তো বটেই, সমস্ত আসবাবও গাছ কেটেই তৈরি। আশ্চর্যের বিষয়, কোনো তক্তাই শুধু উপরিতল বাদ দিয়ে বাকিটুকু চেঁছে-ছুলে প্লেন করা নয়। খাট, ডাইনিং টেবিল, সেন্টার টেবিল, চেয়ার – সবই বিরাট বিরাট গাছের কাণ্ডকে একটু তেরছাভাবে স্লাইস করে কাটা। প্রয়োজনে একটির সঙ্গে আরেকটি জোড়া দেওয়া। কিন্তু কোনোটিই বাকলসুদ্ধ গাছের টুকরো ছাড়া কিছু নয়। নীচে পিছনদিকে অফিস, স্টোররুম, রান্নাঘর ইত্যাদি। একদিকে যেমন লেক, বাকি তিনদিকেই ঘন জঙ্গল, জল, তার পিছনে পাহাড়। নানা জাতের পাখির কলতানে পুরো জঙ্গল মুখর; অথচ এখানকার কালচে সবুজ পাতার শিরীষ, মহুয়া, সেগুন, আইন, ভর, গামারি ইত্যাদি গাছের চাপধরা গাঢ় অরণ্য ও জল পেরিয়ে পিছনের স্তব্ধ পাহাড় যেন সেই কলতানকে ছাপিয়ে এক গহন গাম্ভীর্যের আবহ তৈরি করেছে। অনেককাল আগে কুখ্যাত লুটেরা সম্প্রদায় পিণ্ডারি উপজাতির লোকেরা লুঠপাট বা হামলা করতে এলে এই এলাকার কর্মপ্রিয় কোহালি উপজাতির লোকেরা এই মালডোঙ্গার দ্বীপেই আশ্রয় নিতেন।

বেশ কিছুক্ষণ এই অপূর্ব গাছবাড়ি এবং আশপাশ ঘুরে আবার বোটে করে ফিরে এলাম মেনল্যাণ্ডে। ঘরে এসে মুলতবি রাখা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ক্যান্টিনে পুরি-সবজির টিফিন। এবার পিছনের অনুচ্চ পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে বানানো সিঁড়ি দিয়ে প্রায় তিনতলা মতো উঠে 'বনবিহার রেস্ট হাউস'। এর গঠন বোল্ডার ও কংক্রিটের হলেও নকশা খুবই সুন্দর। এটি পশ্চিম-মুখো। পিছনের ব্যালকনি থেকে লেকের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এর সামনে প্রায় দেড়তলা সমান উঁচুতে 'অশোক বিহার' নামে ফরেস্ট রেস্ট হাউস। আকারে অনেক বড়। কিন্তু এটির গায়ে ফাটল দেখা দেওয়ায় এখন প্রবেশ নিষেধ। বাইরে থেকে দেখে নিয়ে আরও অনেকগুলো ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম একদম চূড়ায় 'হাওয়াই ছত্রী'-তে। মাঝখানের মোটা স্তম্ভে ভর করে বিশাল কাঠের প্যাগোডা ধাঁচের ছাতা, মেঝে বাঁধানো, চারপাশে নিচু রেলিং। আর চারিদিক? ধূ ধূ প্রান্তর, লেক, জঙ্গল, পাহাড় – I am the monarch of all I survey!

পর্ব: ৪

প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ নেমে এসে ওয়াংখেড়েজীকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম বাসরাস্তায় এক অন্য পথ দিয়ে ঘুরে। এদিকেই মেন গেট একটা ছোট রাস্তার ওপর। সেখান থেকে বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে বাসরাস্তা। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বাস পেয়ে আবার এলাম সাকোলিতে। নাছোড়বান্দার মতো দুজনে আবার মনোহররাও খেডীকরের বাড়ি বেলা পৌনে একটায় হাজির। নওয়েগাঁওয়ে এবং চলার পথে সবার সঙ্গে আলাপচারিতায় একটা ব্যাপার বুঝলাম, খেডীকর এখানে খুবই প্রভাবশালী এবং সবার কাছেই অত্যন্ত মান্যজন। কিন্তু এবারও তাঁর শ্রীমতী এসে ভগ্নদূতের মতো জানান দিলেন, "প্যাটেল বাহেরগাঁওয়ালা গেলে হোতো। আতা পরয়ন্ত আলে নাহি।"

আমিও নিরুপায় ও নাছোড়। বললাম, "আমালা ত্রাস (উপায়) নাহি। আমি ইকড়ে বসুন বাট পাহতো (ওঁর রাস্তা দেখি)।" বলে দুটি চেয়ার টেনে নিয়ে ওই বাইরের ঘরটিতেই বসে পড়লাম। অশোক খোঁচাচ্ছে, "চলো কাটি। বেরিয়ে যা হোক ঠিক করা যাবে।" কিন্তু আমি জেদ নিয়ে আছি, খেডীকরকে না দেখে নড়ব না। ভাভীজী ভেতর থেকে একটু পরেই ঘুরে এসে জানালেন, "আতমধ্যে এয়া। প্যাটেল বোলওয়ত আহে।"

তাজ্জব ব্যাপার! এই বলল, প্যটেল বাইরে গেছে, ফেরেনি। আবার এখন বলছে, "ভেতরে আসুন, প্যাটেল ডাকছে!" খাট্টা মেজাজ নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই খেডীকরভাউয়ের হৈ হৈ করে উষ্ণ অভ্যর্থনা সব ভুলিয়ে দিল। জানা গেল, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হওয়ায় সারাদিন নানারকম উমেদারদের ভিড় লেগে থাকে। তাই ওঁর গিন্নি বা অন্য লোকজন প্রথম বাফারের কাজটা করেন। গতকাল বাইরে যেতে হয়েছিল ঠিকই, আজ চলে এসেছেন। গিন্নিও ওঁকে আমাদের কথা ঠিক বোঝাতে পারেননি। বিপত্তি একটা বাধিয়েছি আমিই, ওস্তাদি মেরে ইংরেজিতে চিঠি লিখে। বেচারা মারাঠি আর হিন্দি মাধ্যমে পড়া

মানুষ, চিঠির বক্তব্য সবটাই মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে। তার ওপর পরের টেলিগ্রামটা আরও গুলিয়ে দিয়েছে। আমরা আসছি, আসছি না, সতেরো জন আসছি না দুজন আসছি, গোঠনগাঁও হয়ে নাগঝিরা যাব (ভুল ভূগোল) – সব মিলিয়ে এক খিচুড়ি।

যাইহোক, ওঁর সঙ্গেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করার হুকুম হয়ে গেল। মারাঠি রীতিতে কাঠের পিঁড়িতে বসে সামনে নিচু জলচৌকির ওপর বিশাল থালায় ভাত ও রুটি, থালার চারপাশ দিয়ে গোটা আষ্টেক ছোট ছোট বাটিতে নানারকম ভাজা, সবজি, ডাল। ঘি-ও আছে। প্রথমে ছোট বাটিতে সবই অল্প অল্প দেওয়া, খাওয়া এগোচ্ছে আর বাটিগুলো বার বার ভরে দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যেই আলোচনা আমাদের নাগঝিরা যাওয়ার জন্য।

নাগঝিরা রিজার্ভ ফরেস্ট। বাইসন, ভালুক, লেপার্ড, বাঘ, হায়না ও আরও নানা বন্যপ্রাণীতে ভরা জঙ্গল। যেতে হলে ডিএফও (ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার), গোন্ডিয়া থেকে অনুমতি নিতে হয়, তাও আবশ্যিকভাবে গাড়িসহ এবং গাড়িরও বিস্তৃত বিবরণ দিতে হয়। ঢাকা গাড়ি হতে হবে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি – এই দু'মাস এটা নাগপুর ডিএফও-র অধীনে থাকে।

সাকোলি থেকে নাগঝিরা বাইশ কিলোমিটার রাস্তা। এগারো কিমি সমতলে গিয়ে চেকগেট, তারপর এগারো কিমি চড়াই পেরিয়ে রেস্ট হাউস, ইউথ হস্টেল ইত্যাদি। খেডীকরজী বললেন উনি ফোন করে ওখানকার রেঞ্জারকে বলে দেবেন, ওখানে ঢুকতে বা থাকতে আমাদের যেন অসুবিধে না হয়। কিন্তু যাওয়া কীসে? একটা মোটরবাইক উনি দিতে পারেন, তবে ওটার স্টার্টিংয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। অন্য গাড়ি এখন পাওয়া এবং তার পারমিট করানো অসম্ভব। আমারই প্রস্তাবে শেষটায় এসে দাঁড়াল দুটো সাইকেলে দু'ঘন্টা চালিয়ে পৌঁছে যাব। ওখানে যদিও ক্যান্টিন আছে, তবু এখানে ভিতর মহলে খেডীকরভাউয়ের হুকুম হয়ে গেল আমাদের রাতের খাবার তৈরি করে টিফিন ক্যারিয়ারে দিয়ে দেওয়ার জন্য। রুটি, আলুচোখা, ঘন অড়হর ডাল, আচার এই দিয়ে তিনবাটির এক ডাব্বা একটি ব্যাগে ভরে সাইকেলে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল।

বিকেল তিনটে নাগাদ একটু পুরোনো মতো দুটো সাইকেলে দুই অভিযাত্রী পিঠে ব্যাগ নিয়ে রওনা দিলাম। কলকাতামুখো পিচঢালা NH-6 থেকে বাঁদিক বা উত্তরদিকের লালমাটির কাঁচারাস্তা ধরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলে প্রথম বাধা এগারো কিমি-র মাথায় চেকগেট। বুক সমান উঁচু লোহার হলুদ রঙকরা শিটের ওপর আবার আলাদা কালো শিট কেটে তৈরি দুটো খ্যাপা বাইসন মাথা নিচু করে পরস্পরের দিকে তেড়ে আসছে, এমন ডিজাইন ঝালাই করে আটকানো। গেটের একপাশের অফিসঘরটুকু বাদ দিয়ে, গেটের কিছুটা আগে থেকে গেট পেরিয়ে কিছুটা পর্যন্ত দুপাশেই রাস্তার সমান্তরালে ট্রেঞ্চ খোঁড়া, বোধহয় মানুষ ও বন্যপ্রাণীর অনাকাঙ্ক্ষিত আসাযাওয়া ঠেকাতে। গেটের গার্ডদের পারমিট সংক্রান্ত যথোচিত প্রশ্নের জবাবে খুব স্মার্টলি বললাম, "আমি খেডীকরের সম্পর্কিত ভাই; আমাদের যাওয়ার কথা উনি রেঞ্জারকে ফোনে বলে দিয়েছেন। রেঞ্জারই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন।" দেখলাম, খেডীকরের নামটা সর্বত্রই মন্ত্রের মতো কাজ করে। বিনা দ্বিতীয় প্রশ্নেই সাদর অভ্যর্থনায় গেট খুলে গেল। আবার গড়াল দ্বিচক্রযান। একটু এগোতেই এতক্ষণের সামান্য অসমতল রাস্তা শেষ হয়ে শুরু হ'ল চড়াই, দুপাশের সেগুন, শিরীষ, মহুয়া, গামারি, শিশু, আইন গাছেদের জঙ্গলও গাঢ় হয়ে উঠল যেন হঠাৎ। লাল মিহি ধুলোয় সাইকেলের চাকা ডুবে যাচ্ছে। তারই মধ্যে চড়াই বেশি খাড়া হয়ে গেলে সাইকেল হাঁটিয়ে নিতে হচ্ছে। একসময় একটা ছাউনিঢাকা বড় পিকআপ ভ্যান প্রায় জনা পঁচিশেক হৈ-হুল্লোড়েমাতা লোকজন নিয়ে আমাদের পেরিয়ে চলে গেল। কোনো ট্যুরিস্ট পার্টি হবে, নিশ্চয়ই বুকিং আছে। আমরা ওদের গাড়ির উড়িয়ে যাওয়া ধুলোয় ঢেকে গেলাম। আলো কমে আসছে, ঠাণ্ডা বাড়ছে, গাঢ় জঙ্গলের জন্য ভয়ও লাগছে। বন্য জন্তুর প্রাচুর্যের কথা আগেই শুনেছি,

গেটেও সাবধান করেছে, "আরও আগে ঢুকে যাওয়া উচিত ছিল" মন্তব্যসহ | কিছুক্ষণ পরে সরকারী চিহ্ন দেওয়া গোটা কয়েক সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ও জিপের একটি ছোটখাটো কনভয়ও পেরিয়ে গেল আমাদের | শঙ্কা জাগল, এত সরকারী অফিসার ওখানে থাকলে ধরা পড়ার বিপদে পড়ব না তো? এদিকে চড়াইয়ে সাইকেল চালাতে জিভ বেরিয়ে আসছে | সন্ধ্যার প্রায় নিভে আসা আলোয় সাড়ে পাঁচটার একটু আগে পৌঁছালাম রেস্ট হাউস ক্যাম্পাসে | ছবির মতো সাজানো গোটা ক্যাম্পাস | হেজের চওড়া ফেন্সিং, লতা দিয়ে আর্চ করা গেট, সাদা নুড়ি বেলেপাথর ছড়ানো রাস্তা এদিক সেদিক গেছে | নানারকম ফুলের কেয়ারি ছড়িয়ে আছে | সামনেই দোচালা অফিসঘর, তার পিছনেই স্বচ্ছ জলের এক ছোট্ট স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে | সুদৃশ্য সাঁকো পেরিয়ে পর পর চারটি অপূর্ব কটেজ | তার ওপাশে ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, সোজা এগিয়ে গেলে ক্যান্টিন, তার বেশ কিছুটা দূরে ডানদিকে সারি দিয়ে বনবিভাগের কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স | ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস আর ক্যান্টিনের মাঝখান দিয়ে বাঁদিকে কোনাকুনি অনেকটা এগিয়ে ভিআইপি গেস্ট হাউস | এখানে অফিসঘর থেকে বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে ইউথ হস্টেল |

আমরা সাইকেল দাঁড় করিয়ে অনিশ্চিত পায়ে অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালাম | প্রায় জনা তিরিশেক বা বেশি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষজন, বেশিরভাগই যুবক, ইতস্তত জটলা করে গল্পগুজব করছে | কিছু ট্যুরিস্টও আছেন | ধুলোমাখা আমাদের চেহারা ও অপ্রত্যাশিত সাইকেল দেখে কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করতে খেডীকরের রেফারেন্সসহ আমাদের বৃত্তান্ত জানালাম | যথারীতি নাম শুনেই ওরা আনত | প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খেডীকরের অনুকম্পা লাভ করেছে | এরা সাকোলি এবং আশপাশ থেকে এখানে কন্সট্রাকশন ও রিনোভেশনের কাজ নিয়ে এসেছে | রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি, যোগাড়ে ইত্যাদি সবাই আছে | সাময়িকভাবে ইউথ হস্টেলে থাকছে | একজন গিয়ে এক ছোটখাটো মাপের বনকর্মীকে ডেকে আনল | তিনি সব শুনে জানালেন, আজ চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট, ডিএফও নাগপুর, ডিএফও গোন্ডিয়াসহ আরও কিছু কর্তাব্যক্তি এসেছেন | এখানকার রেঞ্জার ওঁদের সঙ্গেই এসেছেন এবং বড়কর্তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত | খেডীকরের ফোন তো ওঁর পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না | এখনও ওঁর কাছে পৌঁছান অসম্ভব | আবার বিনা অনুমতিতে এখানে থাকাও যাবে না | অথচ আমাদের ফিরে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই |

পর্ব: ৫

এবার ওই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নেমে পড়ল আমাদের মুশকিল আসানে | প্রথমেই স্থির হ'ল, আমাদের সাইকেল ও ব্যাগগুলো কারও নজরে পড়ার আগেই লুকিয়ে ফেলে সবার মধ্যে সাধারণ ট্যুরিস্ট বা কাজের লোক হিসেবে মিশে যেতে হবে | এজন্য সবচেয়ে বড় সহায় ক্যান্টিনের লতিফভাই | ওরাই আমাদের সাইকেল ও ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গেল, আমরা পেছন পেছন |

ক্যান্টিনের ঠিকাদার লতিফভাই ফর্সা, মোটাসোটা বছর চল্লিশেকের এক দিলখোলা মানুষ, স্পষ্টবাকও | ওঁর স্ত্রী স্বাস্থ্যবতী, কালো পাথরে কোঁদা চেহারা, সাদা ঝকঝকে দাঁতে অমায়িক ও আপন করে নেওয়া হাসি | সত্যি বলছি, আজ তেতাল্লিশ বছর পরেও অশোকের ও আমার মধ্যে প্রায়ই কথায় কথায় লতিফভাই, ভাভীজীর কথা উঠে আসে; মন ভরে যায় | কথায় যা বুঝলাম, ওঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বেশ বিরোধ আছে ওঁর স্পষ্টবাদিতা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করার জন্য | যাইহোক, সাইকেল ও ব্যাগ লুকোনো হয়ে গেল | স্থির হ'ল, আমরা একটু রাত হলে ইউথ হস্টেলে ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে শুয়ে পড়ব | ওখানে সিন্দুকে বাড়তি গদি, চাদর, বালিশ আছে | ওরা বার করে বিছিয়ে রাখবে | দরকার হলে আমরা একটু রাতে এসে ব্যাগ নিয়ে যাব | রাতের খাবার আমাদের সঙ্গেই আছে, সেটা লতিফভাইরা সময়মতো গরম করে দেবেন | উনিই কথাটা তুললেন, "আপনারা নাগঝিরা এসেছেন যখন, রাতের জঙ্গল না দেখলে কী করে চলবে! নাগপুর থেকে গভর্নমেন্ট প্রেসের লোকেরা বেড়াতে এসেছে | ওরা আমার চেনা লোক | বলে দিচ্ছি চলুন |" আমরা ওঁর কাছে পাঁউরুটি, অমলেট ও চা দিয়ে সান্ধ্য টিফিন সারলাম | তারপর লতিফভাই ট্যুরিস্ট লজে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করালেন সেই পিকআপ ভ্যানে করে আসা বিরাট দলটির নেতা ইসমাইলভাইয়ের সঙ্গে | উনি বলে উঠলেন, "আরে, আপনারা সাইকেলে আসছিলেন না? আমরা বলাবলি করছিলাম আপনাদের সাহসের কথা | চলুন আমাদের গাড়িতে

জঙ্গল দেখতে।" তারপরই ঝুলোঝুলি, ওঁদের পিকনিকের রান্না হচ্ছে পিছনের জঙ্গলঘেরা উঠোনে। আমাদেরও ওঁদের সঙ্গে খেতে হবে। শুধু ওঁর একটাই আফসোস, আমাদের রাতে শোয়ার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। কারণ, ওঁরা দলে আছেন পঁচিশজন, এখানে বেড আছে কুড়িটি। কাজেই ওঁদেরই কিছুটা ভাগাভাগি করতে হচ্ছে। বিনীতভাবে জানালাম যে, আমাদের খাবার সঙ্গেই আছে, আর রাতে শোয়ার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কাজেই ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। জানালেন, ওঁরা রাত পৌনে বারোটায় বার হবেন, আমাদের তার মধ্যেই চলে আসতে হবে। দারুণ ব্যবস্থা! লতিফভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম ফিরে এসে আমরা রাতের খাবার খাব। এখন তো সমস্ত জঙ্গলেই রাতে ঘোরা, বন্য প্রাণীদের বিঘ্ন ঘটানো নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তখন এসব ছিল না। নাগঝিরাও এখন বিখ্যাত 'টাইগার রিজার্ভ ন্যাশনাল পার্ক' হয়ে গেছে।

ঠান্ডা খুব জাঁকিয়ে নেমেছে। আমরা একটু এদিক সেদিক ঘুরেই ইউথ হস্টেলে ঢুকে পড়লাম। ফরেস্ট গার্ডরা আগেই বলেছিলেন, সন্ধ্যের পর বাইরে না থাকাই ভাল। পরশু দিনই নাকি এই চত্বরে বাঘ এসেছিল। পরেও অবশ্য এই কথাটা আমি আরও বহু জঙ্গলেই শুনেছি। সব জায়গাতেই নাকি সবসময় ওই পরশুই বাঘ বা কোনো হিংস্র জন্তু এসেছিল আর সে পরশুটা কেউই দেখেনি। ওরা কি হিসেব কষেই ট্যুরিস্ট আসার ঠিক আগের পরশুটাতে এসে ঘুরে যায়? কে জানে? ইউথ হস্টেলের বিশাল অডিটোরিয়ামের মেঝেতে এমাথা থেকে ওমাথা চারসারি মোটা গদ্দা পাতা। রাতে নাকি বনবিভাগের লোক মাঝে মাঝে চেকিং-এ আসে। তাই আমাদের শুভার্থী বন্ধুরা ঘরের একদম মাথার দিকের সারিতে মাঝখানে আমাদের বিছানা পেতেছে। নিজেদের চাদর, কম্বলের ওপর হস্টেলের লেপ চড়িয়ে শুতেই সারাদিনের ধকলে বোধহয় তাড়াতাড়িই ঘুম এসে গেল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা, ঘুম ভেঙে গেল জোরালো টর্চের আলোয়। বন বিভাগের লোক মারাঠিতে জিজ্ঞাসা করছেন, "ইকড়ে বাহেরচ্যা মানুস কোণি আহে কা?" সর্বনাশ! বাইরের লোককে খুঁজছে! সঙ্গীরা দু'তিনজন একদম দাবড়ে উঠল, "কায় বাবা, তুমচ্যা কায় ঝালা? আমি পূর্ণদিওয়স কাম করুন থকলো, বিশ্রাম করেল্যা নাই দেতে, আতা ইত্তি রাত্রিমধ্যে তুমি বিচারতা কি বাহেরচ্যা মানুস আহে কা? নাই ভাউ, ইকড়ে কাইচ্ নাই য়ে। আতা আমালা আরাম করু দ্যায়া।" ঝাঁঝ দেখেই টর্চের আলো বিদায় নিলেন। আমরাও হাঁফ ছাড়লাম। অনেক রাতে আবার শুনি এবার একটু চাপা গলায় কেউ ডাকছে, "জঙ্গল ঘুমনে কে লিয়ে কিসকো জানা হ্যায়, তৈয়ার হোকর আ যাইয়ে।" ধড়াচুড়ো তো পরাই ছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে এলাম। এগিয়ে দেখি লতিফভাই হাতে পান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। উনিই লোক পাঠিয়েছিলেন ডাকতে। বললেন, "ইতনি ঠণ্ডী মে দো দো পান মুহমে ডালকর চলিয়ে ভাইয়া। সুপারি হ্যায়, চবানে সে থোড়া গর্মী মহসুস হোগী।" অশোকের জন্য জর্দাপান, আমার জর্দা চলে না, তাই একটু মিষ্টিমশলা দেওয়া। কী বলি! কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ি। ওদিকে গাড়িতে সবাই উঠতে শুরু করেছেন। দুজন ফরেস্ট গার্ড সঙ্গে যাবেন। একজন রাস্তা দেখাবেন, অন্যজন তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নানা জায়গায় সার্চলাইট ফেলে বন্যপ্রাণী দেখানোর চেষ্টা করবেন। দেখি কড়া ঠান্ডায় সবাই পিকআপের ছাউনির ভেতরে বসেছেন, কিন্তু দুপাশে নেমে আসা ছাউনির অল্পই জায়গা কাটা আছে। সেখান দিয়েই সবাই দেখার জন্য কাড়াকাড়ি করছেন। আমি আর অশোক ওর মধ্যে না গিয়ে বেছে নিলাম ডালার একদম পিছনের গার্ড ওয়ালটা। ওর ওপর দাঁড়িয়ে ছাউনির ওপরের ফ্রেমটা ধরে রইলাম শক্ত করে। আমাদের বুকের মাঝামাঝি থেকে বাকি অংশটুকু ছাউনি ছাড়িয়ে ওপর দিকে বেরিয়ে রয়েছে।

পর্ব: ৬

গাড়ি চলেছে দুপাশ থেকে চেপেধরা গাঢ় জঙ্গল কেটে চলাপথ দিয়ে মাঝারি গতিতে। কেবিনের ছাদে বসা গার্ড এপাশে ওপাশে

সার্চ লাইট ফেলে নানাজাতের বন্যপ্রাণী দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা দেখছিও। গাছে বিশাল লেজ ঝুলিয়ে বসে

থাকা রংবাহারি ময়ূর, ঘাস খেতে খেতে চমকে তাকানো, কয়েকবার তো রাস্তার ওপরই গাড়ির আলোয় বিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়ানো বারাশিঙ্গা, চিতল হরিণ, লাফিয়ে পালানো খরগোশ – এসবই দেখতে দেখতে যাচ্ছি। গাড়ির আওয়াজে চমকে গিয়ে কিছু বাঁদরের হঠাৎ লাফালাফি করে ডাল বদলানো নিয়েও বেশ হাসাহাসি চলল। একবার সামনের দিকে একটু কোনাকুনি লাইট ফেলতেই দেখি, গাছপালা বেশ জোরে নড়ছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে যেতেই ডানদিকের জঙ্গল থেকে মাথা নিচু করে তীরবেগে ছুটে এসে সামনে দিয়ে রাস্তা পার করে বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল একজোড়া দাঁতাল বুনো শুয়োর। একটা ধুলোর ঝড় তুলে দিয়ে গেল যেন। একবার গাড়ি আস্তে করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। সার্চলাইটের আলোয় দেখা গেল গাছ ও ঝোপের আড়ালে কালচে খয়েরি চকচকে শরীর, চারপায়ে যেন সাদা মোজাপরা, অপূর্ব ছন্দে বাঁকানো শিং নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে

আমাদের পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে দুটি বাইসন। আমার মনে পড়ে গেল সেই অরণ্যদেবের (ফ্যান্টম) বাংগালার জঙ্গলে দুর্ধর্ষ পিগমি ব্যান্ডারদের গাছের আড়াল থেকে আগন্তুকের ওপর নজর রাখার রোমাঞ্চকর দৃশ্য। আরেকবার একটি মাঝারি আকারের জলাশয় পেলাম রাস্তা থেকে একটু দূরে। মাঝখানটায় কিছু ছোট ঝোপ ও ঘাসজমি। সেখানে চরে বেড়াচ্ছে কাছের দিকে একদল বারাশিঙ্গা হরিণ, আর উল্টোদিকে গোটা দশেক বাইসন। ইতিমধ্যেই আমার আর অশোকের এবং আমাদের সঙ্গে রড ধরে দাঁড়ানো অন্য দুজনের হাত, কাঁধ, মুখ যেন ঠান্ডায় অসাড় হয়ে গেছে। ডিসেম্বর শেষের ঠান্ডা খোলা হাওয়া সরাসরি এসে লাগছে। মাঝে মাঝেই মাথা নামিয়ে এনে ছাউনির ভেতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তাতে আবার দৃশ্য মিস! কখনো হাত অদল বদল করে কিছুক্ষণ করে পকেটে ঢোকাচ্ছি গরম করতে। তাও দেখি আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। গাড়ি কখনো একটু চওড়া রাস্তা, কখনো সরু জঙ্গলপথ ধরে এঁকে বেঁকে চলেছে, গতি মধ্যম। এক জায়গায় গাড়ি চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লাইটের লোক এক জায়গায় লাইট ফেলে রেখেছে। কারণ বুঝতে পারছি না। এদিকে আমাদের কথা বলার ওপরও নিষেধাজ্ঞা! একসময় দেখি, ওই লাইট ফেলা জায়গার ঝোপটা একটু নড়তে শুরু করেছে। কালো হলুদে ডোরাকাটা অপসৃয়মান পশ্চাদ্দেশ, পায়ের ফাঁকের অংশটুকু সাদাটে, এবং ওইরকমই ডোরাকাটা লম্বা লেজটাকে নিয়ে, যেন নিঃশব্দে দান ছেড়ে দিয়ে, মহারাজ আরও গভীর অগম্যে ঢুকে গেলেন আমাদের ক্ষণিক ও আংশিক কৃপা দর্শন দিয়ে। চিতল হরিণ এবং সম্বর পেলাম কয়েকবার, বুনো শুয়োর আরেকবার। একবার একটি হুড়মুড় করে ডালপালা ভাঙার আওয়াজে চমকে গেলাম। গাইড মশাই বললেন ওটি ভালুক ছিল, এদিকে আসছিল, গাড়ির শব্দে পালিয়ে গেল। আফসোস রইল, তার শুধু পালানোটা টের পেলাম, দেখা পেলাম না। কেউ কেউ অবশ্য বললেন দেখতে পেয়েছেন। ইল্যুশন কিনা জানি না। এই জঙ্গলে পাখিও আছে অনেক প্রজাতির, তবে সে তো দিনের বেলা ছাড়া দেখা সম্ভব নয়! বলে রাখি, নাগঝিরা রিজার্ভ ফরেস্টের মোট আয়তন প্রায় ১৫৩ বর্গ কিলোমিটার।

রাত আড়াইটের সময় ফিরে এসে যখন নামলাম, তখন দুই হাত আর কাঁধ থেকে নিয়ে মাথা – এই অংশের কোনো সাড় নেই। শরীরের ভেতরে হাড়সুদ্ধ কাঁপছে। আর এতক্ষণ একভাবে ডালার সরু গার্ড ওয়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের পাতাও যেন বেঁকে গেছে, পা পড়ছে এলোমেলো। এদিকে হাত মুঠো করতে পারছি না, কনুই থেকে ভাঁজও করতে পারছি না। টলতে টলতে লতিফভাইয়ের ক্যান্টিনে এলাম। ওঁরা দুজনেই জেগে গিয়েছিলেন গাড়ির শব্দে। আমাদের রাতের খাওয়া বাকি রয়েছে, এতক্ষণে খিদেও টের পাচ্ছি। আমরা গিয়ে বসে হাত পা ঘষে গরম করব কী, একটার কাছে আরেকটাকে আনতেই তো পারছি না। সময় আন্দাজ করে কিছুক্ষণ আগেই ভাভীজী স্টোভে খাবার গরম করেছেন। আঙুল ভাঁজ করে বা হাত মুঠো করে রুটি ধরতেই তো পারছি না, রুটি ছিঁড়ব কী করে? হাত প্রায় সাত-আট ইঞ্চির ব্যাসার্ধে এপাশ থেকে ওপাশে নড়ে যাচ্ছে। শেষে জোর করে হাতের পাঞ্জা দিয়ে রুটি চেপে ধরে অন্য হাতের পাঞ্জা দিয়ে টেনে ছিঁড়লাম। ডালে ভেজানো বা আলুচোখা কিংবা আচার ছোঁয়ানো তো অসম্ভব। নড়তে

নড়তে রুটির টুকরো কোনোমতে মুখে ঢুকিয়ে আলুচোখা আলাদা মুখে দিতে পারলাম। কাঁপুনির চোটে ডাল বাটি থেকে খানিকটা চলকে গেল। আচার তো ক্ষুদ্র বস্তু, সামনে পড়ে রইল, ছুঁতেই পারলাম না। তারমধ্যে নড়তে নড়তে ডাল খেতে গিয়ে অশোক বিষম খেল। ওই বিষমের ঝাঁকুনিতে ও হয়তো একটু চাঙ্গা হ'ল। খানিকটা খেয়ে আমাকেও কিছুটা খাইয়ে দিল। সব ওখানে রেখে টলতে টলতে আবার ইউথ হস্টেলের বিছানায়। মাথাসুদ্ধ লেপকম্বলের তলায় নিয়ে কাঁপুনিতে নড়তে নড়তে কখন যে ঘুমিয়েছি জানি না। বিছানা তুলতে হবে বলে ওই দয়াবান সঙ্গীরা ডেকে তুলল। ইউথ হস্টেলের টয়লেটের মেরামতি চলছে, তাই ব্যবহারযোগ্য নয়। ওরা দুটি জলভর্তি বোতল ধরিয়ে দিয়ে জঙ্গলের নিরিবিলি দিক দেখিয়ে দিল বড় বাইরের জন্য। ফিরতি পথে দেখতে পেয়ে দূর থেকেই ইসমাইলভাইয়ের উদার আহ্বান সকালের গরম চায়ের জন্য। খোলা আকাশের নীচে গতকালের উনুনেই ওঁদের চা তৈরি হয়ে বিতরণ হয়ে চলেছে অফুরান। এটারও খুব দরকার ছিল। দু'কাপ করে চা খেয়ে ওঁদের অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরলাম। ওঁরা তো রাতে ওইসব জন্তু জানোয়ার দেখে খালি ভাবছেন, কী অদম্য সাহস নিয়ে আমরা ওই সন্ধ্যেয় অন্ধকার জঙ্গল দিয়ে সাইকেল চালিয়ে এসেছি, তাও ২২ কিলোমিটার! জনে জনে এসে হাত মিলিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের আশ্রয়দাতা কর্মীদল তৈরি হচ্ছেন তাঁদের পেশাগত কাজে লাগবার জন্য। আমাদেরও বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। আমরা তো পুরোই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী এখানে! এই জায়গা হালকা হওয়ার আগেই আমাদেরই হালকা হয়ে যাওয়া উচিত। একটু এপাশ ওপাশ ঘুরে লতিফভাইয়ের কাছে এসে পুরি, আলুমটর সবজি, লাড্ডু দিয়ে নাস্তা ও চা পান সেরে আপ্লুত হৃদয়ে বিদায় নিলাম এই অমায়িক দম্পতির কাছ হতে। ওঁদেরও চোখ ছলছল, "ভাইজান, হমারে তরফসে রাস্তে কে লিয়ে ইয়ে রখ লিজিয়ে, হমে য়াদ রখিয়ে গা" – ভাভীজী নানারকম মিষ্টি মশলাভরা দুটি প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিলেন। চোখ ভরে এল জলে। কীভাবে যে আমাদের বাঁচিয়েছেন, উপরন্তু যে জঙ্গল সাফারি আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল, নিখরচায় সেটাও করিয়ে দিলেন। রাত জেগে খাবার গরম করে অপেক্ষা করলেন আমাদের ফেরার। অথচ, আমরা মাত্র দুবার ওঁদের ক্যান্টিনে টিফিন করেছি।

ন'টার সময় সাইকেল নিয়ে রওনা দিলাম ইসমাইল-ভাইদের গাড়ির প্রায় পেছন পেছন। এখন অত তাড়া নেই, টেনশনও নেই। আরামসে চালাচ্ছি সাইকেল। রাতে যা পাইনি,

এখন গাছে গাছে নানারকম পাখি বা পাখির আওয়াজ পাচ্ছি। কাল সন্ধ্যের কষ্টকর চড়াইগুলো এখন উল্টোপথে আরামদায়ক উৎরাই। এই শেষ ঢলানটুকু নামলেই ওই দূরে চেকগেট। ওটা পেরোলেই আমরা রিজার্ভ ফরেস্টের ও সমস্ত আইনি বিপদের আওতার বাইরে। চেকগেটে থামতে হবে, তাই ব্রেক চেপে চেপে ঢালে গতি নিয়ন্ত্রণ করে নামছি। হঠাৎ দেখি অশোক তীরবেগে সাইকেল নিয়ে গেটের দিকে চলেছে। "অশোক, স্পিড কমাও, স্পিড কমাও" – চিৎকার করছি! কোথায় কী! গতি বেড়েই চলেছে। গেটের দিকে মানে সোজা গিয়ে লোহার গেটে ধাক্কা মেরে চুরমার হয়ে যাবে! পাশে যাওয়ার উপায় নেই, দুদিকেই তো ট্রেঞ্চ! হঠাৎ দেখি অশোক সাইকেল ছেড়ে একলাফে নেমে ওই গতিতেই দৌড়তে দৌড়তে গেটের একটু আগেই বিশাল এক লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চ পার হয়ে গেল। গেটের লোকেরা এবং ছুটে আসা আমি, সবাই হতভম্ব। আমার তো হাত পা কাঁপছে। অশোক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "সাইকেলের ব্রেক ফেল; ব্যাটা কেটে গেছে।" বললাম, "এবার চলে এসো এপাশে।" ও বলল, "মাথা খারাপ! জীবনে এত বড় লং জাম্প দিয়েছি নাকি? ওই মোমেন্টাম আর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কিচ্ছু না ভেবে চোখ বুজে জাস্ট পা বাড়িয়ে দিয়েছি, পেরিয়ে গেছি। এখন আমাকে ওই মাথা পর্যন্ত ঘুরে, ফিরে আসতে হবে।" সাইকেলটা তুলে দেখি ব্রেকের লিফ্টিং স্টিকের মাথাটা ভেঙে গেছে। যাইহোক, ধাক্কা যে খায়নি এটাই বাঁচোয়া। গার্ডদের ঘরে একটু বসে জল খেয়ে আবার রওনা। ফরেস্ট গার্ডরা খেড়ীকর প্যাটেলের জন্য আমাদের মারফৎ তাঁদের প্রণাম পাঠালেন। এবার ঘরের দিকে আপাতত বাকি এগারো কিলোমিটার। চাকা গড়াল আবার। সাকোলি। খেড়ীকরের ঘরে স্নান খাওয়া সেরে বাস ধরব নাগপুরের।

উৎসব

হেনা দাস

আপামর বাঙালি সবচেয়ে বেশি মাতামাতি করে শারদোৎসব নিয়ে | প্রতি বছর শরৎকালে হিমালয়কন্যা উমা তাঁর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে আসেন পিতৃগৃহে – পাঁচদিন ধরে বাংলার ঘরে ঘরে বসে আনন্দের হাট | প্রকৃতিতে লাগে সেই উৎসবের পরশ – সোনাঝরা রোদ্দুর, কাশফুলের শুভ্রতা, শিউলিফুলের মিঠে সুবাসে চারদিক আমোদিত হয়ে ওঠে বছরের এই চার-পাঁচটি দিন | শুধু বাঙালি নয়, ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে | মহালয়ায় চন্ডীপাঠের মাধ্যমে দেবীর বোধন শুরু, দেবীপক্ষের সূত্রপাত আর আমাদের মনে আশা-আনন্দের দোলাচল – মা আসছেন শক্তিরূপিণী অসুরদলনী রূপে | মা আমাদের জগৎজননী, তিনি বোঝেন তাঁর সন্তানদের ব্যথা, তাই সন্তানদের প্রতি যাবতীয় অত্যাচার ও অপরাধের বিনাশ ঘটাতে তিনি আসেন | তিনি মানুষের মনের কলুষতা দূর করেন | মানুষের চৈতন্য ঘটে | শৈশব থেকে পুরাণের এই গল্প আখ্যান শুনে শুনে আমাদের মনেও এই প্রতীতি জন্মেছে | মা দুর্গা, যিনি এই জগৎ সংসারের পালয়িত্রী, তিনি আছেন আমাদের মাথার ওপরে, জগৎ সংসারের নিয়ন্তা তিনি, নারীশক্তির আধার রূপে পূজিতা – তাঁর দরবারে ন্যায় অন্যায়ের প্রকৃত বিচার হয় | এই বিশ্বাসেই আমরা শারোদোৎসবে মেতে উঠি |

কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া এক নির্মম বাস্তব ঘটনা আমাদের এযাবৎ বিশ্বাসের মূলে তীব্র কুঠারাঘাত করেছে | যে ঘোর অন্যায় সমাজে ঘটে গেছে তার বিচার এখনো হয়নি | প্রতিবাদ প্রতিরোধের বন্যা বয়ে গেলেও অপরাধীরা শাস্তি তো পায়নি বরং বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে | মেয়েদের শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অসুররূপী মানুষেরা তাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে নির্বিকারে | মাদুর্গা যেভাবে মহিষাসুরকে নিধন করেছিলেন, সেইভাবে অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারলে আমাদের মন শান্ত হবে না | এবারের উৎসবে আমরা মেতে উঠতে পারছি না | এ শুধু আমার আপনার কষ্ট নয়, সমগ্র বিশ্বের শুভ চেতনাসম্পন্ন মানুষের কষ্ট | বিশ্ব-জুড়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে | তবু অসুররূপী মনুষ্যাকৃতি দানবের মধ্যে কোনো হেলদোল নেই | চরম অরাজকতা চলছে সমাজে | এর প্রতিকার কি হবে না? যে নারীশক্তির আরাধনা আজ মণ্ডপে মণ্ডপে হচ্ছে, সেই নারীরই তো একটি অংশ অভাগিনী মেয়েটি | সমাজে ঘটে যাওয়া কিছু অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল বলে এই মেয়েটিকে অকালে প্রাণ হারাতে হ'ল | এমন করুণ মৃত্যু দেখে কি উৎসবে মেতে উঠতে মন চায়? উৎসব তো আনন্দের, সেই আনন্দের এক কণাও আজ আমাদের মনে জাগছে না | তবে কি পৃথিবীজুড়ে চলছে অন্ধকারের রাজত্ব? আলোর বেণু কি আর বাজবে না? আজ বাংলার প্রকৃতিতেও দুর্যোগের ঘনঘটা, অথচ শরৎকালের আকাশে প্রাকৃতিক নিয়মে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াবে পেঁজা তুলোর মতো | কিন্তু আজ বাংলার আকাশে কালো মেঘের ঘোরাফেরা, ভারী বৃষ্টিতে ভাসছে গ্রাম ও শহর | এ কি কোনো প্রলয়ের ইঙ্গিত নয়? হয়তো মা এইভাবেই জানান দিচ্ছেন – সমাজে দাপিয়ে বেড়ানো অসুরদের শেষ দিনের সংকেত বেজে উঠছে, আশা করতে ভাল লাগে, মায়ের আগমনে অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটবে | শুভবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে মানুষ তাদের আসুরিক প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটাবে | পাপীর দণ্ড বিধান হবে |

এই স্বপ্ন আমাদের বেঁচে থাকার আশ্বাস |

আসুন, আজ আমরা আবার কমলাকান্তের মতো করজোড়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করি –

"সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্বার্থ সাধিকে
ধর্ম অর্থ সুখ দুঃখ দায়িকে |...
আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর |
তুমি এই অনন্ত জলমন্ডল পরিত্যাগ করিয়া
এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার –
জগৎ সমীপে প্রকাশ কর |" {বঙ্কিমচন্দ্র}

বন সুন্দর, মানুষগুলিও

সুমিতা বসু

বেশ কয়েক বছর আগে এস্প্ল্যানেডে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়েছিল একটা বড় বিজ্ঞাপন, 'চলুন ঘুরে আসি, তিনদিন

আর দু'রাত্রি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সন্ধানে, চলুন সুন্দরবন'। এদেশে ফিরে আসার আগে অদ্ভুতভাবে গুনে গুনে ঐ তিনদিনই ছিল। সুন্দরবন: ঊষাতে গোধূলিতে যেখানে বাঘে মানুষে বাস! বেঙ্গল টাইগার দেখার শখ বহুদিনের, হাতের কাছে এই সুখবর, শুভস্য শীঘ্রম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পকেটে যা ছিল তাই দিয়েই অ্যাডভান্স বুক করে নেওয়া হ'ল। পরদিন গিয়ে বাকিটা দিলেই হবে। যথাদিনে, প্রথমে বাস, তারপর একটু রিক্সা ও সবশেষে লঞ্চ, গন্তব্য – সুন্দরবন। জিভে জল আনা খাওয়া দাওয়ারও উল্লেখ ছিল, সেসব ভাল মনে নেই তবে পরিষ্কার মনে আছে, তা পর্যটককে আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট।

পুত্র-কন্যাসহ আমরা একসঙ্গে চারজন। একটু বেশি টাকা দিয়ে, একটা ক্যুপ মতো নিলাম, পাশেই বাথরুম। লঞ্চ ছাড়তেই, 'চা'-এর সঙ্গে মুখরোচক 'টা' দিয়ে গেল একটি অল্পবয়সী ছেলে। আবার এও বলে গেল, একটু পরেই আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় অনেকেই বাঘ দেখে থাকেন, তাই লঞ্চের বারান্দায় বা ছাদে গেলে কপাল খুলতে পারে প্রথম দিনেই। একটু পরেই অবশ্য ডিনারের ডাক পড়বে, যেন দেরি না হয়। ইতিমধ্যে ইন্টারকমে ভেসে এল – অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, লঞ্চটা পাড় ঘেঁষেই যাচ্ছে, অতএব চাইলে ওপরে আসতে পারেন... অমনি হুড়মুড় করে সবাই ছাদে। কেউ কেউ খুবই প্রস্তুত, গলায় ঝুলছে বাইনাকুলার। তখনো সূর্যাস্ত হয়নি, তাই কারোর আবার সানগ্লাসেস আর হরেক রকম টুপির বাহার। বাঘ দেখার প্রয়াসের পাশাপাশি নানা ছবির মহড়া। সমাজ মাধ্যম যা করে দিয়েছে না! বনের রাজার সঙ্গে যেন আমরা সবাই রাজা! সে খবর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিতে হবে, অতএব সেলফোনে চলতে লাগল ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। ভাগ্য ভাল তখন এ.আই-এর (AI) যুগ ছিল না; তবে হয়তো ছবিতে দেখা যেত বাঘও পিছন থেকে সানগ্লাসেস পরে মুখ বাড়িয়ে বলছে, আই লাভ ইউ! এদিক ওদিক চোখ তল্লাশি চালিয়েও 'দক্ষিণরায়'-এর চেলার কিন্তু দর্শন পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যের পর প্রাণ ভরে মাছ-ভাত খেয়ে সবাই যে যার বিছানায়। পরেরদিন গোসাবা হয়ে একটা গ্রামে থামা হবে, সকাল ন'টার দিকে। গ্রামটির নাম 'বিধবা গ্রাম'। নাম শুনেই শিউরে ওঠার মতো। গোসাবাকে বলা হয়, 'গেটওয়ে অফ সুন্দরবন'। সুন্দরবন নামটা এসেছে এখানের সুন্দরী গাছের নামে, Sundari (Heritier littoralis)। গাইড জানালেন, সেখানে যেন বাঘের সঙ্গেই ঘর করা, জঙ্গলে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে যাওয়া, মোম-মধু আনতে যাওয়া বা কাঠ কুড়ানো, সর্বত্র দক্ষিণরায় তাঁর চেলাচামুন্ডা নিয়ে দর্শন দেন প্রয়াশই ও সুযোগ পেলেই আক্রমণ করেন, বিশেষত শীতকালে। এখানে জলে হিংস্র কুমীর, ডাঙায় ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত বাঘ। গোসবার বহু পরিবারে থাবা বসিয়েছে বাঘ, কেড়ে নিয়েছে অনেক আপনজনকে। আমরা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকাই দেখছি, কিন্তু শুনলাম এর তিন ভাগেরও বেশি অংশ বর্তমান বাংলাদেশে – ওদিকে আছে সাতক্ষীরার দিকটা। জায়গার হিসেব করলে, সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে, যার মধ্যে ৬,০০০ পড়ছে বাংলাদেশে আর বাকিটা ভারতবর্ষে। অসংখ্য নদীনালাভরা এই সুন্দরবন অঞ্চলে দুই বাংলা মিলিয়ে প্রায় পাঁচলক্ষ মানুষের বাস। এখানে সাধারণত দিনে দুবার জোয়ার-ভাঁটা হয়, জোয়ারে ছয় থেকে দশ ফুট পর্যন্ত জল উঠতে পারে, আর তখনই বাঘেরা সাঁতরে গ্রামের দিকে চলে আসে। ভাঁটায় আবার মাঝনদী অবধি দিব্যি হেঁটে যাওয়া যায়। এই নিরন্তর জোয়ার-ভাঁটার কারণ হ'ল তিনটি বিরাট নদী – ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গার বঙ্গোপসাগরে মিশে যাবার এটাই মোহনা। পৃথিবীর এই সুবৃহৎ মোহনা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তালিকায়ও আছে।

এরা ধর্মমত নির্বিশেষে বাইরে যাবার আগে, দক্ষিণরায় বা বনবিবির পুজো করে আশীর্বাদ নিয়ে বেরোয়, কিন্তু বিপদ তো আনাচে কানাচে, প্রতি বছরই এই সমস্ত এলাকা জুড়ে প্রায় পাঁচশো পরিবার কাউকে না কাউকে হারায়। এখানের একটি গ্রামের নামই তাই, 'বিধবা গ্রাম' – যে গ্রামে নিরন্তর চলে দিনরাত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা-মরা। গ্রামের নামেই

একটা বুক দুরুদুরু ভাব। বাঘ-বিধবাদের কষ্টের কথা অবর্ণনীয়। বেশিরভাগ সময়ই কোনো সরকারী সাহায্য হাতে পৌঁছায় না। চাল, তেল কেনার পয়সা কই? কোনোমতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন চলে, শ্যাওলা কুড়িয়ে সিদ্ধ করে, আর গামছায় চুনো মাছ ধরে একটু নুন হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে খেয়ে। মানুষ দিনরাত অসাম্যের শিকার, রূঢ় বাস্তব চোখের সামনে আবার বুঝিয়ে দিল।

রাতে নিরাপদ জায়গায় লঞ্চ রাখা হ'ল, কারণ সুন্দরবনের আদি বাসিন্দারা, অর্থাৎ বাঘ বাবাজীরা নিপুণ সাঁতারু আর অসম্ভব ক্ষিপ্রগতি, দাঁতালো নির্মম কুমীরের কথাও ভুললে চলবে না। রাতের খাবারের পর গাইড এসে গল্প জুড়ল আমাদের কেবিনের ঠিক বাইরে একটু খোলা জায়গায়। অনেকেই জড়ো হ'ল গল্প শুনতে, সকলের হাতে ধূমায়িত চা। বলাই বাহুল্য, অতুলনীয় আতিথেয়তা এই লঞ্চে। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের দুপাশের সার্চলাইটও জ্বেলে দেওয়া হ'ল। গাইডের নাম তরুণ বিশ্বাস। কর্মরত অবস্থায় বনবিভাগের এই অঞ্চলেই কাজ করেছেন দীর্ঘ ৩৫ বছর, অবসরের পর গাইডের কাজ করেন মাসে পনেরো দিন। এই বাড়তি আয়ে সংসারের লাভ তো আছেই, উপরন্তু আছে মনের আরাম। এটা তাঁর পেশার থেকেও বেশি নেশা ও ভালবাসা। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় সত্যিই তিনি জল-জঙ্গলকে ভালবাসেন মনের গভীর থেকে, আর জানেনও অনেককিছু। এই অঞ্চলের উদ্ভিদকুল অর্থাৎ flora fauna-র সঙ্গে ওঁর যোগ অঙ্গাঙ্গী ও অন্তরঙ্গ।

আড্ডা গল্প জমে উঠতে লাগল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন নিয়মিত বার্ড ওয়াচার আছেন। কোনো ভাল পাখিই দেখা গেল না নিয়ে তাঁদের মনে বেশ হতাশা! তরুণবাবু জানালেন, সুন্দরবনে চারশোরও বেশি প্রজাতির পাখির বাস; যাদের মধ্যে আবার ৫০-এর মতো প্রজাতি পাখি শুধু বিরল নয়, এদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। তবে সজনেখালি ইত্যাদি জনপ্রিয় ও জনবহুল স্থানে তারা আসে না, বিশেষ অনুমতি নিয়ে দেউলভারানি বা নুনমারী আর চামটায় যেতে হবে ওই পাখি দেখতে। সেই অঞ্চলগুলি 'ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফারদের স্বর্গ। চামটা অঞ্চলটি একেবারে বাংলাদেশ সীমান্তে। নানান হিংস্র জন্তু ছাড়াও জলদস্যুর ভয়ও আছে। আর তাদের হাতে পড়লে কোনো দেশই দায়িত্ব নিতে চায় না। তাই বলাই বাহুল্য, অনুমতি পেতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়। তরুণবাবু তাঁর সুদীর্ঘ কেরিয়ারে মাত্র তিনবার গেছেন ঐদিকে এবং একবার তো দিক ভুল হয়ে আরো দূরে চলে গিয়েছিলেন। তখন সন্ধ্যে হয় হয়, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল লোকালয় থেকে তাঁরা অনেক দূরে। মনে হচ্ছিল বিপদ যেন চারদিকে ওঁৎ পেতে আছে, সেই দল প্রাণে বেঁচে ফিরবে কিনা, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!

'তারপর? তারপর?' সমস্বরে শ্রোতাদের কণ্ঠে উঠল উৎকণ্ঠা। নিঝুম সন্ধ্যায় গল্প জমে উঠেছে লঞ্চে, বইছে হাওয়া, জলের নিরন্তর ছলাৎ ছলাৎ আর একঘেয়ে দুলুনি।

তারপর আর কি? তরুণবাবু শুরু করলেন, আমরা একমনে দুখের মতো 'বনবিবি' মাকে ডাকতে লাগলাম।

'মানে?' আমরা সকলে আবার প্রশ্ন করলাম। আমাদের মধ্যে কেউ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক নাম শুনেছি এখানকার লৌকিক দেব-দেবীর, এর মধ্যে দক্ষিণরায় যেমন বিখ্যাত, তেমনি আরো অনেকেই আছেন। আপনি সেগুলি বলতে ভুলবেন না।'

নিশ্চয়, তবে সেদিন বনবিবি মা আমাদের সত্যি বাঁচিয়েছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে ওই নিঃঝুম জায়গায় একটা জেলে নৌকো এসে হাজির। সেই মাঝিই আগে আগে দাঁড় বেয়ে আমাদের ঠিক পথ দেখিয়ে দিল। এরপর কোনোদিন যাইনি ওদিকে।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি, তরুণবাবু বলে চলেছেন। সুন্দরবনে ১০০টির বেশি ব-দ্বীপের মধ্যে শুধু অর্ধেক দ্বীপে মানুষের বসবাস। এই প্রায় দুর্গম অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবিকা প্রত্যহ সঙ্কটজনক ও ঝঞ্ঝাময়। দৈনন্দিন বিপাকে তাই প্রতিনিয়ত শরণাপন্ন হতে হয় লৌকিক দেব-দেবীর। এই অঞ্চলে 'দক্ষিণরায়' দানব, দুর্দান্ত পশু ও বাঘের দেবতা। পয়লা মাঘ বিশাল করে হয় তাঁর পুজো, এর সঙ্গে চলে পশুবলি। সুন্দরবন এলাকায় নৌকো পথেই যাতায়াত আর দাঁত বার করে জলের ধারে বা জলে অপেক্ষারত কুমীর। এদের হাত থেকে বাঁচতে পুজো হয় কুমীরের দেবতা 'কালু রায়'-এর। 'মাকাল ঠাকুর'কে বিশেষভাবে পুজো করে মৎস্যজীবী মানুষেরা – বিশেষ মূর্তিতে নয়, গাছের নীচে মাটির স্তূপ বানিয়ে বেল-পাতাতে সিঁদুর লেপেই পুজো। অরণ্যের দেবতা হিসেবে বনরক্ষক 'আটেশ্বর' দেবতার পুজোর প্রচলন আছে। আছে জঙ্গলজননী হিসেবে 'বিশালাক্ষী' দেবীর পুজো। বিষধর

সাপেদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলার অন্যান্য জায়গার মতো ভাদ্র সংক্রান্তিতে মা 'মনসার' পুজো তো আছেই | আর আছে রোগ-ব্যাধি ত্রাণকর্ত্রী মা 'শীতলা'র পুজো | কিন্তু সবথেকে জাগ্রত দেবী এই মা 'বনবিবি' |

শত শত বছর ধরে অরণ্যমাতা বনবিবি এই অঞ্চলের আরণ্যক সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে নিয়ে চলেছেন | তাই স্থানে স্থানে জঙ্গলে ঢোকার মুখেই বনবিবির মন্দির দেখা যায় | মানুষজন অত্যন্ত ভক্তিভরে এঁর পুজো সেরে পথে বেরোয় | বনবিবিকে নিয়ে অনেক গল্প প্রবাদ প্রচলিত আছে কিন্তু ধর্মমত নির্বিশেষে স্থানীয় সকলেই এই দেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত | কথিত আছে, বনবিবি ইব্রাহিম গাজির কন্যা | ইব্রাহিমের প্রথমা স্ত্রী, ফুলবিবির কোনো সন্তান না হওয়ায় আবার বিয়ে হ'ল

গুলালবিবির সঙ্গে | গুলালবিবি যখন সন্তানসম্ভবা ফুলিবিবি অসূয়াবশত তাকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয় | বনে জন্মাল যে অপূর্ব সুন্দরী ও শক্তিশালী কন্যা, তারই নাম বনবিবি আর তার ভাইয়ের নাম শাহ জঙ্গলি |

বনবিবির অলৌকিক শক্তির কাহিনী ঘিরে আছে দুখের কাহিনী | ধনা-মনা দুই ভাই আর তাদের ভাইপো দুখেকে ঘিরে বনদেবীর মাহাত্ম্যকথা লোকমুখে ফেরে | সপ্তডিঙা নিয়ে ধনা গেল গভীর জঙ্গল থেকে মোম-মধু আনতে | পিতৃহারা ছোট্ট দুখেকে তার মায়ের থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল তারা | কাঁদতে কাঁদতে মা দুখেকে বলে দিল, বিপদে পড়লেই মা বনবিবিকে স্মরণ করবি | দুখের গল্প চলতে লাগল... এদিক ওদিক ঘুরে কোথাও পাওয়া গেল না সেই মোম-মধু | সেই সময় ধনা শুনল এক দৈববাণী – এই গভীর জঙ্গলে যদি দুখেকে রেখে যাও, তোমার ডিঙা ভরে যাবে মোম-মধুতে | হ'লও তাই | আসলে সেটা নাকি ছিল দক্ষিণরায়ের নির্দেশ | দুখেকে কাঠ আনতে পাঠিয়ে, পাল তুলল সপ্তডিঙা | ব্যাঘ্র ও শ্বাপদসংকুল সেই জঙ্গলে বালক দুখে সম্পূর্ণ একা | ভয় পেয়ে হঠাৎ মনে পড়ল মায়ের কথা | একমনে সে বনবিবিকে ডাকতে লাগল | সদয়া বনবিবি এসে সব বুঝে শুনে একটি কুমীরকে ডেকে তার পিঠে চাপিয়ে দুখেকে মায়ের কাছে তার গ্রামে পাঠালেন | দুখেকে পেয়ে ও বনবিবির কৃপার কথা শুনে মা আনন্দে আত্মহারা | এই কাহিনী ক্রমশ প্রচার হতেই দিকে দিকে মা বনবিবির প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস তুঙ্গে উঠল | তারপর থেকেই স্থাপিত জঙ্গলে ঢোকার মুখে মা বনবিবির মন্দির | একটানা কথা বলে, তরুণবাবু একটু থেমে বললেন, সত্যি বলতে কি, ওই চামটার দিকে পথ হারিয়ে আমরাও একমনে বনবিবিকে ডেকেছি | তিনি সদয় হন ভক্তের ডাক শুনলে | মা বনবিবি মানুষের রক্ষাকর্ত্রী তো বটেই, তিনি বাঘ প্রভৃতি ভয়ানক প্রাণীদেরও দেবী |

লঞ্চের সব যাত্রী প্রায় হুমড়ি খেয়ে একমনে তরুণবাবুর গল্প শুনছিল | ইতিমধ্যে আর একবার চা দিয়ে গেছে | বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণরায়ের নিত্য ও নিয়মিত গোলযোগ নাকি সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বজনবিদিত | বাঘের দেবতা বলে দক্ষিণরায় মাঝে মাঝে বনবিবিকেও বিপাকে ফেলে | বাঘেরা মানুষের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হলেও, তারা কিন্তু বনেরই রাজা আর সেই রাজকীয়ভাব তাদের চলনে, গর্জনে, ভ্রমণে |

তরুণবাবু বলে চললেন, বাঘেরা কিন্তু চরিত্রগতভাবে অসামাজিক | এরা একা একা থাকাই পছন্দ করে | পছন্দমতো সঙ্গীর সঙ্গে মিলনের পর, স্ত্রী বাঘ সন্তান প্রসব করে একসঙ্গে দুই থেকে চারটে | সেই সময় মা-বাঘ, জলের কাছাকাছি কোনো নির্জন জায়গা বেছে বেশ কয়েকটা মাস কচিকাঁচাদের নিয়ে সেখানেই সময় কাটায় | ব্যাঘ্রশাবক জন্মায় অন্ধ হয়ে, দিন দশেক পরে দৃষ্টি পায় | মা বাঘ আদরে, যত্নে ওদের বড় করে | কয়েক মাস বয়স হলে একটু একটু করে জঙ্গল পরিদর্শনে বেরোয় তারা | তারও কিছুদিন পরে শেখায় শিকার করতে | আধমরা করে কোনো ছোট প্রাণী, হরিণ গোছের কিছু রেখে আসে একটু দূরে | ছানারা বাকি কাজ সারে | বনদপ্তরের লোকেরা টহল দিতে গিয়ে এইসব সূত্র দেখেই বুঝতে পারে কাছাকাছি বাঘ আছে এবং কোন অবস্থায় আছে | বাচ্চাসমেত মা বাঘেদের তখন ছুটে শিকার ধরার সময় বা ক্ষমতা থাকে না, তাই জলের আশপাশে খাবারের সন্ধানে তাকে ঘুরতে দেখা যায় | জলে তাদের সাঁতার দিতেও দেখা যায় |

তরুণবাবু বললেন, বনবিভাগ তথ্যসূত্রে খবর, আশপাশে দুটি মা বাঘ তাদের শাবকদের নিয়ে বাস করছে | কথাটা শোনার পর আবার যাত্রীদের কৌতূহল তুঙ্গে | নিস্তরঙ্গ জলে একটু ঢেউ দেখলেই, 'আরে আরে, ওই যে বাঘ, ওখানে ওখানে...' চলতে লাগল | তরুণবাবু একটু মুচকি হেসে আবার

বলতে লাগলেন, এরা সত্যি রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যাকে বলে রাজকীয় হাবভাব, চালচলন। পুরুষ বাঘেদের মধ্যে নিরন্তর চলে শক্তি আর ক্ষমতার লড়াই, কেউই বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র দেবে না, 'এলাকা দখল' যাকে বলে। তাছাড়া প্রেমিকা বা সঙ্গিনীঘটিত ব্যাপার তো আছেই। মিলনের ইচ্ছা হলে স্ত্রী-বাঘ নানান আওয়াজ তুলে, পুরুষ সঙ্গীকে ডাকে। সেই ডাকে অবশ্যই একাধিক ক্যান্ডিডেট ঘটনাস্থলে নিজেকে জাহির করতে হাজির হয়ে যায়। এখানেও স্বয়ম্বর সভায় শক্তিতে ও বল প্রদর্শনীতে বিজয়ী পায় মালা – তাই কিছুক্ষণ উদ্দাম মারামারি চলতে থাকে পুরুষ বাঘেদের মধ্যে। আচমকা এসবের মধ্যে পড়ে গেলে, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না কোনো মানুষ। সাধারণত বাঘেরা কিন্তু শিকার করে খুব নিঃশব্দে, খানিকটা বিড়ালের মতো। তাই বাঘকে বিড়ালের মাসি বলা হয় সঙ্গত কারণেই। অনেক সময় একটা বড় দল আগুপিছু হাঁটছে, হঠাৎ খেয়াল করল, শেষের মানুষটি নেই! এত চুপচাপ যে পাশের লোকও কখনো কখনো টের পায় না। গাইডের একথা শুনে শ্রোতারা সন্তস্ত্র – বোঝা গেল, পরদিন কেউই লাইনের শেষ দিকে যাবে না।

আড্ডা চলতে লাগল, বক্তা বেশিরভাগ সময়ই গাইড মহাশয়। বাঘ সম্পর্কে চলতে লাগল, কোর্স ১০১। বাঘেদের আয়ু ২০ থেকে ২২ বছর, তিন চার বছর থেকেই তাদের প্রজনন ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় চলে আসে। অবশ্য তার অনেক আগেই তারা মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে নিজের সাম্রাজ্য বা গন্ডি তৈরি করে নেয়। প্রাপ্তবয়স্ক বাঘেরা তিন থেকে বারো চোদ্দ বছর পর্যন্ত জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়ায়, তারপর একটু একটু করে বার্ধক্য আসে; আর এই বার্ধক্যজনিত কারণে পেটের জ্বালায় এদের লোকালয়ের কাছাকাছি ঘুরতে দেখা যায়, যদি ছাগলটা, গরুটা পাওয়া যায়! অনেক সময় পালিত পশু শিকারে বাধা দিতে গিয়ে মানুষও আক্রান্ত হয়। আর একবার মানুষের রক্ত খেলে সেই বাঘ কিন্তু এক কথায় ডেঞ্জারাস!

পরিসংখ্যানে বাঘ ক্রমশ বিরল অবলুপ্ত প্রজাতির অংশ; এদের সংখ্যা অস্বাভাবিক রকম কমে যাচ্ছে। এই উদ্বেগ থেকেই 'সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্ট' বা ব্যাঘ্র প্রকল্প, যা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের এক যৌথ প্রকল্প, শুরু হয় ২০০৫ সালে। অবশ্য ২০০৪ সাল থেকেই ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটার তত্ত্বাবধানে এর কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

পরদিন সকাল হতে আমরা এসেছি বিধবাদের গ্রামে। সজনেখালি অফিসের কাছাকাছি লঞ্চটিকে মাঝনদীতে নোঙর করে, ছোট নৌকোয় দু'তিনটে ট্রিপে সব যাত্রীদের আনা হ'ল পাড়ে। এখানেই Waxpol Ghat Tiger Camp জায়গা – গোসাবা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অংশ। নদীর পাড় ভেঙে জল ঢোকা এখানের নিত্য ঘটনা। আলও ভেঙে যায় ঘন ঘন। আল সম্পূর্ণ মাটির, তাই বৃষ্টি হলেই সঙ্গে সঙ্গে কাদা আর পিছল। কিন্তু বেলেমাটি বলে, তাড়াতড়ি শুকিয়েও যায়। আল দিয়ে লাইন করে যাত্রীদল সাবধানে হাঁটতে লাগল, সামনে গাইড তরুণবাবু, আর সবশেষে লঞ্চের এক কর্মী। ইদানীং বেশ কয়েকটা রিসর্ট বা ভ্রমণভিলা তৈরি হয়েছে এখানে। শুনলাম Waxpol নাকি সুন্দরবন অঞ্চলের প্রথম রিসর্ট। এই রিসর্ট-গুলিকে বাঁপাশে রেখে হেঁটে হেঁটে প্রথমে থামা হ'ল ধবধবে শুভ্রবর্ণ এক মন্দিরের সামনে, বনবিবির মন্দির। বিধবা পাড়া গ্রামটি ইদানীং ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, লোকসংখ্যা যথেষ্ট কম – পুরনো বাসিন্দারা মৃত অথবা সরে গেছে অন্য জায়গায়। একে বাঘের উৎপাত, তায় আবার গোগ্রাসী নদীও ডাঙাকে নিয়ত গ্রাস করছে। তবে এতগুলো রিসর্ট কেন নিয়ে কথাবার্তা, কানাঘুষোর উত্তরে তরুণবাবু জানালেন, স্থানীয়দের থেকে খুব সস্তায় জমি কিনে রিসর্ট মালিকরা ভালই ব্যবসা চালাচ্ছেন। বাড়িগুলোর চারদিকে অনেক উঁচু প্রাচীর, অনেক ইঁট-পাথর ফেলে জায়গাগুলিকে আধুনিক ও বাসোপযোগী করে নেওয়া হচ্ছে। যারা বেড়াতে আসে, তাদের আপ্যায়নের কোনোই অসুবিধা নেই। গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে স্থানীয়দের উদ্যোগে এখানে দুর্গাপুজোও হচ্ছে, সঙ্গে মেলা বসে। সেই সময়টা বড় আনন্দের। অনেক মশাল জ্বালানো থাকে যাতে বাঘের উৎপাত না হয়।

এই প্রসঙ্গেই তরুণবাবু শোনালেন একটি গল্প – একবার একটি দল নিয়ে এসেছিলেন তিনি; হঠাৎ বানের জোয়ারে লঞ্চ সরে গেল। জানা গেল, কিছুটা সময় লাগবে। ডাঙায় তখন উৎকণ্ঠিত দশ-বারোজন লোক, বিভ্রান্ত তরুণবাবু নিজেও।

কারো তক্ষুণি বাথরুমে যাবার দরকার, খিদেও পেয়েছে | পথে দেখা হ'ল এক মহিলার সঙ্গে | তিনি নিজেও বাঘ-বিধবা, ঘরে দুই মেয়ে | কোনোমতে নুন ভাত বা গামছায় ধরা চুনো মাছ দিয়ে খাওয়া | কিন্তু মনটা নদীর জলের মতোই স্বচ্ছ | সবটা শুনে তিনি সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের ঘরে | আশপাশের লাগোয়া বাড়ি থেকে সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল চৌকি, মোড়া | তৈরি হ'ল চা, সঙ্গে ঘরে-ভাজা মুড়ি ও বাতাসা | এদের আন্তরিক আপ্যায়নে যাত্রীদের চোখে জল | গ্রামের ভিতর দিকে গিয়ে বোঝা গেল দারিদ্র্য সেখানে প্রতিটি কোনায় কোনায়; যদিও ছেঁড়া শাড়ি ও ধুতি পরেও চোখে কৌতূহল আর মুখে সরল হাসি সদা বিদ্যমান | বিধবা গ্রাম ঘুরে আমরা দুপুরের আগেই ফিরে এলাম লঞ্চে | মন আজ আনন্দে ও বিষাদে ভরপুর | আজ যা দেখলাম তা মন ছুঁয়ে গেল, কপালে থাকলে কাল দেখব বাঘ!

পরদিন, সকাল থেকেই সাজ সাজ রব | আজ নাকি বাঘ দেখা যেতে পারে | এবারেও লঞ্চ মাঝ দরিয়ায় আর নৌকো চেপে আমরা ঘাটে এলাম | একটা লম্বা খাঁচার মতো জায়গা | এই জালের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হবে দুপাশের জঙ্গলে চোখ রেখে | খানিকটা হাঁটার পর আমাদের পূর্ব প্রজন্মের কিছু প্রাণীকে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে দেখা গেল | তাদের চালচলন দেখে গাইড জানালেন, নাহ, বাঘ বাবাজী কাছাকাছি নেই, তাহলে একটা হুলুস্থুল পড়ে যেত | বেশ কয়েকটা সুদৃশ্য হরিণ নিশ্চিন্তে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে | এই অভিজ্ঞতাটা চিড়িয়াখানার ঠিক বিপরীত, আমরা জালের রাস্তায় আর ওরা জঙ্গলে | এ সেই সনাতন আপ্তবাক্য, বন্যেরা বনে সুন্দর!

এবার ফেরার পালা | নৌকো করে লঞ্চে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে দুপুরের খাবারের ডাক | হঠাৎ একটা হৈ হৈ! 'কী? কী?' শোনা গেল কয়েক সেকেন্ড আগেই একটা বাঘ নদীতে সাঁতার কাটার সময় কুমীরের মুখোমুখি, সে ব্যাটা সোজা একেবারে U turn মেরে সটান জঙ্গলে পালিয়ে গেছে | লঞ্চের দু'একজন কর্মী সেটা দেখেই হাঁকডাক করছিল, কিন্তু এত দ্রুত ঘটনাটি ঘটে গেছে যে আমাদের দেখার সৌভাগ্য হ'ল না | বেশ নিরুত্তাপ কাটল বাকি দিনটা | অবশ্যই ভোজটা জমজমাট |

সেদিন আবার সন্ধ্যে থেকে আড্ডা বসল আমাদের ঘরের সামনের ফাঁকা জায়গায় | তরুণবাবুর ঝাঁপিতে অনেক অমূল্য রতন | কিন্তু সব গল্পই স্থানীয় সাধারণ মানুষদের নিয়ে – কখনো বীরত্বের, কখনো ভয়ের, কখনো ভালবাসার |

গল্পটি – এক যে ছিল পুত্তুর আর এক যে ছিল কন্যে | এই গল্পের সঙ্গে লায়লা-মজনু বা রোমিও-জুলিয়েট গল্পের তুলনা চলে | আদি অকৃত্রিম প্রেমে-কাহিনী | ছিল পড়শী | প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা তারা, গভীরভাবে ভালবেসেছিল একে অপরকে | সাক্ষী ছিল সুন্দরবনের কত শত গাছপালা-পাখি-বাঘ-কুমীর | দুই বাড়িতেই প্রবল আপত্তি – কারণটি সর্বজনবিদিত | ধর্মমত ভিন্ন | কিন্তু ওই যে, যার সাথে যার মজে মন...| তারপর একদিন গোপনে দুজনে বনফুলের মালা দিয়ে মালাবদল করল মা বনবিবির সামনে | পরদিনই মধু আনতে গিয়ে, বাঘে টেনে নিল তাকে | সে অনেককাল আগের কথা, সেই কন্যে আর বিয়ে করেনি কোনোদিন | ধাই-এর কাজ শিখে এই অঞ্চলে সে অক্লান্ত পরিষেবা করে যাচ্ছে | মাতৃজঠর থেকে নাড়ি কেটে যখন শিশুকে প্রথম কোলে নেয়, নবজাতকের চোখে খোঁজে তার হারানো প্রেমিককে | সেই ছেলেটির চোখ ছিল কটা, নাম সাহেব খান | মেঘে মেঘে অনেক বেলা হ'ল কিন্তু খোঁজার শেষ নেই | তার দৃঢ় বিশ্বাস সে নিশ্চিত ফিরে আসবে, আসবেই |

পরদিন সকালে লঞ্চ রওনা দিল ফিরতি পথে | রয়েল

বেঙ্গল টাইগারের দেখা না পেলেও দেখে এলাম তার সাম্রাজ্য | আর দেখে এলাম সুন্দরবনের সুন্দর মানুষগুলিকে | কেন পড়ে আছ এই বিপদের মধ্যে, এই প্রশ্ন করলে এরা নির্দ্বিধায় বলে, বাঃ রে, এ যে আমাদের নিজের জায়গা, নিজের ভিটে! কোথায় যাব এসব ছেড়ে? একেই বলে ভূমিপুত্র-ভূমিকন্যা! তরুণবাবুর মুখে গল্পগুলি শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, এই তো আমাদের ভারতবর্ষ, এই তো চিরাচরিত সত্য! এখানে প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনো ধর্মমতের ভেদাভেদ নেই, ভালবাসার ভাষা একই, পুঁথিগত বিদ্যা এখানে কাদামাখা মাটির কাছে গড় হয়ে প্রণাম জানায় ভৈরবী, পূরবী, আর মালকোষে | শুদ্ধ-কোমল-কড়ি স্বর সুর হয়ে ভেসে আসে সুন্দরবনের গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে শনশন হাওয়ায় হাওয়ায় |

"মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি |"

হুইটস্টোন ব্রিজ

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হুইটস্টোন ব্রিজ – বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপার নির্ভুল যন্ত্র।

পাটনা সায়েন্স কলেজে ফার্স্ট ইয়ার ফিজিক্স অনার্সের ছাত্রী বিদ্যুৎপর্ণা দাশগুপ্ত।

গ্যালভ্যানোমিটারের আলোর বিন্দুটা হলের দেওয়ালে বোঁ বোঁ করে পাক খাচ্ছে, মারাত্মক ভুল কানেকশন, শান্টটা রেড হট। ব্যাটারি শর্ট সার্কিট হয়ে নীল আভায় ঘর ভরে গেছে। দূর থেকে লেকচারার শিবসুন্দর চ্যাটার্জীর চোখে পড়েছে ঘটনাটা। সে আজকের ল্যাব ইনচার্জ। সায়েন্স কলেজে মাত্র দুটি হুইটস্টোন ব্রিজ আছে। পার্টস আনতে হয় লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে, এক্সচেঞ্জের জন্য বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। শিবসুন্দর পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে – "স্টপ ইট, স্টপ ইট। ডিসকানেক্ট দ্য ব্যাটারি, কাট দ্য শান্ট সার্কিট।" বিদ্যুৎপর্ণা কিংকর্তব্যবিমূঢ়; কেউ যেন তার হাতে হাতকড়া বেঁধে দিয়েছে। চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে; অহল্যার মতো সে পাষাণমূর্তি! কানেকশন কেটে দিয়ে শিবসুন্দর গ্যালভ্যানোমিটারের সাসপেনশন পরীক্ষা করছে; হাজারো প্যাঁচ পড়েছে নাইলন সাসপেনশনে, জট ছাড়াতে বেশ বেগ পেতে হবে। নিজের মনেই সে গজগজ করে চলেছে – "ইনকম্পিটেন্ট, নট স্যুটেড ফর ফিজিক্স" ইত্যাদি।

*****

চেয়ারম্যান রামনাথন স্ক্রিনিং কমিটি ডেকেছেন। প্রথম বছর ফিজিক্স অনার্সের ছাত্রছাত্রীরা এক সেমিস্টার পর স্ক্রিন্ড হয় – অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের অনার্স কোর্স থেকে পাস্ কোর্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; লিস্টের প্রথম নামই বিদ্যুৎপর্ণা দাশগুপ্তের। শিবসুন্দরকে সেদিন কমিটির সামনে স্বীকৃতি দিতে হবে। তার স্বীকৃতিটাই হবে চরম। গোল্ড মেডেলিস্ট, মেধাবী শিবসুন্দর চ্যাটার্জীকে ডিপার্টমেন্টের সকলেই খুব সম্ভ্রম করে। পর পর দু'বছর সে 'টিচার অফ দ্য ইয়ার' পুরস্কার পেয়েছে। তার মার্জিত ব্যবহারের জন্য চেয়ারম্যান রামনাথন তাকে খুব ভালবাসেন। শিবসুন্দর নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে পাটনা সায়েন্স কলেজের পুরনো ঐতিহ্যকে। এককালে মেঘনাদ সাহা এখানেই আয়োনোস্ফিয়ারের ওপর গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর সেই ধুলোপড়া অবহেলিত যন্ত্রে আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেছে শিবসুন্দর। সাহা আয়োনাইজেশান ইকুয়েশনের গ্যাল্যাক্টিক প্রমাণসিদ্ধতা নিয়ে সে কাজ করেছে। বহু যুগ পরে সায়েন্স কলেজ থেকে পেপার বেরিয়েছে বিখ্যাত মার্কিন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স জার্নালে। শিবসুন্দরের পেপার পড়ে অনেক দেশী-বিদেশী বৈজ্ঞানিকরা এসেছেন তার তৈরী 'আর এফ ফিল্টারিং' শিখতে।

*****

- "প্রফেসর চ্যাটার্জী, আপনার রেকমেন্ডেশনের জন্য কমিটি অপেক্ষা করছে –" রামনাথন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

শিবসুন্দর একটু অন্যমনস্ক ছিল; বলল, "ছাত্রীটি থিওরিতে ভাল তবে এক্সপেরিমেন্টাল স্কিলটা একটু কম। দেয়ার ইস রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট। আমার মতে ছাত্রীটিকে সেকেন্ড চান্স দেওয়া হোক।"

শিবসুন্দরের ভাষ্যটা বিনা প্রতিবাদেই গ্রাহ্য হয়েছে। বিদ্যুৎপর্ণার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে ট্র্যান্সফার লিস্ট থেকে।

মিটিংয়ের পর চেয়ারম্যান রামনাথন শিবসুন্দরের পিঠে হাত রেখে হাসতে হাসতে বললেন, "শিব, আই উইল হোল্ড ইউ রেস্পন্সেবল ফর হার মিসডিডস্। উই আর লেফ্ট উইথ এ সিঙ্গল হুইটস্টোন ব্রিজ।"

শিবসুন্দর সসম্ভ্রমে জানাল, "না স্যার, আমি রিপেয়ার করার কাজ শুরু করে দিয়েছি। শান্ট সার্কিট কাজ করছে। মিরর সাসপেনশনটা দু'সপ্তাহের মধ্যে অ্যালাইন করে ফেলব। ইংল্যান্ড থেকে মিরর অ্যাসেম্বলি আনবার দরকার হবে না।"

রামনাথন একটু মুচকি হাসলেন; অবিশ্বাসের হাসি। বললেন, "শিব, আই অ্যাম প্রাউড অফ ইওর স্মল মোটর স্কিলস্, কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট টুলস্ ছাড়া গ্যালভ্যানোমিটার মেরামত করা সহজ কথা নয়। হাঃ হাঃ, একশো টাকার বেট ফেললাম, প্লাস বাড়িতে ডিনার। গুড লাক, মাই বয়।"

*****

- "মে আই কম ইন স্যার?" মেয়েলি কণ্ঠের আবেদন।

সায়েন্স কলেজের চিলেকোঠায় শিবসুন্দরের রিসার্চ ল্যাব। কেউ বড় একটা আসে না এখানে। গভীর রাতে মাঝে মধ্যে দারোয়ান আসে লোটায় করে চা দিতে, আর চেতাবনি দিতে যে রাত আর বেশি বাকি নেই। আয়োনোস্ফিয়ারের এফ্ লেয়ার নিয়ে কাজ;

কাজ আরম্ভই হয় সূর্য দেবতা অস্ত যাবার দু'ঘন্টা পরে। নইলে বড় বেশি রেডিয়েশন নয়েস থাকে। ছাদের উপরের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে তবে চিলেকোঠা; তার চারপাশটায় খোলা ছাদ।

- "হু ইস দ্যাট? কাম ইন।" বেশ খানিক উদ্বিগ্ন হয়েই দরজার দিকে চেয়ে আছে শিবসুন্দর।

বিদ্যুৎপর্ণা দাশগুপ্ত! আকাশী রঙের শিফন শাড়ি পরেছে, নীল ব্লাউজ, মাথায় দুটো বেণী ঝুলছে, কাঁধ থেকে ঝুলছে বড় চামড়ার ব্যাগ।

- "ইউ? হোয়াট দু ইউ ওয়ান্ট?" শিবসুন্দরের গলার স্বরে বেশ ক্ষিপ্ততা।

- "আই কেম টু অ্যাসিস্ট ইউ স্যার। এটা তো আমারই মিসডিড্।" দৃঢ় অথচ শান্ত উত্তর।

- "খুব অন্যায় করেছ এখানে এসে।" শিবসুন্দর বেশ রাগান্বিত। মেয়েটির কি কোনো কান্ডজ্ঞান নেই!

- "কেন স্যার?" পাল্টা প্রশ্ন; "চেয়ারম্যান রামনাথন বললেন আপনার সাথে কাজ করলে স্মল মোটর স্কিল ইমপ্রুভ করবে।" গলার স্বরে অনুকম্পা আছে তবে কোনও অনুতাপ নেই।

- "চটি পরে লোহার সিঁড়ি থেকে পড়লে তোমার মা বাবাকে কী কৈফিয়ত দেব? একবার তো তোমার জন্য লজ্জার মাথা খেয়ে ডিপার্টমেন্টের কাছে কৈফিয়ত দিয়েছি।"

- "সরি স্যার, ভেরি সরি। আপনার ল্যাবে যে ড্রেস কোড আছে জানতাম না। শাড়ির সাথে কেডস্ পরলে সকলে খুব খ্যাপাবে। তা খ্যাপাকগে যাক, ওয়ার্ক ইস ওয়ার্ক; কী বলেন স্যার?"

শিবসুন্দর হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না। মেয়েটি কথার ঝুড়ি, তবে খুবই সরল। সরলতার কাছে হার মানা ছাড়া যে কোন উপায়ই থাকে না। হাসি চেপে শিবসুন্দর বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, আর কথা না ব্যয় করে এই নাইলনের সুতোটা ধরে হেঁটে হেঁটে টান করো। আমি এই দিকটা বেঁধে দিচ্ছি।"

শিবসুন্দর মিরর অ্যালাইনমেন্ট করতে তন্ময়। মনোযোগের সঙ্গে কোসাইন ফোর্থ কারেকশন করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মনে হ'ল মেয়েটি গেল কোথায়? দরজার কাছে গিয়ে যা দেখল তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বিদ্যুৎপর্ণা সুতো টান করতে করতে আলসের ওপর চলে গেছে। চটির আধখানা শূন্যে ঝুলছে। তখনও সে নাইলন সুতোর জট ছাড়াচ্ছে। শিবসুন্দরের বুকটা ধকধক করছে। চারতলার ছাদ থেকে পড়লে এক্কেবারে কংক্রিটের পার্কিং লটে। আচমকা শব্দ করলে বেকায়দায় পড়ে যেতে পারে ভেবে নিঃশব্দে এক পা এক পা করে এগিয়ে ঝপ করে বিদ্যুৎপর্ণার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েছে শিবসুন্দর; টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই ছাদে উল্টে পড়েছে। পড়ার ধাক্কাটা শিবসুন্দরই নিয়েছে, বিদ্যুৎপর্ণা পড়েছে তার বুকের ওপর। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা। তারপর দুজনেই এমন একটা ঘটনার জন্য হাসছে।

শিবসুন্দর ব্যঙ্গ করে বলেছে, "মিস্ দাশগুপ্ত, তোমার শুধু স্মল মোটর স্কিলই নয়, বিগ মোটর স্কিলও খুব খারাপ।"

অভিমানের ভান করে বিদ্যুৎ বলেছে, "অমনি করে আচমকা হাত ধরে টান দিলে কে না পড়বে স্যার?"

*****

অনার্সের সেকেন্ড ইয়ার। বিদ্যুৎপর্ণার এক্সপেরিমেন্টাল স্কিল বেশ সড়গড় হয়েছে এখন। শিবসুন্দর আরো দুটো পেপার পাবলিশ করেছে রয়েল সোসাইটির অ্যাস্ট্রোফিজিক্স জার্নালে। আমেরিকার অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সোসাইটির বার্ষিক মিটিংয়ে নিমন্ত্রিত পেপার পড়ার জন্য তার ডাক এসেছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেপার। ইতিমধ্যে ন্যাসা থেকেও একটা পোস্ট ডক্টরল ফেলোশিপের অফার এসেছে। তবে অগ্রিম বা প্লেন ভাড়ার কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। চাওয়াটা শিবসুন্দরের স্বভাববিরুদ্ধ। সাত ভাইবোনের সংসার তাদের। বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। ব্যাঙ্ক লোনের দরখাস্ত করেছে; দু'মাস হয়ে গেল কোনও উত্তর আসেনি। ল্যাব বইগুলো দেখতে দেখতে নিজের পার্থিব চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়েছিল সে।

- "স্যার, সোডিয়ামের ডি ওয়ান আর ডি টু লাইন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না, একটু যদি হেল্প করে দেন..."

বিদ্যুৎপর্ণা এখন অপটিক্সের এক্সপেরিমেন্টগুলো করছে।

- "চলো, ঠিক করে আর্কিং হচ্ছে তো? ডার্করুমে স্ট্রে-লাইট নেই? ভার্নিয়ার সেটিং ঠিক দেখেছ?" এইসব অবভিয়াস্ পিটফলসগুলো জিজ্ঞেস করতে করতে চলেছে শিবসুন্দর; আর বিদ্যুৎপর্ণা ডানদিকে ঘাড় হেলিয়ে "ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার" করে চলেছে। আজ মেন্ পাওয়ারটাই বড় ওঠানামা করছে। পাটনা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কমিউটেটরটা গরুর গাড়ির ভাঙা চাকার মতন এঁকেবেঁকে চলেছে; সোডিয়ামের ইলেক্ট্রনের আর

কী দোষ! তারা পাটনা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বড় এঞ্জিনিয়ার-বাবুর হুকুমে ডনবৈঠক দিচ্ছে। দু'ধারে স্থায়ী হয়ে দু'দল ইলেক্ট্রন না দাঁড়ালে তাদের ডি ওয়ান ডি টু পতাকাদুটো দেখা সম্ভব নয়।

- "মিস্ দাশগুপ্ত, ল্যাব অ্যাসিস্টেন্টকে বলো মেন্ পাওয়ার আউটলেটে স্টেবলাইজার লাগাতে।"

হালকা হলুদ আলোতে কেবিনটা ভরে উঠেছে। বিদ্যুতের সবুজ রঙের শাড়িটা আজও আকাশী রঙ ধরেছে সোডিয়ামের আলোতে; রঙটা বাস্তব নয়, কৃত্রিম। আজ তার চুলে বড় করে খোঁপা বাঁধা, বিনুনি ঝুললে ভার্নিয়ার রিডিং নিতে অসুবিধা হয়। শিবসুন্দর তন্ময় হয়ে দেখছে স্পেক্ট্রোমিটারের লেন্স দিয়ে ডি ওয়ান ডি টু লাইনদুটোকে। মনে মনে উপলব্ধি করছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম-কানুন। অর্ডার ইন কেঅস! ঠিক যেন শিবের তান্ডব নৃত্যের পর বিশ্বের পুনঃসৃষ্টি। হাজার হাজার মাইল বেগে ইলেক্ট্রনগুলো ছুটে চলেছে, এলোমেলো তাদের গতি, তবুও কেমন একটা শৃঙ্খলা! ডি ওয়ান লাইন ক্রস ওয়াইয়ারে সেট করে ভার্নিয়ার রিডিং নিতে হবে। অন্যমনস্কভাবে শিবসুন্দর টেবিলে বাল্বের সুইচটা খুঁজছে; হঠাৎ টপটপ করে দু'ফোঁটা চোখের জল হাতে পড়ায় তার চমক ভেঙেছে। একী! অন্ধকারে সে ভুল করে বিদ্যুতের হাতটা চেপে ধরে আছে। কী কান্ড!

- "আই অ্যাম সরি মিস দাশগুপ্ত।"
- "আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার। ইট ওয়াজ ডার্ক, ইউ নো!" বিদ্যুতের অকৃত্রিম সরল উত্তর।
- "তুমি কাঁদছ কেন? আর ইউ ওকে?"
- "ইয়েস স্যার, কুডন্ট বি বেটার।"

*****

আবার চিলেকোঠায় চটির চটাং চটাং শব্দ।

- "ভেতরে আসতে পারি স্যার?"

টেলিস্কোপ থেকে চোখ না সরিয়েই শিবসুন্দর তাকে বকুনি দিয়ে চলেছে, "আবার চটি পরে এসেছ? ছাদ থেকে পড়ে হাত-পা না ভেঙে কি তুমি থামবে না? তুমি আমাকে জেলে পাঠাবে দেখছি!" মাথা তুলে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে সে একেবারে নির্বাক। বিদ্যুৎ আজ গেরুয়া রঙের শাড়ির সঙ্গে কালো ব্লাউজ পরেছে। ভাঙা খোঁপাটা এলোমেলো হয়ে কাঁধের ওপর আছড়ে পড়েছে। সাজগোজের কোনও বালাই নেই; চোখে কাজল নেই, গলায় হার নেই, কানে দুল নেই – এক্কেবারে নির্জীব, যেন নিরাভরণ সন্ন্যাসিনী চলেছে কোন কৃচ্ছ্রসাধনে।

- "ভাল আছ তো? কোনও অসুখ-বিসুখ করেনি তো? বড় শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে।" শিবসুন্দর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে।

যার বিশ্বব্রহ্মান্ডের গ্রহতারা নিয়ে কাজ, আজ সেই শিবসুন্দরের চোখেও পড়েছে বিদ্যুৎপর্ণার অস্বাভাবিক ম্লান চেহারাটা। বিদ্যুৎ আজ নিস্তেজ, কথাগুলো তার কানে ঢোকেনি। সে যেন বিশ্বের পরপারে দাঁড়িয়ে আছে বহুদূরে অস্তমিত একফালি চাঁদের দেশে। বড্ড পিঙ্গল দেখাচ্ছে এই ডুবন্ত চাঁদটাকে।

- "স্যার, কার্ড।"
- "কার্ড? কীসের কার্ড?" শিবসুন্দরের চোখদুটো ধকধক করে জ্বলছে।
- "বিয়ের, স্যার।"
- "কার বিয়ে"
- "আমার, স্যার।"

চারিদিকে স্তব্ধতা! পৃথিবীর সব স্তব্ধতা যেন জটলা করে এসেছে এই সায়েন্স কলেজের চিলেকোঠায়। বড় অসহ্য এই স্তব্ধতা। শিবসুন্দর বিড়বিড় করে বলে চলেছে, "কালই যাব ভেবেছিলাম; বড় দেরী হয়ে গেল – এস বি আই লোনটা সবে এসেছে। তোমার ভাড়াটা চাইতাম যৌতুক হিসাবে..."

বিদ্যুৎ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। পা দুটো অসংলগ্ন, পায়ে চটি। চারতলার ছাদ থেকে পড়লে এক্কেবারে কংক্রিটের পার্কিং লটে। ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে শিবসুন্দর; চেপে জড়িয়ে আছে। আর শুধু দুটি হৃদয়ের স্পন্দন সায়েন্স কলেজের নিস্তব্ধতা ভেদ করে আকাঙ্ক্ষিত কত কথার বিনিময় ঘটিয়ে চলেছে।

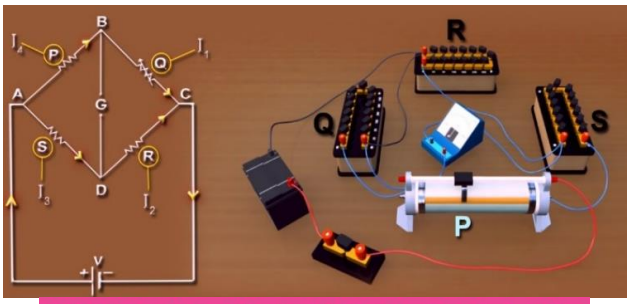

ঝিলম গাছের তলা

সিদ্ধার্থ সিংহ

তিনাই ঝপ করে বিছানা থেকে নেমে কাউকে কিছু না বলেই সোজা হাঁটা দিল তাদের বসতবাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সেই ঝিলম গাছটার দিকে | না, আমেরিকা নয়, সে মালয়েশিয়ায় যাবে|

সুন্দরবনের এই জ্যোতিষপুর অঞ্চলে যাঁরা থাকেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই ভিটেমাটি ছাড়াও কমবেশি একটু আধটু জমি আছে| সেখানে তাঁরা চাষবাস করেন | আনাজপত্র ফলান | হাঁস-মুরগি পোষেন | পুকুর থাকলে মাছ চাষ করেন | আর তাতেই তাঁদের দু'বেলা কোনও রকমে ঠিক চলে যায়|
কিন্তু তিনাইদের জমিজমা একটু বেশিই | পুকুরই আছে তিন-তিনটে | তাও এত বড় বড় যে, সেগুলোকে আর পুকুর বলা যাবে না| বলতে হবে পুষ্করিণী| তাদের চার পুরুষ আগের, মানে ঠাকুরদার বাবারা বসতবাড়ির খানিক দূরেই যে কারুকার্যখচিত পোড়ামাটির বিশাল মন্দিরটা বানিয়েছিলেন, সেটার এখন একেবারে ভগ্নদশা | তবু প্রতি বছর শিবরাত্রির দিন ঘটা করে পুজো হয়| শুধু তাদের গ্রামেরই নয়, আশপাশের গ্রামের মেয়ে-বউরাও শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য রাত থাকতে সেখানে হাজির হন| এই পুজোকে ঘিরে টানা তিনদিন মেলা বসে|
সেই মন্দির ছাড়িয়ে আরও খানিকটা গেলে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি| পরিত্যক্তই বলা যায়| না, সেখানে কোনও গাছপালা হয় না | লোকে বলে বন্ধ্যা জমি | অথচ সেই বন্ধ্যা জমিতেই বাপ-ঠাকুরদার যুগ থেকে একটা ঝিলম গাছ বহাল তবিয়তে কী সুন্দর টিকে আছে! জমিটা কোনও কাজে লাগে না | যেহেতু ওরা বৈষ্ণবধর্মী, মৃত্যুর পর ওদের পোড়ানো হয় না, সমাধি দেওয়া হয়; তাই তাদের বাড়ির কেউ মারা গেলে দু'হাত বাই দু'হাত মাপের ইঁটের গাঁথুনি দিয়ে প্রথমে তিন দিক ঘিরে ছোট্ট একটা খুপরি বানানো হয় | মৃতদেহকে স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে সেই খুপরিতে বসানো হয়| তারপর সামনের দিকটাতেও পাঁচিল তুলে খোপটার উপরে সিমেন্ট-বালি দিয়ে ছাদ ঢালাই করে দেওয়া হয়| এ সবের জন্য বৈষ্ণবরা সাধারণত বাড়ির শেষ সীমানা কিংবা পুকুর পাড়কেই বেছে নেয়| তিনাইরা বহু বছর আগেই বেছে নিয়েছিল ওই জমিটা|

খানিক আগে ভোররাতে তিনাই স্বপ্নে দেখেছে, খেলতে খেলতে কীভাবে যেন ও সেই ঝিলম গাছের তলায় চলে গেছে| গাছটার গুঁড়ির পাশেই ছিল বহুদিন আগের একটা বেদি | হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখে, ধস নেমে সেটা বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে | কত নীচে নেমে গেছে বোঝা যাচ্ছে না| ভয়ে ভয়ে সেই গর্তে উঁকি দিতেই ও দেখল, এক-দেড় হাত নীচেই কাঠের পিঁড়ির মতো কী যেন একটা পাতা| এখানে পিঁড়ি এল কোথা থেকে! লোকে তো পিঁড়ি পেতে দেয় বসার জন্য | তাহলে কি কেউ তাকে এখানে বসতে বলছে! নিশ্চয়ই বলছে, না হলে এখানে খামোখা কেউ পিঁড়ি পাততে যাবে কেন! ও কোনরকমে পা টিপে টিপে খুব সাবধানে সেটায় গিয়ে বসল| বসেই টের পেল, এটা কোনও পিঁড়ি নয়, এই ঝিলম গাছটারই মোটা একটা শিকড় | এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছে | জায়গাটা অন্ধকার মতো | তার ওপরে এটা এতটাই মোটা যে, উপর থেকে সেটা পিঁড়ি বলে মনে হয়েছিল|
ও বসামাত্রই, ডানদিক বাঁদিক থেকে ঝপ ঝপ করে কতগুলো লতাগুল্ম ওকে একেবারে জাপটে ধরল| তারপরই সেটা শাঁ শাঁ করে নীচের দিকে নামতে লাগল| কোথায় যাচ্ছে এটা! এটা কি মাটি ফুঁড়ে পৃথিবীর ওপ্রান্তে গিয়ে বেরোবে! ও জানে পৃথিবীটা গোল | ভারতের ঠিক উলটো দিকে রয়েছে আমেরিকা | তার মানে ও কি আমেরিকায় গিয়ে পড়বে!
কয়েক মুহূর্ত মাত্র | ও যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই | তিনাই একেবারে আমেরিকায় এসে হাজির হয়েছে | আমেরিকা মানে নিউ জার্সির একটা পরিত্যক্ত কবরখানায় | দেখে, সামনেই একটা মস্ত বড় ঝিলম গাছ| অবিকল তাদের সেই ঝিলম গাছটার মতোই | গাছটার পাশে বাঁধানো শ্বেতপাথরের একটা প্রশস্ত বেদি| সেই বেদির ওপরে বেশ কয়েকজন গোল করে বসে দাবা খেলছে| ওকে দেখে একজন বলল, "ও... তুমিও বুঝি শিকড়ে বসে আমেরিকার কথা ভেবেছিলে?"
তিনাই বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা জানলে কী করে?"
ওদের মধ্যে থেকে একজন বলল, "আমরাও তো মনে মনে আমেরিকার কথাই ভেবেছিলাম, তাই এখানে চলে এসেছি | পরে শুনলাম, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নাকি এইরকম আরও অনেকগুলো ঝিলম গাছ আছে| সেই গাছের কাছাকাছি কোনও গহ্বরের শিকড়ে বসে যে যেখানে যাওয়ার কথা ভাবে, ওই

শিকড় নাকি তাকে সেখানেই পৌঁছে দেয়। তুমি যদি আমেরিকা না ভেবে লন্ডন ভাবতে, তা হলে এখানে নয়, তুমি সোজা লন্ডনে চলে যেতে। ভিয়েতনাম ভাবলে ভিয়েতনামে।"

- "সে কী! তাহলে লোকে এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে প্লেনে করে ওইসব জায়গায় যেতে যাবে কেন? এভাবেই তো যেতে পারে! ধ্যাত, এরকম আবার হয় নাকি?"

- "নিশ্চয়ই হয়। না হলে আমরা আমেরিকা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় চলে এলাম কী করে!"

- "এটা কি সত্যিই আমেরিকা?"

- "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? যাও, ওই যে মরচেধরা বিশাল লোহার ফটকটা দেখতে পাচ্ছ, ওটার বাইরে গিয়ে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখো। এদিক ওদিককার দোকানের নামের নীচে যে ঠিকানাগুলো লেখা আছে, সেগুলো পড়ো। তাহলেই বুঝতে পারবে, তুমি নিউ জার্সির কোন অঞ্চলে কত নম্বর রাস্তায় কত নম্বর বাড়ির উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছ, বুঝেছ?"

- "তাই?"

লোকটা বলল, "একদমই তাই।"

- "আর আমি যদি তখন আমেরিকা না ভেবে মালয়েশিয়া ভাবতাম?"

- "তা হলে মালয়েশিয়ায় চলে যেতে।"

লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ তীব্র এক আলোর ছটায় তিনাইয়ের চোখ একেবারে ঝলসে যাওয়ার জোগাড়। তাকিয়ে দেখে, তার ডানপাশে একটা প্রকাণ্ড বড় ওক গাছের ঝাঁকড়া মাথা থেকে একটা বিশাল ডানাওয়ালা পাখি আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। তার গা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে সূর্যের রশ্মির মতো তীব্র আলোর ছটা। সে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

না, বন্ধ নয়। আসলে সে চোখ খুলে তাকাল। দেখল, কোথায় সেই পাখি! কোথায় সেই ঝিলম গাছ! কোথায় সেই পরিত্যক্ত কবরখানা! আর কোথায়ই বা সেই আমেরিকা! সে তো তার ঘরের খাটেই শুয়ে আছে! আর আলো? সে তো ওই সূর্যের আলো, যা রোজই তার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে, সেভাবেই এসে পড়েছে তার মুখে। ঝটপট বিছানায় উঠে বসল তিনাই। কিন্তু স্বপ্নটা!

সে বাবা-কাকাদের মুখে শুনেছিল, আগেকার দিনে নাকি কেউ মারা গেলে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করার আগে যাঁদের যেমন অবস্থা, তাঁরা সেইমতো মৃতদেহের পাশে সোনাদানা, হিরে-জহরত, তাঁর প্রিয় খাবারদাবার, পোশাক-আশাক, এমনকী তাঁর ব্যবহৃত খাগের কলমটা পর্যন্ত রেখে দিতেন। আর সমাধিস্থ করে আসার পরদিন সকালেই দেখা যেত সেই সমাধিক্ষেত্র লন্ডভন্ড। শুধু ভাঙাই নয়, অনেকখানি গভীর করে খোঁড়া। কে বা কারা যেন রাতের অন্ধকারে মাটি খুঁড়ে সেই সব সোনাদানা, হিরে-জহরত নিয়ে পালিয়েছে। কী করা যায়! রাতের পর রাত তো আর সমাধিক্ষেত্র পাহারা দেওয়া যায় না। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, যত প্রিয়জনই মারা যাক না কেন, সমাধিক্ষেত্রের নীচে তাঁরা আর কোনও মূল্যবান জিনিস দেবেন না। সেই যে বন্ধ হ'ল, তো হ'লই। আর সেটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে সমাধিক্ষেত্র তোলপাড় হওয়া। তার নীচের মাটি খোঁড়া।

এখন আর সমাধিক্ষেত্রের মাটি কেউ খোঁড়ে না! তাহলে এরকম একটা স্বপ্ন ও দেখল কেন! নিশ্চয়ই কোনও একটা কারণ আছে! তাই ঘুম থেকে উঠে তিনাই হাঁটা দিয়েছিল সেই ঝিলম তলার দিকে। ওখানে যদি সত্যিই ওইরকম কোনও কিছু সে দেখতে পায়, তাহলে আর আমেরিকা নয়, স্বপ্নে তো সে আমেরিকা দেখেই নিয়েছে, শুধু শুধু আবার আমেরিকায় গিয়ে কী লাভ? এবার সে মালয়েশিয়ায় যাবে। সোজা মালয়েশিয়া।

সে যখন ঝিলম গাছটার কাছে গিয়ে পৌঁছাল, দেখল আগেকার বেদিগুলো প্রাকৃতিক কারণেই ভেঙেচুরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এই কিছুদিন আগেই, ওর দিদুন মারা যাওয়ার পরে যে সমাধিটা বানানো হয়েছিল, সেটার অবস্থা এরকম কেন!

এদিক ওদিক একদম শুনশান। শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে। আর সেই বাতাসে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে কাৎ হয়ে হেলে পড়ছে সেই ঝিলম গাছটা। হঠাৎ ওর মনে হ'ল, এই বুঝি কেউ তার পাশে এসে দাঁড়াল। এই বুঝি ঝপ করে পেছন থেকে কেউ সরে গেল। এই সক্কালবেলাতেও তার শরীর কেমন যেন ভার-ভার হয়ে উঠল। তার মধ্যেই সে দেখল, না, আলোর পাখি নয়, একটা কাঠঠোকরা। তাদের জমির একদম সীমানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা চার-সাড়ে চার মানুষ সমান সুপারি গাছটার মাথার দিকটা ঠোকরাচ্ছে। ওটা দেখে ওর মনে হ'ল, আচ্ছা, কাঠঠোকরাটা গাছটাকে ওভাবে ঠোকরাচ্ছে কেন! সে কি উঠে একবার দেখবে! কিন্তু কেউ যদি তাকে বাড়িতে না

দেখে এদিকে খুঁজতে আসে! আর এসে যদি দেখে সে গাছে উঠছে, তা হলে তো একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যাবে।

কবে কোন জন্মে তাদের কোন এক কাকা নাকি খেজুর গাছে ভর সন্ধ্যেবেলায় রসের হাঁড়ি বাঁধতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন। বহু ডাক্তার-বদ্যি করেও তিনি নাকি সারা জীবনেও আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি। তারপর থেকে তাদের বাড়িতে শুধু খেজুর গাছ কাটাই যে বন্ধ হয়েছে, তাই-ই নয়, নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তাদের বাড়ির কেউ আর কোনদিন কোনও গাছে চড়তে পারবে না। ফলে তিনাইও পারে না।

তিনাইয়ের বন্ধুরা যখন গাছে চড়ে পাকা খেজুর পাড়ে, পেয়ারা পাড়ে, চালতা পাড়ে, ও তখন ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও জানে, ওর হাত-পা-মন নিশপিশ করলেও এ জীবনে ওর আর কখনই গাছে চড়া হবে না। কিন্তু আজ যখন আশপাশে কেউ নেই, ও আর সময় নষ্ট করল না। ঝপ ঝপ করে উঠে পড়ল সেই সুপারি গাছে। আঃ, গাছে চড়ার যে কী আনন্দ! তিনাইকে গাছের কাছে আসতে দেখে কাঠঠোকরাটা উড়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। কিন্তু সে যেখানটায় ঠোকরাচ্ছিল, অতটা ওঠার আগেই ওর শরীর কেমন যেন ছেড়ে দিল। বুঝতে পারল, ও পড়ে যাচ্ছে।

কোথাও কিছু নেই, পড়ল তো পড়ল গিয়ে ঝপাস করে একটা পুকুরে। এখানে তো কোনও পুকুর ছিল না! পুকুর তো সেই অণুদের বাড়ির কাছে। তবু জলে পড়ে ও হাত-পা ছুড়ে সাঁতার কাটতে লাগল।

ওদের বাড়িতে কেউ জন্মালে, তাকে আর কিছু শেখানো হোক, ছাই না হোক, ছোট্টবেলাতেই সাঁতারটা শিখিয়ে দেওয়া হয়। ওদের বাড়ির বড়রা বলেন, ডাঙা তো মাত্র একভাগ। পৃথিবীর তিনভাগই জল। সাঁতার না শিখলে কী করে হবে?

আসলে ওদের বাড়ির কে নাকি একবার ঠাকুর ভাসান দিতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিল, সে নাকি সাঁতার জানত না। তাই তার পর থেকেই ওদের বাড়ির বাচ্চাদের সাঁতার শেখাটা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। সেই নিয়ম আজও সমানে চলছে। তাই তিনাই প্রতিদিন স্নান করার আগে ওদের বাড়ির লাগোয়া পুকুরে অন্তত ঘন্টাখানেক জল উথালিপাথালি করে সাঁতার কাটে। না, কেউ বারণ করে না। বরং খুশিই হয়।

তিনাই ঝপাৎ ঝপাৎ করে সাঁতার কাটতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে হ'ল, ও যেখানে সাঁতার কাটছে, সেটা নিশ্চয়ই পুকুর নয়, পুকুরে কি এত বড় বড় ঢেউ হয়! পেছন ফিরে দেখে, চারিদিকে শুধু জল আর জল। জল আর জল! তার মানে ও এখন পুকুরে নয়, সমুদ্রে! তড়িঘড়ি কোনও রকমে পাড়ে উঠে দেখে, এদিকে ওদিকে প্রচুর লোক। কেউ সমুদ্রে নামার জন্য তোড়জোড় করছে। কেউ সমুদ্র থেকে উঠে গা মুছছে, তো কেউ পাড়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছে।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল, তাদের সেই ঝিলম গাছের মতো এখানেও একটা ঝিলম গাছ। অবিকল একই রকম দেখতে। তাদের ঝিলম গাছটার পাশে যেমন একটা সমাধিক্ষেত্র আছে, স্বপ্নে দেখা আমেরিকার সেই ঝিলম গাছটার পাশে যেমন ছিল একটি কবরখানা, ঠিক তেমনি এখানেও এই গাছটার নীচে ওরকম কোনও বেদি-টেদি না থাকলেও, ছোটখাটো একটা টিলার মতো স্তূপাকৃত প্রচুর ডাব নিয়ে বসে আছেন এক ডাবওয়ালা। ও সোজা সেই ডাবওয়ালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা কোন জায়গা গো?"

ডাবওয়ালা বললেন, "সেকী! তুমি এখানে এসেছ অথচ এই জায়গাটার নাম জানো না? এটা তো পিকাচো সি-বিচ।"

তিনাই এর আগে এই রকম কোনও সমুদ্রতটের নাম শোনেনি। তাই অবাক হয়ে বলল, "পিকাচো সি-বিচ! এটা কোন দেশ?"

- "কেন? মালয়েশিয়া।"

'মালয়েশিয়া' শুনেই চমকে উঠল তিনাই।

ওর চমকে ওঠা দেখে পিছনের ঝিলম গাছটা ইশারায় দেখিয়ে ডাবওয়ালা বললেন, "ও বুঝেছি... তুমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোন-না-কোনও প্রান্ত থেকে হুবহু এইরকম একটা ঝিলম গাছের পাশে কোনও গর্তের শিকড়ে বসে ভুল করে এখানে চলে এসেছ, তাই না?

তিনাই হ্যাঁ-সূচক মাথা ওপর-নীচে করল।

সেটা দেখেই ডাবওয়ালা বললেন, "তাহলে এখানে বেশিক্ষণ থেকো না। যদি থাকো, তবে আর কোনদিনই তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যেতে পারবে না। না উড়ানে। না স্থলপথে। না জলপথে। এমনকি পাসপোর্ট-ভিসা থাকলেও যেতে পারবে না। কোনও না কোনও কাঁটা ঠিক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে। একেবারে আমার মতো। জীবনে আর কোনদিনই মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী –

কারুর মুখ দেখতে পারবে না | পা রাখতে পারবে না নিজের জন্মভিটেয় | এখানে আসা সহজ | খুব সহজ | যে কোনও ঝিলম গাছের কাছাকাছি গর্তের শিকড়ে বসে, মনে মনে যে জায়গায় যেতে চাইবে ঠিক সেখানে পৌঁছে যেতে পারো | কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য | সেই সময়টা একবার পেরিয়ে গেলে হাজার চেষ্টা করলেও তুমি আর কোনদিনই ফিরে যেতে পারবে না |"

- "তা হলে উপায়?"

- "উপায় একটাই | তুমি যখন ঝিলম গাছের তলা দিয়ে এসেছ এবং বেশিক্ষণ আগে আসোনি, তার মানে সেই নির্দিষ্ট সময়টা এখনও পেরিয়ে যায়নি | তোমার হাতে এখনও অনেক সময় আছে | তুমি এই ঝিলম গাছের গোড়ায় উঁকি মেরে দেখো, বড় কোনও গর্ত দেখতে পাও কিনা | না পেলে বুঝবে সময় পেরিয়ে গেছে | আর যদি পাও, ভাল করে দেখবে, সেখানে পিঁড়ির মতো বেশ চওড়া একটা শিকড় আছে | তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানে যেভাবে খুব সাবধানে সেই শিকড়ে গিয়ে বসেছিলে, ঠিক সেভাবেই ওই শিকড়ে গিয়ে বসবে | বসার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে কতকগুলো লতাগুল্ম তোমাকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে যে তোমার আর পড়ার কোনও ভয়ই থাকবে না | তবে হ্যাঁ, তুমি কিন্তু ওটায় বসে ভুল করেও অন্য কোনও জায়গার নাম ভেবো না, কেমন? তাহলে কিন্তু আরও বড় কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে, বুঝলে? তার পর দেখো, মাত্র কয়েক সেকেন্ড; ব্যস, তুমি যেখান থেকে এসেছিলে, ঠিক সেখানে পৌঁছে যাবে |

আর কোনও কথা বাড়াল না তিনাই | তড়িঘড়ি সেই ঝিলম গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল | বুঝতে পারল, মনে মনে কেউ কোথাও যেতে চাইলে এই ঝিলম গাছটার তলার মতো এই পৃথিবীতে আরও অনেক ঝিলম গাছের তলা আছে | যেখান থেকে হুস করে যে কোনও জায়গায় এক মুহূর্তে চলে যাওয়া যায় | অবশ্য তবে তা চিরকালের জন্য নয়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য | ও মনে মনে মালয়েশিয়া আসতে চেয়েছিল | এসেছে | এখন ওর ফিরে যাওয়ার পালা |

তিনাই পা টিপে টিপে সেই গহ্বরে নেমে খুব সাবধানে শিকড়ে বসতেই, কতগুলো লতাগুল্ম ওকে জাপটে ধরল এবং কিছু টের পাওয়ার আগেই দেখল ও তাদের পরিত্যক্ত জমির সেই ঝিলম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে |

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না তিনাই | চোখ কান বুজে সোজা ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে |

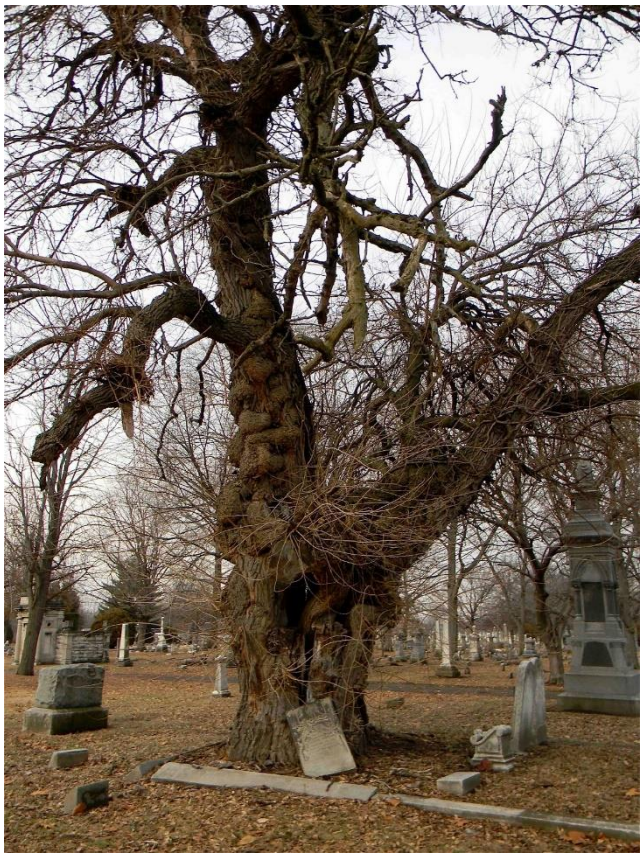

আগমনী

ডাঃ শান্তনু মিত্র

ক্লান্ত বাদল বাজায় মাদল
আসবি মাগো তুই আবার।
কোথায় তোকে বসতে দেব,
ঘর যে আমার ছত্রাকার।

পক্ষপাতে দুষ্ট যে ছাদ,
ঢুকছে ঘরে বৃষ্টি রোদ।
মেঝের উপর টুকরো ভাঙ্গা
'সৎসাহসের মূল্যবোধ'।

জানলাগুলো খোলাই থাকে,
ছিন্ন আমার পর্দা সব।
ঘরের দশা রইবে গোপন
সে এক প্রকার অসম্ভব।

অন্ধ কড়ির 'বিবেক' ছিল
বন্দি মনের সিন্দুকে।
সবাই আমায় ঠাট্টা করে,
'বৃদ্ধ' বলে নিন্দুকে।

কোন ফুলে মা পূজব তোকে,
নেই বাগানের সেই মালী।
করুণ চোখে মুখের দিকে
তাকায় মনের গাছগুলি।

তবুও বাতাস হিমেল হাওয়ায়
আনমনে কোন সুর আনে!
শিউলি ফুলের গন্ধ জাগে,
মন ভেসে যায় কোনখানে!

টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে ঐ
ডাকছে অসীম নীল আকাশ।
মাধুর্য তার ভাসিয়ে যে নেয়
ক্ষুদ্র মনের সব প্রকাশ।

এই প্রকৃতির গর্বে জাগে
তোর মহিমার লাবণ্য।
সে রূপ মাগো ভুবন ভোলায়।
মানুষ নেহাত নগণ্য।

আমার ভাঙ্গা আঁধার ঘরের
দায় কি মাগো তোর হাতে?
এবার আমার চোখ ছুঁয়ে যাস
প্রদীপ খুঁজে পাই যাতে।

সব দীনতার হোক অবসান
চরণধ্বনি শুনছি ঐ।
একলা দ্বারে দাঁড়িয়ে আমি
পথের পানে তাকিয়ে রই।

শিল্পী: নব্যাণশা বিশ্বাস (বয়স ৯)

অবিচার

ডাঃ শান্তনু মিত্র

রাত্রি ভোরে ঘুমের ঘোরে
ভাবছি মাগো, অশ্রু চোখ।
এই ব্যথা কার পাওনা ছিল?
আজকে সেটার বিচার হোক।
এই চোখে তোর হাতের ছোঁয়া
দৃষ্টি যদি দেয় আবার,
"স্বার্থ" সবার শেষ কথা নয়
বুঝিয়ে আমায় চাবুক মার।
তর্জনীটা ঘুরিয়ে দে মা
হোক নিশানা নিজের দিক।
আয়না রেখে সামনে সবাই
মনের ওজন মাপিয়ে নিক।
জিবটা আমার চটুল বড়
'লেহন' কাজে সে ওস্তাদ।
লজ্জা সরম একটু দে মা
হোক বিবেকের বিসংবাদ।
তবুও যদি দেখিস মাগো
ঘুণ ধরেছে, জমছে বিষ,
অগ্নি তাপের দহন জ্বালায়
জ্বালিয়ে আমায় শাস্তি দিস।
এ কোন বিচার করলি মাগো,
আমায় দিলি মুক্তদ্বার।
সদ্য ফোটা ফুলের ওপর
পড়ল কেন তোর কুঠার?
চারপাশে সব তলিয়ে গেল
দাঁড়িয়ে আছি এক চূড়ায়।
বাক্যহারা, স্তব্ধ আমি,
বন্দি মা তোর কাঠগড়ায়।

সোনালি স্মৃতি

বাপন দেব লাড়ু

শরতের আকাশে সোনালী রোদ ঝরে,
স্নিগ্ধ আলোয় ভেসে যায় মেঘের দল;
গভীর মনে আঁকা স্মৃতির অমল,
অতীতের দিনগুলি স্মরণ করে।

বকুলের গন্ধে মিশে ছিল প্রীত,
বাতাসে ভাসত মনোমুগ্ধ গান,
চিরকালের মধুর প্রেমের মান,
আজও কানে বাজে তার সুরের নীত।

নির্জন বেলায় আজ একা বসে,
অতীতের আকাশে মন উড়ে যায়,
সেই পুরনো স্মৃতি যেন ফিরে আসে।

কিন্তু সময় থামে না, যায় হারিয়ে
কালের চক্রে সবই মুছে যায়,
তবু স্মৃতির কাব্য বাঁচে মনের গভীরে।

রাজনীতির সহজপাঠ

সুজয় দত্ত

আমাদের রাজনীতি চলে বাঁকে বাঁকে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার গ্যাঁড়াকল থাকে।
পার হয়ে যায় নেতা, পার হয় চ্যালা,
বছরে ছ'মাস চলে ভোট-ভোট খেলা।

সে খেলায় জিতে হয় ক্ষমতা দখল,
হাতে আসে টাকা আর গুন্ডার দল।
আর আসে দল ভেঙে বিরোধী নেতারা –
ক্ষমতার এঁটোকাঁটা সুখে চাটে তারা।

মন্ত্রী হলেই যেন দেবতা-সমান।
ধরাকে তখন তারা করে সরা-জ্ঞান।
এম পি, এম এল এ, সব ন'মাসে ছ'মাসে
একদিন অ্যাসেম্বলি-সংসদে আসে।

এলেও যে কাজ করে – ভেব না মোটেই।
মারামারি চুলোচুলি হাতাহাতিতেই
কাটায় সময়। বেশী থাকে না ভেতরে –
কথায় কথায় তারা ওয়াক আউট করে।

তাদের শিষ্যদল এককাঠি বাড়া,
জানে না কিছুই বন্ধ-হরতাল ছাড়া।
ভাঙচুর অবরোধ বোমাবাজি আর
মিছিলে-স্লোগানে করে দেশ উদ্ধার।

দুর্নীতি ছাড়া বুঝি প্রশাসন চলে?
মাছছাড়া ফিশফ্রাই জমে কোনকালে?
উন্নয়নের টাকা – লেখা আছে তাতে
কার উন্নতি? ব্যয় হবে কোন খাতে?

পার্টির নেতার বাড়ি পাঁচতলা হবে –
সেও তো উন্নয়ন। ভোট এলে তবে
রাস্তায় পিচ আর নর্দমা পাকা।
টাকাই ক্ষমতা আর ক্ষমতাই টাকা।

একে একে তিন হয়, দুয়ে দুয়ে পাঁচ।
চলবে ঘুষের খেলা, পাবে নাকো আঁচ।
তহবিল থাকলেই হবে তছরুপ –
শাসক দলের ভয়ে পুলিশ যে চুপ।

চিটফান্ড চিট করে, নেই প্রতিকার।
ধর্ষণে সেই দোষী, যে হ'ল শিকার।
ট্যাক্সি-অটোর ভয়ে আরোহীরা কেঁচো।
না পোষালে মরে যাও, পোষালেই বেঁচো।

সমাজের স্তরে স্তরে ধরে গেছে ঘুণ।
ধ্যাত্তেরি, ভোট দিয়ে পাশ ফিরে শুন।
আমরা শাসিত আর জনসাধারণ
যত প্রবলেম আর মেস্-এর কারণ।

একাকিত্ব

সুজয় দত্ত

কবিতা লিখতে ঠিক বসিনি যদিও আমি আজ –
বসেছি নিজের সাথে নিভৃত আলাপচারিতায়।
সঙ্গীবিহীন এই পৃথিবীতে বড় একা লাগে –
কবিতার ছলে তার কারণ খুঁজতে মন চায়।

ভোরবেলা একরাশ সোনালি আলোর ঝিলিমিলি
যখন ভাঙাল ঘুম, মনে হ'ল আকাশকে বলি,
হঠাৎ এ শিহরণ, অজানা পুলক কেন লাগে?
পাষাণ-সুপ্তি ভেঙে যেন এক নির্ঝর জাগে।
আকাশ নিরুত্তর, সূর্য শুধু আলোর আদরে
সবুজ জমির গায়ে রামধনু ফুলের চাদরে
হাসির হিল্লোল তুলে বিস্ময়ে বলে, "তাই বুঝি?
কিরণের মালা হাতে প্রতিদিন তোমাকেই খুঁজি।
তুমি শুধু পুলকিত মাঝেমাঝে? দু'একটা ভোরে?"
এমন প্রশ্নে থাকি লজ্জায় মাথা নীচু করে।

দুপুরে বাগানে যত গোলাপ ডালিয়া রঙ্গন
দুলছে হাওয়ার দোলে, আলো করে আছে অঙ্গন।
চেনা ফুল, চেনা রঙ, তবু যেন কী জাদুতে আজ
মনে হ'ল চেয়ে থাকি ফেলে জগতের সব কাজ।
আমার মনের কথা বুঝে ফেলে ওরা বলে ওঠে,
"কোনোদিন ভাবোনি কি রোজ এত ফুল কেন ফোটে
তোমার কানন জুড়ে? তোমারই আঁখির প্রতীক্ষায়।
আজই প্রথম মুগ্ধ?" নিজের এহেন উপেক্ষায়
অনুতপ্ত, রুদ্ধবাক – পালাবার পথ খুঁজে পেতে
বাগান পিছনে ফেলে বসি গিয়ে নদী কিনারেতে।

সেখানে বিকেলবেলা স্নিগ্ধ বাতাসে ভর করে
পানকৌড়ি, বালিহাঁস, আরও কত পাখি ভীড় করে।
সবই অতি পরিচিত, আজ তবু অনুভূতি জাগে –
এমন সুন্দর করে এ-নদী কি বয়েছিল আগে?
নদী বলে মৃদু হেসে, "শেষ কবে এসেছিলে কাছে
মনে পড়ে? শীত শেষে বসন্ত তখন গাছে গাছে।
তারপর আমিই তো বারবার গেছি ডেকে ডেকে –
তোমার খিড়কি দোরে বালুতটে নিমন্ত্রণ এঁকে।
সে দোর খোলেনি তবু, হাল ছেড়ে দিই অবশেষে।
এতদিনে দিলে সাড়া? বসলে পাশেতে ভালবেসে?"

নীরব নয়নে এই অভিযোগ মেনে নিয়ে আমি
চেয়ে দেখি দিগন্তে সূর্য হয়েছে অস্তগামী।
নেমেছে সন্ধ্যা ঘন, তারারা এবার দেবে দেখা –
বসি গিয়ে বাতায়নে আঁধারের পানে চেয়ে একা।
দিনশেষে গোধূলি তো রোজই আসে, তবু কেন যেন
মনে হ'ল এমন এক সন্ধ্যা কি এসেছে কখনো
আমার জীবনে আগে? কানে এল আকাশের বাণী –
"লক্ষ প্রদীপে আছে সাজানো বরণডালা তব,
যুগযুগান্ত ধরে তবু তুমি উদাসীন জানি"।

এখন নেমেছে রাত, বুঝলাম সারাদিন ধরে
পৃথিবীতে আমি কেন একা।
যাদের সঙ্গসুধা পারত মেটাতে ক্ষুধা
তারা আছে চিরদিন ধরে।
আমারই হয়নি শুধু শতেক কাজের ফাঁকে
চোখ মেলে তাদেরকে দেখা।

দেশের প্রশ্ন

প্রদ্যুৎ কুমার গুপ্ত

দেশ আমায় ছাড়েনি, আমি দেশ ছেড়েছি
হারজিতের নেই কিছু, তবুও তো হেরেছি।
কুড়িটা বছর যেন কোথা হয়ে গেল পার,
মনে হয় ভেঙেচুরে সবকিছু একাকার।

এলাম বিদেশে এক খেয়ালের বশেতে,
ছিল না ইচ্ছা শিক্ষা-ধন-মান-যশেতে।
আজ যাব, কাল যাব ফিরে ওই দেশে,
ও তো আমারই দেশ, কীই বা তাড়া শেষে?

কোথা হতে যায় চলে বছরের চাকা হায়!
বিদেশটি হ'ল দেশ, দেশ আর নাহি চায়।
যতবার যাই দেশে, নিজদেশ লাগে স্ট্রেঞ্জ
দেশবাসী-আমার মাঝে এসেছে কত না চেঞ্জ।

মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন যত
বন্ধুদের সাথে ওরা পর হয়ে গেছে কত!
এদেশের জীবনটা কত একা, কত দুঃখ,
তারা শুধু ভাবে এই আমেরিকা ভরা সুখ!

নিয়ে যাও যত গিফ্ট ভরেনাকো তবু মন
ভাবে তারা আমাদের বাড়িভরা যখের ধন।
'ফ্যামিলির মেম্বার তুমি', কী মধুর গলা রে!
কেবলই নেওয়া এই আমেরিকান ডলারে।

খুশি থাকি, খুশি রাখি নিজদেশে বেড়ালে,
কেঁদে ফিরি, ওরা কেউ কাদেঁনাকো আড়ালে।
আগেকার মতো আর বাজে না তো মনে সুর,
কাছে যাই তবু লাগে সকলেই কত দূর!

এ দেশের ব্যস্ততায় মন ধায় অলসতায়
ও দেশের অলসতায় মন ক্লান্ত হয়ে রয়।
ওদেশের খবর খুঁজি এই দেশে নানাভাবে,
ওই দেশে গেলে খুঁজি মার্কিন দেশটাকে।

বিদেশে এসেছি বলে ওদেশের ধারণা
ধান্দাবাজী, হাত বোলানো সকলের তাড়না।
আশ্চর্য এ মানব জীবন কেউ কিছু বলে না
সব কিছু আছে তবু কোনোকিছু চলে না।

ট্যাক্সিতে লাইন দেয়, ট্রেনে বুকিং চাই
বাস হয় ব্রেকডাউন, প্লেনের কোনো ঠিক নাই।
পায়ে হেঁটে কোথা যাব তাও যদি মন চায়
হকারেতে ভরা পথ, আর বাকি নোংরায়।

টেলিফোনে লাইন নেই, কোনোকিছু নেই ঠিক
পিপীলিকাসম লোক হেঁটে চলে চারিদিক।
নিয়মকানুন নেই, নেই ভয়, নেই হুঁশ;
একটিই মন্ত্র – 'চাও যদি, দাও ঘুষ।'
ভাবি কেন হ'ল না ওদেশ এদেশ মতো
হিজিবিজি করে কাটে জীবনের পাতা যত।

{দেশে যখনই বেড়াতে যাই অনেক রকম পরিবর্তন চোখে পড়ে। পরিবর্তন কি শুধু দেশেরই নাকি আমাদেরও? এত বছরের ব্যবধান, জীনবযাত্রার পার্থক্য আমাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে অবশ্যই। নিজের এবং অন্যের সেইসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বগতোক্তি এই কবিতাটি।}

অ মৃতকথা

বিষ্ণুপ্রিয়া

মানুষ খুন হচ্ছে ছিঁড়ে খুঁড়ে করছে নিহত লোপাট
করছে সাবাড় হত্যাপ্রমাণ
লাশকাটা ঘরের হিমচিতায়

শরীর পুড়লেও আগুন ছড়ায়
নির্ঘুম ঠেকে গেছে পিঠ দেয়ালে আবার
মানুষ শীতঘুমে নেই আর মুষ্টিবদ্ধ প্রতিবাদ

ঢাকা যায় না নীতিহীন কাঠামোর ক্যান্সার
প্রতিধ্বনি কণ্ঠরুদ্ধ ধর্ষিতার অ মৃতকথা
ছাইয়ের ফিসফাস তাই আনাচে কানাচ

যতই করো সহবাস বেহায়া ক্ষমতার ছত্রছায়ায়
পরিপাটি ছকে ফেলা অঙ্ক এবার তছনছ
পালা উলঙ্গ নেকড়ে ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস

প্রতারণার শেষ নিঃশ্বাস আদালতের দোরগোড়ায়
ঢংঢং ওই বাজছে ঘন্টা পুরনো পাপের ঘড়ায়
কারণ ধর্মের কল নড়ে বাতাসে সদাই

দুঃসময়

শঙ্কর তালুকদার

আশা ডাক দেয় না
ভাবনা গেছে টুটে
ব্যথার নীরব স্রোতে
অভিমানে ভেসে ভেসে।
অন্তিমের শ্যেন দৃষ্টি
জাগায় না শঙ্কা
দুঃসময়ে তবু বেঁচে থাকা।

নিয়তির অনুরাগে ঝরা ফুল
পদতলে বিনষ্টপ্রায়
একা একা হতাশায় সিক্ত
আবরণহীন নগ্ন পরিচয়।
লজ্জা আর লজ্জা নয়
সব দর্প চূর্ণ করে
শুধু বেঁচে থাকা।

অবিন্যস্ত জীবন ক্রমাগত
ঘূর্ণি ঝড়ে দোদুল্যমান
কখনও শূন্যে কখনও ভূমিতটে।
যেন নাগপাশে বন্দী
প্রতিপলে রুদ্ধ নিঃশ্বাস
নিস্তেজ করে আনে
মৃত তবু মৃত নয়।

দুঃসময় তোর বড় কুটিল স্বভাব
ক্রোধ তোর হয় না উপশম
তোর রাজ্যে একটাই বিচার।
ধ্বংসের প্রতীকসম
ক্রমে ক্রমে প্রতিপলে
নিঃসঙ্গতার অন্তরালে অট্টহাসি
করে নিধন।

শুনেছ কি

শঙ্কর তালুকদার

বাতাস কথা কয়
কখনও মৃদু
কখনও গম্ভীর
কখনও উন্মত্ত আচরণ।

নিশীথ রাতে
শুনি দীর্ঘশ্বাস
কার কথা ভেবে
শুধুই বিচরণ।

মিষ্টি হেসে তারারা
করে আলাপন
সঙ্গী খুঁজে ফেরে
তার মন।

সমুদ্রের বিশাল বক্ষে
পরিত্রাহি চিৎকার
গুন গুন সুরে
পাড়ের কাছে স্তিমিত।

চাঁদের হাসি দেখে
ভাবতে থাকি
একটু বেশি
তার গালে টোল।

অরণ্যের আঁধারে
শন শন শন
কারা বাস করে
গা করে ছমছম।

সকাল হলে কলরবে
সব যায় সরে
শোনার মন
মিথ্যে খুঁজে ফেরে।

কলরব যত কথা বলে
কিছু বুঝি, কিছু বোঝার ছলে,
অজান্তে কে যেন বলে
শুনেছ কি, শুনেছ কি?

সমুদ্রগুহা

নূপুর রায়চৌধুরী

অন্ধকারে সাঁতার কাটতে কাটতে
ওই অতটুকুই যেতে পারি
আমি তার কাছাকাছি,
এই জীবনে।
সে এক অন্ধকার সমুদ্র-গুহা,
গভীর থেকে গভীরে তার
বয়ে চলে উষ্ণ প্রস্রবণ,
তাতে ভেসে ভেসে চলে,
তার অজাত স্বপ্নেরা
অপত্যের, জীবনসঙ্গিনীর, ঘরের।
ওদের গায়ে মাথায় ঝিকমিক করে
কোথা থেকে উজিয়ে আসা আলো।
আমার শিরা-উপশিরায় স্মৃতিরা স্পন্দিত হয়
আমাকে শান্ত অথচ অনিশ্চিত করে তোলে ওরা।
ও কার হৃদস্পন্দন শুনি আমি?
তার নাকি আমার?

বিচার

সুমিতা বসু

আমার খেলা, আমার কাজ, আমার দেখা জীবনযাপন চিরায়ত
'আমার' 'আমার' আর কতদিন দিন চলবে তবে দিন গুলজার বাস্তবত?
কর্দমাক্ত দুর্নীতিবাজ পথেঘাটে প্রকাশ্যে আর সগৌরবে
এমনি করেই চলবে কি সব অবহেলা আর নিছক নীরবে?
ঝরা পাতার দিনগুলোতেও রঙে রঙে মাতোয়ারা প্রকৃতি সুন্দরী
তেমনি হঠাৎ দেখি প্রতিবাদ আর আন্দোলনের তরুণ মুখ, মশালধারী
আশায় থাকি, আশায় বাঁচি, অমাবস্যার পরেই যে পক্ষের নাম শুক্ল
বিচার হবেই তিলোত্তমার প্রমাণ যতই লোপাট, হাপিশ বা লুকোলো
কালসমুদ্রে সত্য মাশুল, ধৈর্য আর বিশ্বাসকে করেছি ধ্রুবতারা পানে হাল
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বইব আমরা পতাকা-মশাল, অপেক্ষায় শুভ্র আগামী কাল।

অহল্যা বান্ধবী

প্রভাস দাশ

অনেক রোদ চিরে অবশেষে
পৌঁছালাম বান্ধবীর কাছে।
পথজুড়ে বাতাসে ছিল হালকা
মসলিনের মতো হিম
অচেনা পাখিদের শিসে মিশে
ভেসে আসছিল
তার ডাক
নরম গন্ধরাজের মতো উচাটনী।

ভাড়াগাড়ির চালক নামিয়ে দিল
তার পাহাড়ী ডেরায়।
হাত বাড়িয়ে দেখিয়েও দিল,
যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না।
জানালার ফাঁক দিয়ে ততক্ষণে
দুটো মোহিনী চোখের আলো
পাঠিয়ে দিয়েছে সাদর সম্ভাষণ।
আমি ভুলে গেলাম আমার ফেলে আসা ঠেক,
পচা মাংসের গন্ধমাখা শরীরজুড়ে
কিলবিল করা ভাইরাস।

তোমাকে দেখব বলে এই হেমন্তের
আকাশ বুকে নিয়ে এসেছি
তোমাকে ছুঁয়ে থাকব বলে
আনত মেঘের কাছে মানত করেছি
একা কাঠুরের মতো কেটে নিয়েছি
শুকনো রাগের ডালপালা
তুমি কি শুনেছ সেই কুঠারাঘাত?

এতদিন তুমি ডেকে গেছ অকাতরে
ঘুমের মধ্যে একা অবিরাম
অকৃপণ ব্যগ্রতায় ফেলে এসেছি এলাচের ক্ষেত ও কার্শিয়াং।
এখন পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে পাহাড়ী তন্বী ঘাস,
চুম্বনে শব্দহীন আদরে আদরে
সে আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে
তোমার কাছে
সূর্য নক্ষত্রের নীচে কতদিন তুমি
অপেক্ষায় আছ
কত যুগ, কত গত সময়ের শোক ধুয়ে
এই হিমালয়ের দেশে
শুধু আমাকে দেখবে বলে,
আমার না এসে কি উপায় ছিল!

কবিকে

উদ্দালক ভরদ্বাজ

কখনো কথার মালা
নিজে নিজে গেঁথে নিতে হয়।
শূন্যতার সাদা ফুলে,
রঙ মেখে নিয়ে –
ভুলে যেতে হয়,
অবিশ্বাসী সময়ের নীল ব্যথা।

রিক্ততারও ঋণ থাকে।
যেমন শূন্যতা, যেমন কবিতা,
যেমন ধমনীর গাঢ় খরস্রোত,
নীলিমার মেঘের পাশে
রক্ত-রঙ, ক্ষতের নিরাময়।

শূন্যতার রূপের কথা তো
তুমিও লিখেছ!
বারান্দার একলা টব
শীতের পার্কের গাছ,
বেঞ্চির গল্প-বলা বুড়ো...

তাদের রিক্ততার কাছে
কখনো পাতোনি হাত?
সেই বেশি দিতে পারে
যার বুকে নেই-এর পাল্লার ভাগ বেশী।
যেমন ঝরানো-পাতা,
হেমন্ত বিকেলের রিক্ত মেপল,
ক্ষয়িষ্ণু, বৃদ্ধ মায়ের হাত,
ঋতুহীন বসন্ত-সমতা...

তেমনই হৃদয়-ঋণ
একদিন ভোরের সূর্যে
প্রতিভাত হয়, ক্ষণিক আবেগে,
মুছে যায় তারপর।
মনে হয়, মুছে যায়,
আসলে থাকবে বলেই মুছে থাকে।

আসলে দীর্ঘ রাত
প্রতীক্ষায় আরও দীর্ঘ হয়,
শুধু তাকে শান্তির স্থবির হাত
একদিন দিয়ে দেবে বলে।
দেওয়া আর নেওয়ারও
ফারাক থাকে না।

সেদিন কবিতা তার
মায়ার মোড়ক খুলে
দেখায় পুষ্পের পেলব।
তাকে তুমি নগ্নতা বলো, বা বিষণ্ণতা
অথবা নাম দিও স্নেহের কঙ্কাল।
জড়ানোর নাম নেই কোনও
শুধু নির্ভরতা
শিশুর বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরা,
অটুট শূন্যতাই তবু।

যেখানে জীবন শুরু,
সেখানেই শেষ নয় যেন তবু,
শেষের ভাগের কথা,
শেষের শুরুর কথা
একদিন বলে নিতে হবে।

ততদিন তাপের ঋণে
কবিতায় মন ঢেলে রেখো।
অফুরান, অফুরান মন।
আবদারে, আদরে, তাপে
বুকের নিভৃত সত্যের নির্জনতায়
সেই মন বিছিয়ে দাও
শব্দের গোপন শরীরে।

কবিতা আকাশ পেলে
একদিন সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে তোমায়, কবি!
দেয়, আমি জানি।

পাহাড় আর আদি নিবাসী

যমুনা বীনী নাদর

অনুবাদ: বেবী কারফরমা

আমাদের পূর্বপুরুষ
কিঞ্চিৎ বিপদের আঁচ পেলেই
দুর্গম পাহাড়ে চলে যায়।

পাহাড়ের ওই দুর্গমতা তাদের রক্ষাকবচ ছিল
পাহাড়ের গভীর জঙ্গল
তাদের সুরক্ষা আর আশ্বাস দিত

পাহাড়ের গগনচুম্বী উচ্চতায়
পেঁজা তুলোর মতো উড়ে বেড়ানো মেঘেরা
স্নেহের রুক্ষ হাতগুলো তাদের নরম হাতে রাখত

পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যাওয়া সূর্য লুকোচুরি খেলে
এই পাহাড় আশ্রয় ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের
কীভাবে আলাদা করব পাহাড় আর তার আদি নিবাসীকে!

মাতৃত্ব নারীত্ব ও লজ্জাবস্ত্র

ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী

মাতৃত্বে গঙ্গাধারা মাতৃত্বে তাপ
অযাচিত মাতৃত্বে সুপ্ত অভিশাপ।
নারীত্বে পূর্ণ দেহ, মাতৃত্বে ক্ষয়,
উচ্ছৃঙ্খল মাতৃত্ব সন্তানের ভয়।
নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নির্যাতিতা নারী
রক্তাক্ত ইতিহাসে শত লজ্জা তারই
খর্বাকার নরত্ব নিকৃষ্ট কাজ,
উচ্চশির, উচ্চস্বর একচ্ছত্র রাজ।
শয়তান বুকে জাগে বিশ্ব করে গ্রাস,
বিষাক্ত নাগপাশে রুদ্ধ করে শ্বাস
নির্বিকার দশভুজা মৃত্তিকার সাজ,
অসুর দমনে ঘরে দুর্গা জাগে আজ।
নারায়ণ রেখেছিল দ্রৌপদীর লাজ,
কে পরাবে লজ্জাবস্ত্র নগ্ন যে সমাজ?

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

প্রার্থনা মা তোমার পায়ে বাঁচাও তোমার দেশ,
দুর্নীতি আর কুবুদ্ধিতে প্রায় হতে যায় শেষ!

যে দেশেতে জন্মেছিলেন বিশ্বকবি রবি,
সেই দেশে আজ অসৎ কর্মে ঘৃণ্য মনের ছবি!
প্রাণ দিল আজ যে অভয়া পেল কঠোর ক্লেশ,
শাস্তি দিতে সব পাপীদের লও অভয়ার বেশ!

সেই দেশেতে জন্মেছিলেন ঠাকুর গদাধর,
সেখানে সৎ প্রাণ কেড়েছে লক্ষ্যে আর. জি. কর।
সব দোষীদের শাস্তি যেন না হয় কণা লেশ,
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হও লও অভয়ার বেশ!

সেই দেশেতে জন্মেছিলেন বিশ্বপথিক নরেন,
এমন সমাজ হ'ল সেথা দুঃস্বপনে কাঁদেন!
দশহাতে মা সব অনাচার সকল হিংসা দ্বেষ,
ধ্বংস করো ধ্বংস করো লও অভয়ার বেশ!

যেই দেশেতে জন্মেছিলেন দয়ার বিদ্যাসাগর,
সেই দেশে এক নারীর মন্ত্রে দুঃস্থ মনের কদর!
তিন নয়নে দেখছ মাগো আর্জি করি পেশ,
বিধান করো বজ্রকণ্ঠে লও অভয়ার বেশ!

সেই দেশে আজ নীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য রসাতলে,
অসুর রাজের অত্যাচারে নীরব পরাণ জ্বলে!
সৃষ্টি তোমার কৃষ্টি তোমার, না হয় যেন শেষ,
প্রার্থনা আজ তোমার পায়ে, লও অভয়ার বেশ!

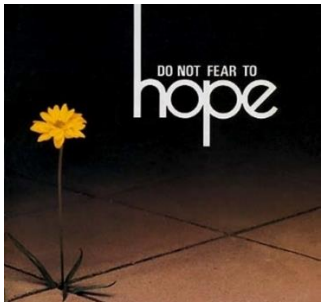

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

রোষের বসে কর্ম কিছুই ধর্ম মেনে হয় না,
শরম লাগে যখন প্রাণে অনুশোচনা সয় না!

রোষ যদি তোর মনকে নাচায় নাচিসনে তার ছন্দে,
শান্ত করে মনখানি তোর রাখিস হৃদয় সঙ্গে।
শান্ত হলে রোষ ঝরে যায়, শ্রান্ত আবেগ বয় না।
শরম লাগে যখন প্রাণে অনুশোচনা সয় না!

সুখ আমাদের শান্তি ঘিরে অশান্তি যার জন্যে,
করিস তারে মন থেকে বার প্রেমের অরূপ চিহ্নে।

জীবনজুড়ে দুঃখ যাহা তার সবই মনসৃষ্ট,
চিনিস তারে বুদ্ধি বলে বলিস না 'অদৃষ্ট'!
দেখবি জীবন আনন্দময় অতৃপ্তিরই ভয় না।
শরম লাগে যখন প্রাণে অনুশোচনা সয় না!

ইচ্ছে হলে

কৃষ্ণা গুহ রায়

ইচ্ছে হলে চলে যেতেই পারো
কিন্তু যাবার সময় অন্তত একটা দরজা
খুলে রেখো যাতে কখনও ফেরার ইচ্ছে হলে
ফিরতে পারো
এই যে এত্ত বড় নীল সাদা আকাশ
দিগন্ত ছোঁয়া হলুদ সবুজ ছোপানো
খোলা মাঠ ফসলি জমি
নির্জন নদীর ঘাট একলা খেয়া
জোছনা রাতে চিবুক ছোঁয়া রুপোলি চুমু
ঠান্ডা বিছানায় উষ্ণ শীৎকার
খুঁটিনাটি মন কষাকষির শেষে খুনসুটি
সবটুকুই তো আপেক্ষিক
তারপর নটে গাছের মতো
প্রয়োজনে প্রিয়জন হয়ে ওঠাও একদিন ফুরোয়
তখন ইচ্ছে হলে চলে যেতেই পারো
কিন্তু যাবার সময় অন্তত একটা দরজা
খুলে রেখো যাতে কখনও ফেরার ইচ্ছে হলে
ফিরতে পারো

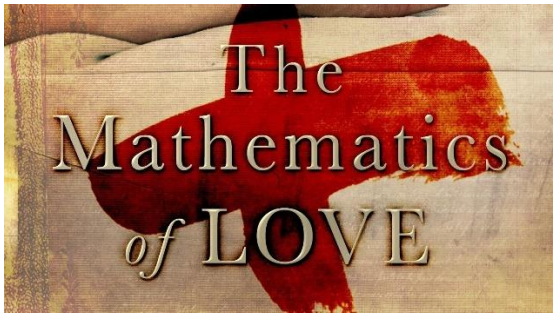

ভালবাসার বীজগণিত

অজয় সাহা

অপরাপর দুটি হৃদয়ের আবেগ প্রণালী
অপরাপর দুটি হৃদয়
তা সে যেমনই হোক
হতে পারে ঢালু হতে পারে সমতল
ধরা যাক কঠিন, নতুবা তরল
মুখরা অথবা মুখচোরা
মাটির দিকে মন হয়তো বা আকাশই স্বজন
অপরাপর দুটি হৃদয়ের আবেগ প্রণালী
তা সে যেমনই হোক
যখন তখন
একটু আধটু চলকে গিয়ে শুধু যদি ছুঁয়ে যায়
যখন তখন
হঠাৎ করে ছিটকে গিয়ে যদি টুকরো লাগে গায়ে
যখন তখন
দুটির মাঝে আর কিছুটি থাক বা না থাক
চলতে থাকা হাওয়া বাতাস শ্বাস প্রশ্বাস
ঋতুর বদল এমনি করেই
একেক সময় দ্রুত আবার সময়মতো ঢিমে তালে
একের সঙ্গে আর এক
যোগ হলে পর যোগ হলে
রীতিমতো শুদ্ধ গণিত; জোড় সংখ্যায় অঙ্ক কষা
বীজগাণিতিক ভালবাসা।

রবীন্দ্র জয়ন্তী-১৪৩১

রঙ্গনাথ

এবারও আগের মতো এল ২৫শে বৈশাখ –
এ দিবসে রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী করছি স্মরণ
গুরুদেবের ছবি পেল নতুন ফুলের মালা
সবাই গুণগান করে তাঁকে করলাম বরণ।

ছোট-বড়রা এসেছে; অনেকে বক্তব্য রাখছে
হচ্ছে তাঁর কবিতা-গল্প পাঠ, হচ্ছে তাঁর গান;
জানছি তাঁর কর্মকাণ্ড, তাঁর দীর্ঘ সার্থক জীবন
শ্রদ্ধার সাথে বলা হচ্ছে তাঁর অমূল্য অবদান।

গত বারের মতো এবারও এসেছে অনেকে
কিছু নতুন অতিথি, পরিচিত বাকিরা সবাই
আগে যারা এসেছিল, কেহ কেহ নেই হেথা –
কেহ গেছে অন্যস্থানে, কেহ আর বেঁচে নাই।

জন্ম-জয়ন্তী আবার আসবে, হবে তা পালন
নতুন-পুরাতন মিলে দিনটি হবে উদ্‌যাপন।

উৎসর্গঃ
প্রয়াত অধীরদা এবং বাবলিদি (গুহ) স্মরণে।
দিলীপদা এবং শুক্তিদির (দত্ত) বাসায় রবীন্দ্র জয়ন্তী
পালন হলে এঁরা দুজন মিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন।

পিতার শংসাপত্র

রঙ্গনাথ

যবে পিতাকে হারাই, তখনই বুঝতে পেরেছি তার মূল্য
শূন্যতা ছাড়াও মনে হয় কত কথা, কত সব স্মৃতি ভাসে;
একসাথে কত না হেঁটেছি, কত ভুলভাল প্রশ্ন করেছি
খেয়াল রাখিনি যে সর্বদা এ মানুষটি ছিল মোর পাশে।

শুনেছি 'হুঁ-হ্যাঁ' শত শতবার – ভেবেছিনু অযথা কথা বলা!
রাগতে দেখিনি তত, মনে হতো গুরুগম্ভীর, অতি সাধারণ;
ভুল হলে করত না গঞ্জনা, ভাল করলে বলত শুধু 'বেশ'
নিজে শুনিনি তার থেকে গুণগান; মনে হতো কেন এমন?

ভুল শুধরিয়েছি নিজে, পিতাকে বলেছি তা; শুনেছি 'বেশ'।
ভেবেছিনু, একটি দুটি 'বেশ' ছাড়া পিতা জানে না অন্যকিছু।
তার সাথে খোলামেলা কথা বলা যেত, ভুল বললে শুধরে দিত
হাসত কম; শাস্তি দিত না। গুণগান গাওয়াটাই শুধু ছিল নীচু!

ওটাও সত্য নয় – শুনেছি অন্যদের কাছে মোর গুণগান হতো
মোর জন্য তার হতো খুব গর্ব যবে কেহ আমায় বলত রত্ন;
গুণ নিয়ে পিতা বলত – বাড়ির কাজও করি লেখাপড়ার সাথে।
লোকে শুনেছে, শেষ দিনগুলোতেও নাকি নিয়েছি তার যত্ন।

ভোরের দোয়েল পাখি

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টিভেজা চারিধার
তখনো ফোটেনি আলো
আবছায়া অন্ধকারে
কুয়াশার ঘোর লেগে আছে
ভোরের বাতাসে
কামিনী ঝোপের কাছে
ঝুঁকে দেখি, পড়ে আছে
একটি দোয়েল পাখি!
বৃষ্টিতে সপসপে ভিজে মৃতপ্রায়
তখনো ডানার নিচে বুক
মৃদু ধুকপুক,
মুখ গুঁজে পড়ে আছে
নীরবে নিথর অনাদর
বনের পাখিরা তার নেয়নি খবর

আজ এই শ্রাবণের ভোর
এইভাবে ম্লান হ'ল
দুঃখ দিল ঘোর।

এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা

বৈশাখী চক্কোত্তি

আমায় নিংড়ে নিচ্ছ তুমি
একটু একটু করে,
ভিজে কাপড় নিংড়োলে যেমন জল পড়ে,
ঠিক তেমনি দু'এক ফোঁটা করে রক্ত
ঝরছে আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

তুমি দেখেও দেখো না, শুনেও শোনো না,
একি সেই তুমি?
নির্বিকার, কখনো বা বড় নির্দয়,
প্রথম যেদিন দেখি গাঙে তোমার ক্লান্তিহীন ডুব
না উজান না ভাটি, কী আছে তোমার হৃদয়ে?

বাতাসে স্তনসন্ধির পরশের ঝিম লাগানো ঘ্রাণ
মাতাল তুমি আবেশে,
সুগন্ধি ও স্বেদ মিলেমিশে একাকার,
দ্বিধান্বিত মিলনের নেশায়
কত উল্লাস! আমার ভেজা আঁচলে আসো বারবার।

হারালে কোথায়? নীল নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ শীতের সন্ধ্যায়,
আজ কেন আনমনা,
যতই খুঁজি, প্রেম, তুমি একা, যাও কোথায়?
কত সময়, কত প্রহর পেরোল, অজানা যাত্রাপথ
ওহে দিশেহারা যাত্রী! তীরের সন্ধানে?
একবার ফিরে দেখো হেথায়।

ক্রোধ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হে পবিত্র ক্রোধ,
জ্বলে উঠো সর্বব্যাপী
স্বজন হারানো শ্মশানে,
জ্বলে উঠুক ক্রোধাগ্নির লেলিহান চিতা!
জ্বালাক পোড়াক ধ্বংস করুক,
অত্যাচারীর আকাশচুম্বী দম্ভ।
শান্তিজল থাক কমন্ডলুবন্দী!
হায়! আমার প্রিয় বঙ্গভূমি!
নীরবে সয়েছ অন্যায়, অত্যাচার!
নিভৃতে অশ্রুভেজা মাটিতে মুখ লুকিয়েছ গভীর বেদনায়।
দিনযাপনের গ্লানি,
বঙ্গসন্তানদের দাঁড় করিয়েছে খাদের কিনারায়।
"হয় ঘুরে দাঁড়াও,
নয় সমূলে ধ্বংস হও।"

নিষ্ক্রিয়

উদ্দালক ভরদ্বাজ

আমার অনেক অসমাপ্ত কবিতা জমেছে,
তোমাকে পড়াই না।
আমার অনেক কথা, এখন
মাঝপথে থেমে যায়।
ভুলে যাই কী বলতে
জুড়েছিলাম প্রথম অক্ষর।

হয়তো ওরাও চায়, তোমাকে
খোলসা করে বলে দিই আমি,
অথবা ছেড়ে যাই রিক্ত অভিমানে...
মাঝামাঝি, ডুবন্ত নৌকায় কেন আছি
ওরাও ভাবে বোধ হয়।
তাই একযোগে ধর্মঘটে যায়,
আসে না রাত্রির সোপানে
কিম্বা ভোরের শিশিরে ভিজে
বুকের স্বপ্নে আর।

হয়তো ওরা চায়, আমার
অভিমানেরও একটা মূল্য হোক!
আমার হেরে যাওয়ার ক্লান্তিরও একটা হিসেব।
হয়তো ওরাই চাইছে আজ হিসেব, আমার হয়ে।
আমার তো আর কেউ নেই, রইল না,
এবং স্বপরিচয়ে যেহেতু ওরাও নির্জীব...

হয়তো ওরাও জানে না
কী করে রক্তের ঋণ,
এভাবে ভণিতা করে।
বোঝে না
কোথায় বিঁধেছে কাঁটা
কেন কাঁটা তোলাও যাবে না আর।
মনে মনে ওরাও বিরক্ত হয়তো
আমার নিষ্ক্রিয়তায়।

দুর্গা এবার আসবেন না

দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

দুর্গা এবার আসবেন না –
নিশ্চিত করে বলছি আমি।
যত বড়ই প্যান্ডেল বানাও,
মূর্তি গড়াও দামী দামী।

দুর্গা এবার আসবেন না –
মিলিয়ে নিও আমার কথা।
আর জি করের নৃশংসতায়
তার মনেও লেগেছে ব্যথা।

দুর্গা এবার আসবেন না –
প্রকৃতিও আছে অবহেলায়।
তাইতো এখনো ফোটেনি কাশ,
আকাশ ভরেনি মেঘের ভেলায়।

দুর্গা এবার আসবেন না –
এখানে মেয়েরা নিরাপদ নয়।
কথায় কথায় দুর্গারা আজ
অসুরের হাতে ধর্ষিতা হয়।

দুর্গা এবার আসবেন না –
জ্যান্ত দুর্গা পুড়ছে মরে –
কেউ আসে না বাঁচাতে তায় –
কী লাভ মাটির দুর্গা গড়ে?

দুর্গা এবার আসবেন না –
যতই থাকুক থিমের বাহার,
যতই আলো জ্বলুক রঙিন,
আসল দুর্গার আজও অনাহার।

কী লাভ বলো এমনি পুজোয়?
ঢাকের সুরে মায়ের বোধন?
বাংলা জুড়েই হচ্ছে যে আজ
তোমার আমার দুর্গা নিধন।

হাজার হাজার সংঘ ও ক্লাব
সাজাচ্ছে শুধু মায়ের প্রতিমা –
তিলোত্তমার বিচার দাবীতে
হারাতে চায় না আপন গরিমা।

দুর্গা এবার আসবেন না –
বাদ্যি বাজুক যতই জোরে।
অসুর যেখানে শাস্তি পায় না
এমন ঘৃণ্য অপরাধ করে।

শিল্পী: নব্যাণশা বিশ্বাস (বয়স ৯)

আন্নামা

শুভা আঢ্য

আমেরিকার ড্যালাস শহরের একটি বর্ধিষ্ণু শহরতলিতে সবে ভোরের আলো পূব আকাশে ছড়াতে শুরু করেছে | প্রকৃতির ইচ্ছেতে নয়, রীতিমত মাপজোপ করে, গড়ন আর বিস্তারের বিচার করে, সযত্নে বর্ধিত গাছের ছায়ায় ঢাকা সাটিনের মতো মসৃণ কালো পিচঢালা রাস্তা | তার দুপাশে সারি সারি সুদৃশ্য অট্টালিকার মতো বাড়ি, সামনে রংবেরঙের পাড় দেওয়া রেশম সবুজ ঘাসের লন | নিরালা নির্জন সকালে এখানে এলে মনে হতে পারে বুঝি কোন মায়াকাঠির ছোঁয়ায় ওই চকচকে বিশাল বিশাল দরজার পিছনে অচেতন এক জগত আছে| কিন্তু তা ঠিক নয় | এরাও নিয়মিত জাগে অ্যালার্মের মিষ্টি সুরে, ধূমায়িত সোনালী চা কিংবা কফির মনোহর সুবাসে | রুটিন বাঁধা জীবন এখানকার বাসিন্দাদের | গ্যারাজ খোলা বন্ধ, মাঝে মাঝে দু'একটা চকচকে গাড়ি চলে যাওয়া, আর হেডফোনে কানঢাকা কোনো কুকুরপ্রেমী পথিকের দেখা মিললে বোঝা যায় এরা আছে, জেগেই আছে | শুধু চিরশান্ত এই পরিবেশে সহসা কোনো ঢেউ ওঠে না|

তবে আজকে সেই নিস্তরঙ্গ বাতাবরণে দেখা যাচ্ছে এক চাপা উত্তেজনা| পাড়ার একটি লাল ইঁটের দোতলা বাড়িতে হলুদ রঙের ফিতের ঘের জানান দিচ্ছে ওটি একটি "Crime Scene"| একটিকে বাদ দিয়ে অন্য সব পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, দমকল কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে কৌতূহলী জনতার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই| পুলিশের কাজে বাধা সৃষ্টি করে নিজের ঔৎসুক্য মেটাবে, এমন অনৈতিক কাজে হাজার ইচ্ছে থাকলেও কেউ এগোবে না, তাই দু'একটা ছুটকো-ছাটকা ভেসে আসা খবর নিয়ে আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলোচনা করছে | Crime Scene-এর বাড়িটির ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে একটি নতুন লাল Mercedes Benz, আর একটি একটু পুরনো রুপোলি Toyota Camry | লনের ভিজে ঘাসে কাদামাখা জুতোর ছাপ| সামনের বারান্দার ওপর উল্টে পড়া দুটি বিরাট ফুলের টবের মাটি জলে মিশে কাদা হয়ে নেমে এসেছে তিনটি সিঁড়ি বেয়ে আর সেই কাদামাখা সিঁড়ির ওপরেই বসে আছে তিনটি ছোট মেয়ে, যাদের বয়স মনে হয় আট থেকে বারোর মধ্যে | তাদের রাতজাগা শুকনো মুখে ত্রাসের ছায়া সুস্পষ্ট | ওদের কাছেই এক মহিলা পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন | একটু দূরে লনের একপাশে রাখা লোহার বেঞ্চিতে সাদা শর্টস ও লাল টি-শার্টপরা চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক বসে | একমাথা এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত| এদের দেখে ভারতীয় বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না|

বাড়ির সামনের খোলা দরজা পেরিয়ে ভেতরে গেলে চওড়া হলের দুপাশে লিভিংরুম, ডাইনিংরুম ও স্টাডি| বাঁ দিকে গেলে কিচেন ও ব্রেকফাস্ট এরিয়া| জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছায়া-ঢাকা সবুজ ব্যাক ইয়ার্ড, টবে গন্ধরাজ, বেল ও জবা গাছ| হলটির মাঝামাঝি ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় | সিঁড়ি ছেড়ে হলটি আরো এগিয়ে গেছে, মাস্টার বেডরুমের দরজার দিকে | মাস্টার বেডরুমের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে আনলে, জানলার লেসের পর্দায় কিংবা বাঁদিকের দেওয়ালের সামনে রাখা গোলাপী ব্রোকেডের ছোট সোফায় বা পাশের ছোট টেবিলের ওপরে রাখা বেগুনি ফুলে সাজানো ক্রিস্টালের ফুলদানিতে কোনো অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে না, শুধু ঘরের মাঝখানে চোখ পড়লে শিউরে উঠতে হয় আতঙ্কে| সেখানে কোনো এক দুরন্ত অগ্নিকান্ডের প্রলয়লীলা থেকে এখনও ভিজে গরম ধোঁয়া উঠছে | কিং সাইজ বিশাল খাটের শুধুমাত্র গোল গোল স্প্রিংগুলো গলে গিয়ে এবড়ো খেবড়ো হয়ে রয়েছে| কারুকার্য করা হেডবোর্ড পুড়ে কালো হয়ে হেলে পড়েছে পিছনের আইভরি দেওয়ালে, যেখানে নিভে যাওয়া আগুনের ধূসর সর্পাকৃতি বিচিত্র রেখা উঠে গেছে সিলিংয়ের দিকে | পায়ের দিকে কুন্ডলীকৃত ভিজে লেপের একপাশে পড়ে আছে অর্ধদগ্ধ একটা সেলফোন, প্রায় গলে যাওয়া একটা সিগারেট লাইটার| বাথরুমের দরজার কাছে ভিজে সপসপে কার্পেটের ওপর উল্টে পড়ে আছে একটা লাল গ্যাসের ক্যান| অসম্ভব কটু পোড়া গন্ধ ছাড়াও দ্বিতল বাড়িটা ভরে আছে এক প্রাণহীন নীরবতায়| যেন অভিনয়ের শেষে যবনিকা পতনের পর নাটকের পাত্রপাত্রীরা ছেড়ে গেছে নাট্যমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ হয়েছে শূন্য | যে রুদ্র নাট্যলীলা কিছুক্ষণ আগে অভিনীত হয়েছিল তার ভয়াবহ কিছু চিহ্ন আছে পড়ে|

ঠাকুরমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে ঘুমের দেশে

তলিয়ে গিয়ে আন্নামা সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার রাজকুমারের স্বপ্ন দেখতে বড় ভালবাসত | শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের নানা রঙের দিনগুলোতে সে স্বপ্ন যেন আরো সত্যি হয়ে দেখা দিত | কেরালার সজল সবুজ মেঠোপথচলতি শ্যামলা এক মেয়ের মনের কোণে আশার মুকুল হয়ে দুলে উঠত ঠাকুরমার গল্পের শেষে 'তারপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল..." রূপকথার এই শেষ আশ্বাসটিকে সে পরম বিশ্বাসে মনের মধ্যে ধরে রেখেছিল | সে জানত, যতই রাক্ষস-খোক্কস, পাহাড়-সাগর, বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না তার হবেই |

১৯৭৩ সালে দেশ থেকে নার্সিং পাস করে কেরালার বহু মেয়ে আমেরিকাতে এসে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল | এই সূত্রেই আমেরিকাবাসী মাসতুতো দাদা মাইকেলের আমন্ত্রণে সদ্য বিবাহিতা ২২ বছরের আন্নামা সুদর্শন জন ম্যাথিসের হাত ধরে, দেশ আর প্রিয়জনের স্নেহের কোল ছেড়ে রওনা হয়েছিল সুদূর আমেরিকার উদ্দেশ্যে | দেশের তুলনায় অনেক বেশি উপার্জন করবার আকর্ষণ তো ছিলই, তাছাড়া নতুন দেশের পটভূমিকায় নতুন জীবন শুরু করবার উৎসাহও কিছু কম ছিল না | নিজের দেশ, আপনজনকে পিছনে ফেলে আসার দুঃখে তার কালো চোখে ছলছল করে উঠেছিল অশ্রু, তবে সে অশ্রু কিছু সময়ের মধ্যেই নতুন দেখা স্বপ্নের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল | প্রথম কিছুদিন দাদার আশ্রয়ে থাকার পর আন্নামা কাজ পেয়ে যায় ড্যালাসের বিশাল পার্কল্যান্ড হাসপাতালে | প্রায় একই সময়ে জনও কাজ পায় টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট কম্পানির এক ফ্যাক্টরিতে | অনেক আশা বুকে নিয়ে শুরু হয় তাদের American Dream-এর যাত্রা | একের পর এক হতে থাকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ছোট বাড়ি, তারপর বড় বাড়ি | পুরনো Ford থেকে আনকোরা Mercedes! আন্নামা নিজের অধ্যবসায়ের জোরে, RN থেকে BSN তারপর MSN ডিগ্রী করে নিয়ে, ফ্লোর নার্স থেকে সুপারভাইসার তারপর নার্সিং কলেজের সহ-অধ্যাপিকার পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে | এর মধ্যে আন্নামার কোল জুড়ে এসেছে ফুলের মত ডিক্সি, পিঙ্কি আর ছোট্ট ডলি |

সাল ১৯৯১, বাড়ি, গাড়ি, আর্থিক স্বচ্ছলতা – American Dream উপলব্ধি করবার আর কিছু বাকি নেই, তাই তো! কিন্তু... এই গল্পের আরও এক অঙ্ক এখনও বাকি আছে | আর সেখানেই এ গল্পের সমাপ্তি |

সেই যে আন্নামার স্বপ্নের রাজকুমার, জন, তাকে মনে আছে? আন্নামা যখন অসম্ভব পরিশ্রম করে একের পর এক সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে তখন জন কী করছিল? আন্নামার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তার নিজের সফলতা প্রমাণ করছিল? ফুটফুটে তিনটি সন্তানকে নিয়ে আন্নামার সঙ্গে রচনা করছিল এক শান্তির নীড়, এগিয়ে চলেছিল এক আনন্দময় জীবন পরিক্রমার পথ ধরে? না, তা সে করেনি | জনের পৃথিবীতে শুধুই অসন্তোষ | কাজে কেউ তার উচিত মূল্য দেয় না, তাই একের পর এক কাজ বদল | কেন আন্নামা তাকে একটিও পুত্রের পিতা করতে পারেনি, তার ক্ষেদ, পাড়াপড়শী, চেনাজানাদের যা আছে তাদের থেকেও দামী জিনিস অনতিবিলম্বে তার অধিকারে না এলে তার বিরক্তি | তার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব কিছুর মূলে আছে আন্নামা | তাদের মতানৈক্য, তুমুল অশান্তির জন্য আন্নামাকেই সে দায়ী করে | জনের দাবি অনেক, অভিযোগ নিয়ত, আর ক্রোধ অপরিসীম | তার উপরেও আছে সুরাসক্তি | জনের মতে, একমাত্র সুরার আবেশেই সে তার সব অশান্তিকে ভুলে থাকতে পারে |

আর সবার কাছে বাড়ির নিয়মিত অশান্তির কথা গোপন থাকলেও, চাপা থাকে না ছোট তিনটি মেয়ের কাছে | মা, বাবার নিত্য কলহের মূলে যে কে তা তারা ভাল করেই জানে | রাতের গভীরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যখন তাদের কানে আসে কলহের উন্মত্ত চিৎকার, তখন চাদরের নিচে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁপা ছাড়া তারা আর কীই বা করতে পারে! মায়ের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে চোখ নামিয়ে নেয়, কারণ জানতে চায় না | আন্নামা অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে জনকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে, তার দাবি যতদূর সম্ভব পূরণ করে, আর মেয়েদের যতটুকু পারে তাদের বাবার drunken outburst থেকে আগলে রাখে | জনের উন্মত্ত ক্রোধের ফলস্বরূপ নিজের abuse-এর দাগগুলি লুকিয়ে রাখে, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে | সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে সংসারে শান্তি বজায় রাখতে | মনে মনে নিজেকেই দোষী ভাবতে থাকে | মেয়েদের শেখায়, বাড়িতে যা ঘটে তা বাইরে কারোর কাছে বলতে নেই, নিন্দে হয় তাতে | কিন্তু এত চেষ্টাতেও কি শেষ রক্ষা হয়?

যখন কিছুতেই আন্নামার প্রতিষ্ঠা আর সহনশীলতাকে জন কৌশলের পর কৌশলে, আঘাতের পর আঘাতে চূর্ণ করে দিতে পারল না, তখন সে অন্য পথ ধরল। একদিন হঠাৎ ঘোষণা করল যে সে আমেরিকার সংসার তুলে সবাইকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। আন্নামার এত কষ্টে গড়ে তোলা career, আমেরিকার বাতাবরণে বড় হয়ে ওঠা মেয়েদের ভবিষ্যৎ, তার কাছে এসবের কোনো মূল্য ছিল না। আন্নামাকে একবার দেশে নিয়ে যেতে পারলেই তাকে জব্দ করা হবে, এই ছিল তার উদ্দেশ্য। আন্নামার প্রতি গভীর ঈর্ষাই ছিল এর প্রধান কারণ, সে কথা আন্নামারও অগোচর ছিল না। এতদিন ধরে জনের সব দুর্ব্যবহার মেনে নিয়ে, নিজেকে নিঃস্ব করে, এক অমানুষিক শক্তিতে ঘরে বাইরে যুদ্ধ করতে করতে এবার আন্নামা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আন্নামা, তার দাদা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা জনকে হাজার বোঝাবার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হ'ল না। জনের সেই এক জেদ, সে যাবেই আর সঙ্গে যাবে আন্নামা ও তার মেয়েরা। এরপর থেকে সংসারের অশান্তি চরমে উঠেছিল। আন্নামার স্বভাবসুলভ হাসি মুছে গিয়েছিল। কালো চশমায় চোখ ঢেকে, কিংবা টেক্সাসের অসম্ভব গরমে পুরো-হাতা জামা পরেও তার শরীরের অত্যাচারের দাগ কারো কাছে ঢাকা থাকেনি। আন্নামার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেরি ভার্গিসের হাজার প্রশ্নের উত্তরে আন্নামা শুধু মাথা নিচু করে ম্লান হেসেছে কিন্তু কিছুতেই মুখ খোলেনি। দাদার প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, চিন্তার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো তখনও আন্নামার মনের কোণে কোথাও এক টুকরো আশা ছিল যে সে তার অক্লান্ত সেবা, প্রাণভরা ভালবাসা আর ধৈর্য দিয়ে ফিরিয়ে আনবে সেই অনেকদিন আগের চেনা জনকে, যে চার্চে সবার সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল "to love and to hold until death do us part!"

সেদিন ছিল মাঝ গ্রীষ্মের এক চাপা গুমোট সন্ধ্যা। গাছের একটা পাতাও নড়ছিল না। প্রকৃতি যেন ক্লান্ত হয়ে নিঝুম হয়ে পড়েছিল। রোদজ্বলা দুপুরের পর গরম একটুও কমেনি। আন্নামা ব্যস্ত ছিল রান্নাঘরে, বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছিল চিকেন কারির গন্ধ। জন একটু আগে টেনিস খেলে ফিরে বিয়ারের বোতল নিয়ে বসেছিল টিভির সামনে। ডিক্সি, পিঙ্কি আর ডলি তাদের ছোট্ট কুকুর জিফিকে নিয়ে সামনের লনে খেলছিল। একটি সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ ছবি। আকাশের কোণে একরাশ কালো মেঘ সবার অলক্ষ্যে জমা হচ্ছিল, তারপর ধীরে ধীরে কখন যে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে বাচ্চাগুলোর নজরে পড়েনি; খেয়াল হ'ল হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামায়। জিফিকে দুহাতে তুলে নিয়ে আগে ডিক্সি ও তার পিছনে পিঙ্কি ও ডলি ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এল। দরজা খুলেই ওদের কানে এল রান্নাঘর থেকে জনের মালয়ালি ভাষায় উত্তেজিত আস্ফালন আর হুমকি। ছোটরা অত না বুঝলেও বারো বছরের ডিক্সি কিছুটা আন্দাজ করতে পারল, এ সেই দেশে ফিরে যাওয়ার হুমকি। বাবার জড়ানো গলা আর মায়ের নিস্তব্ধতাও তার জানা। সে অনুমান করতে পারে এরপর শোনা যাবে মায়ের চাপা কান্নার আওয়াজ, হয়তো দু'একটা বাসন ভাঙ্গার শব্দ। কাল সকালের আলোয় মায়ের মুখে চোখে দেখা দেবে অভ্রান্ত আঘাতের চিহ্ন, যা মা আবার সযত্নে চাপা দেবে কালো চশমা বা মেকআপের নিচে, কিংবা বলবে কোনো অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনার গল্প। অন্য দিনের মতোই তারা ডিনার টেবিলে চুপ করে খেয়ে নেবে, রাত নেমে এলে চাদরের নিচে মাথা ঢেকে আতঙ্কে শুনতে থাকবে নিচের ঘরে দুঃসহ কলহের চিৎকার। তারপর কখন সর্ব তাপহরা ঘুম এসে কিছুক্ষণের জন্য তাদের নিয়ে যাবে শান্ত অন্য কোনো জগতে। আবার আসবে পরের দিনের সকাল, আবার আসবে রাত্রি, আর সঙ্গে আনবে সেই অশান্তি, ভয়, আর আতঙ্কের বিরাট বোঝা।

সে রাতে সকলে শুতে যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ম্যাথিস পরিবারের সবকিছু বদলে গেল। পেট্রোলিয়ামের গন্ধে, আগুনের জ্বলন্ত উত্তাপে আর যন্ত্রণা-কাতর এক ভয়ার্ত চিৎকারে। আচমকা ঘুমভাঙা চোখে ডিক্সি, পিঙ্কি আর ডলি ছুটে গিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে নিচে মায়ের ঘরের দিকে। দেখছিল আগুনের লেলিহান শিখা ঘরের মাঝখান জুড়ে উদ্দাম নৃত্যরত। তালগোল পাকানো একটা জ্বলন্ত পিন্ড থেকে একটা গোঙানির শব্দ উঠছিল। ডিক্সি দুই বোনকে সজোরে বাইরে ঠেলে দিয়ে হলের ফোন থেকে ৯১১ ডায়াল করেছিল, তারপর তিনজনে বাইরের লনে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল। জনকে তারা দেখতে পায়নি, সে কোথায় ছিল সে এক রহস্য। ছোট্ট জিফিকে পাওয়া গিয়েছিল আন্নামার দগ্ধ মৃতদেহের পাশে। সে কি আন্নামাকে বাঁচাতে চেয়েছিল তার যতটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়ে? আগুন নিভে যাওয়ার পর পাওয়া গিয়েছিল শান্ত ধীর, হাসিখুশি

আন্নামাকে, চেনা যায়নি। তার রূপকথার স্বপ্ন নিয়ে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কারো কাছে কোনো নালিশ না জানিয়ে। ইনভেস্টিগেশন? হয়েছিল বইকি। জন, প্রমাণ করতে চেয়েছিল আন্নামা আত্মহত্যা করেছে। তবে তার সিগারেট লাইটার আর ডান হাতে পোড়ার দাগ তাকে সনাক্ত করে দিয়েছিল এক জঘন্য খুনি বলে। মিথ্যার পর মিথ্যা বলেও সে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। তার আজীবন কারাদন্ড হয়েছিল। তবে মেয়েদের মুখ থেকে তাদের বাবার বিপক্ষে একটি কথাও কেউ বার করতে পারেনি। মাকে হারিয়েও তারা হয়তো মা'র বলে যাওয়া কথাগুলি আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। মনে রেখেছিল – "ঘরের কথা বাইরে বলতে নেই, নিন্দে হয়।"

এই গল্পের এখানেই সমাপ্তি, কিন্তু সত্যিই কি এখানেই তার শেষ? মনে কি প্রশ্ন ওঠে না, যুগে যুগে, দেশে দেশে, প্রতিবাদহীন আন্নামারা কেন নিঃশব্দে হারিয়ে যায়? খবরের কাগজে হলদে হয়ে যাওয়া পাতায়, আদালতের ভুলে যাওয়া নথিপত্রে, আমাদের অচেতন মনে 'মনে-না-রাখা' অন্ধকারে? কেন তারা মেনে নেয় অসম্মান, দৈহিক ও মানসিক পীড়ন, কেন তারা বলে না 'থামো'? কেন লোকলজ্জার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখে? কে শিখিয়েছে তাদের মাথা নিচু করে থাকতে, ধরিত্রীর মতো সহনশীলা হতে? আত্মজন, রীতি নীতি না সমাজের পরম্পরাগত মতবাদ? আর জন? কে তাকে বা তাদের শেখায়, আন্নামাদের সমান অধিকার দেবার প্রয়োজন নেই। ওরা কেন দাবি করে বশ্যতা, কেন একজনের ক্ষতি স্বীকারকে তারা উচিত মূল্য দিতে জানে না, ভেবে নেয় এ তাদের প্রাপ্য অধিকার? আর আন্নামার কচি মেয়েগুলো? তারাও কি জীবনভ'র, ঘরের কথা ঘরেই লুকিয়ে রাখবে? করবে না সমান অধিকারের দাবি? প্রয়োজনে নিজের ভাগ্যের লিখন নিজেরা নতুন করে লিখে নিতে শিখবে না? এমন মানুষদের যদি আমরা দিনের কাজের নানা ব্যস্ততায় ভুলে থাকি তাহলে হয়তো ওরা কখনই এসে দাঁড়াবে না আমাদের সামনে, বলবে না এর প্রতিকার করো। সে দায় আমাদের। ওদের আমরা দেখি কাগজের পাতায়, টিভির পর্দায়, কখনো বা চেনা ঘরের চেনা মানুষের মধ্যেই। তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাবি, আমি আর কী করব? হয়তো আশা করি আর কেউ যা করবার করবে। প্রাইভেসির পর্দা সরাতে আমাদের ভারি সংকোচ। সেই সংকোচের বিহ্বলতার জন্যেই প্রাণ দেয় আন্নামা এবং আরো অনেকে, আর আমরা একটু ক্ষণের জন্য অপরাধ বোধের যন্ত্রণা ভোগ করি।

তবু, সত্যিই কি আমরা কিছুই করতে পারি না, আগামী দিনের আন্নামা কিংবা জনের জন্য? হয়তো পারি। সে আরেক কাহিনী পরের বারের জন্য তোলা রইল।

আর একটা কথা – এ গল্প কিন্তু গল্প নয়। সবটাই সত্যি, শুধু বদলে দেওয়া নামগুলো বাদে। ডেন্টন কাউন্টি জেলে তার জলজ্যান্ত সাক্ষী আজও বিরাজ করছে।

মহানির্বাণের পথে

মৈত্রেয়ী সরকার

জীবনে মাঝে মাঝে আমরা এমন কিছু ঘটনা ঘটতে দেখি যার বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা মেলে না | তখন মনে হয় এই ইউনিভার্সের, এই পৃথিবীর ভেতর কি আরো একটা পৃথিবী সূক্ষ্ম স্তরে বর্তমান! এই মহাবিশ্বের পঁচাশি শতাংশই নাকি ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি! আর যে যৌগিক এবং মৌলিক পদার্থ, যা আমরা চোখে দেখতে পাই, তা নাকি মাত্র পনেরো শতাংশ | তাহলে যা আমরা চোখে দেখতে পাই না, সেই ডার্ক ম্যাটার আসলে কী? তবে কি সূক্ষ্ম স্তরের সেই জগতে অদেখা এক জগৎ লুকিয়ে আছে? এই পৃথিবীর মধ্যেই আরো অনেক পৃথিবী? কে জানে! আমাদের চোখের সামনে যা দৃশ্যমান তা যদি মহাবিশ্বের উপাদানের পনেরো শতাংশ হয় তাহলে বাকি পঁচাশি শতাংশের উপাদান হয়তো চোখের সামনেই ঘটছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না | বিজ্ঞানের আবিষ্কারের যে এখনো বহু পথ চলা বাকি! এই মহাবিশ্বের রহস্যের কাছে সে এখনো শিশুমাত্র | পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা এই ডার্ক ম্যাটার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাচ্ছেন; আমরা তো শুধুমাত্র আলোচনা করেই ড্রয়িংরুম ফাটাচ্ছি | ভারতীয় সাধুসন্তরা এই যে হাজার হাজার বছর ধরে অলৌকিক শক্তির পূজা করে আসছেন, সুপ্রিম পাওয়ারের কথা বলে আসছেন, সে সবই কি মিথ্যা হতে পারে! মিথ্যার কি এত শক্তি যে প্রায় দশ হাজার বছর ধরে ঈশ্বরের কনসেপ্ট ধারণ করে রাখতে পারে? তাহলে এই সুপ্রিম পাওয়ারের অস্তিত্ব আছে মেনে নিতেই হয় | এই পৃথিবীতে ডার্ক ম্যাটার কাজ করে | সূক্ষ্ম স্তরে এমন বহু ঘটনা ঘটে, আমরা নিজেরাই যার কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারি না | বছর খানেক আগে এমনই একটা ঘটনার সাক্ষী ছিলাম আমি নিজে, যার কোনো যুক্তি আমি আজও খুঁজে পাইনি | তাহলে সেই গল্পটা এবার বলি |

সেবার আমি পেপারের কাজে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম অরুণাচল প্রদেশে | এর আগেও দুবার অরুণাচল প্রদেশে গিয়েছি | এবার দিরাং শহরের হোটেলে না থেকে ঠিক করলাম দিরাং থেকে সাত কিলোমিটার দূরে সাংতি ভ্যালিতে থাকব | সাংতি ভ্যালিতে তখন সবেমাত্র দুটো হোম স্টে তৈরি হয়েছে | হোম স্টে না বলে সেগুলোকে ফার্ম স্টে বলাই ভাল | চাষীরাই মালিক | নিজেদের বাড়ি আর চাষের খামারের মধ্যেই টুরিস্টদের জন্য গোটা দুই-তিন ঘর করে রেখেছেন | তিনবেলা রান্নাবান্না করে নিজেরাই পরিবেশন করেন | আমি দুটো ফার্ম স্টের মধ্যে যেটা একদম সাংতি নদীর গায়ে, সেটাই বেছে নিলাম | দিনরাত পাথর ভেঙে কলকল শব্দে নদীর বয়ে যাওয়া আমায় নেশা লাগিয়ে দেয় | এই শব্দটা আমার গভীর রাতে কিম্বা নিস্তব্ধ দুপুরে খুব ভাল লাগে | আমার এই ফার্ম স্টের মালিকের নাম সিয়াংচু | এঁরা অরুণাচলের ও তিব্বতের আদিম মংপা জনজাতির মানুষ | পাহাড়ে পশুপালন করে এঁদের পূর্বপুরুষেরা জীবিকা নির্বাহ করতেন | এখন পাহাড় ফাটিয়ে কিছু চাষের জমি তৈরি করে কিম্বা দু'একটা ঘর বানিয়ে টুরিস্টদের সেবা করে এঁরা ভিন্ন পেশার দিকে আগ্রহী হচ্ছেন | গ্রামে একটা স্কুলও আছে | হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত পড়ানো হয় | তারপর কলেজে পড়তে গেলে ছেলেমেয়েরা ইটানগর কিম্বা তাওয়াং-এ চলে যায় |

সিয়াংচুর পরিবার এই হোম স্টের পাশেই থাকে | ওদের দুখানা কাঠের বড় বড় ঘর, আর নদীর একদম গায়ে একটা ছোট্ট রান্নাঘর | সিয়াংচুর বউ একদম তিব্বতী মেয়েদের মতো দেখতে; বেঁটেখাটো, মোটা ও মুখটা একটু বিশ্রী | তবে ওঁর ব্যবহার ভীষণ আন্তরিক | রান্নার হাতও খারাপ নয় | টুরিস্ট আসলে খানিক আড়ষ্ট হয়ে পড়েন তিনি; খাবার পরিবেশনও করেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ও ভীতভাবে | দু'একদিন যেতে না যেতেই আমি এই পরিবারের সাথে ভীষণভাবে মিলেমিশে গেলাম | ফিল্ডের কাজ নিয়ে সপ্তাহ দুয়েকের জন্য এসেছি এখানে | ভূগোলের অধ্যাপক হওয়ায় এরকম ফিল্ড ট্রিপে আমাকে মাঝে মাঝেই যেতে হয়; ফলে হোম স্টে-র মালিক এবং নিরীহ গ্রামের মানুষদের সাথে জমিয়ে নিতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না |

সিয়াংচুর তিন ছেলে | বড় ছেলে স্টেঞ্জিং, বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করে | সে গাড়ি চালিয়ে ক্ষেতের সবজি মার্কেটে নিয়ে যায় | হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত পড়েছে | পড়াশোনায় ভাল ছিল, কিন্তু দূরের কলেজ হস্টেলে রেখে, খরচ করে সিয়াংচু আর পড়াতে পারেনি ছেলেকে | মেজ ছেলে ক্লাস এইটে পড়ে সাংতি ভ্যালিতে | সে তার স্কুল আর খেলা নিয়েই ব্যস্ত | ছোট ছেলে রিংপোচে, সারাক্ষণ একা ঘরে বসে

থাকে আর পূজাপাঠ করে। দেখে মনে হয় বয়স পাঁচ কি ছয় হবে। তবে শারীরিকভাবে বেশ সবল, কোমল ও স্নিগ্ধ। এই বয়সে বাচ্চারা ক্লাস ওয়ান বা টুতে পড়ে। রিংপোচে স্কুলে যায় না, এমনকি সাংতি ভ্যালির মাঠেও খেলতে যায় না। ওর মা বাবা দিনের বেশিরভাগ সময় ওকে ঘরেই বসিয়ে রাখেন। মাঝে মাঝে ওকে উঠোনে ঘুরতে আর গাছের ফুল ছিঁড়তে দেখেছি। দিন তিনেক থাকার পর কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি সিয়াংচুকে জিজ্ঞেস করেই বসলাম! "ভাইয়া, আপকা ছোটা লেড়কা স্কুল নেহি যাতা? ও হরওয়ক্ত ঘরমে কিঁউ ব্যায়ঠা রাহাতা হ্যায়? আকেলে মে উসকা ঘরমে হরওয়ক্ত রহেনা আচ্ছা লাগতা হ্যায় কেয়া?"

আমার এমন প্রশ্নের জন্য সিয়াংচু একদম প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। তারপর মাথা নীচু করে, হাত কচলে বললেন, "ম্যাডামজী, ইয়ে হামারি মজবুরি হ্যায়! হাম ইয়ে বাত বাতা নেহি সকতি।"

বুঝলাম আমি হয়তো অনাবশ্যক ওদের পারিবারিক বিষয়ের গভীরে ঢুকতে চাইছি। ব্রেকফাস্টে আলুর পরোটা শেষ করে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। দূরে সিয়াংচুর স্ত্রী দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখ দেখে সুখ, দুঃখ বা বিরক্তি কিছুই বোঝার উপায় নেই। বিষয়টিকে ওখানেই থামিয়ে দিয়ে, ডিনারে এগকারি খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে আমি তাড়াতাড়ি ফিল্ডে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার ভেতরে ক্রমাগত কুরে কুরে খাচ্ছিল – গত তিন চারদিন ধরে দেখছি এই বাড়ির ছোট ছেলেটিকে নিয়ে সবাই প্রচন্ড আশঙ্কাগ্রস্ত। রিংপোচেকে দেখলে শারীরিকভাবে সুস্থ বলেই মনে হয়। তবে ও একটু বেশি শান্ত। ওর চোখদুটো উজ্জ্বল ও ভীষণ স্থির। কথা একদম বলে না বললেই চলে। এই বয়সের বাচ্চারা সাধারণত ভীষণ চঞ্চল হয়, কিন্তু এ তার একদম বিপরীত। সিয়াংচুর বড় ও মেজ ছেলে শার্ট-প্যান্ট-গেঞ্জি ইত্যাদি স্বাভাবিক পোশাক পরে, কিন্তু রিংপোচে লাল ধুতি পেঁচিয়ে রাখে। ওর পোশাক বাড়ির সবার থেকে আলাদা। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি ফিল্ডে পৌঁছে গেলাম।

বিকেলে ফিরতে প্রায় পৌনে পাঁচটা হয়ে গেল। তখন সাংতি নদীর উপর বিকেলের কনে দেখা সোনালী আলো। সিয়াংচুর রান্নাঘর থেকে কাঠের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভেবেছিলাম ঘরে ঢুকে ফিল্ডের কাজ লিখতে শুরু করব; কিন্তু একটু ফ্রেশ হয়ে নিতেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম।

সিয়াংচু ডাকছে, "ম্যাডামজী, আপ ফ্রি হো কেয়া?"

কিছুটা আশ্চর্য হয়েই বললাম, "হাঁ, হুঁ।"

আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, "আগর আপকে পাস টাইম হ্যায় তো হাম একসাথ চায়ে পিয়েঙ্গে। মেরে পত্নী চায়ে অওর পকৌড়া বনা রহে হ্যায়।"

প্রস্তাবটি পেয়ে একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম। মিনিট পাঁচেক পর বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিয়াংচুর রান্নাঘরের পেছনে দুটো কাঠের বেঞ্চি বানানো আছে। মাঝে একটা কাঠের গুঁড়ি। সিয়াংচু আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি এসে বসতেই সিয়াংচু চা আর পকৌড়া নিয়ে এলেন। এখন আর রোদ নেই। দিনের আলো একটু কমে এসেছে।

সিয়াংচু আপন মনে বলতে থাকলেন, "ম্যাডামজী, আমরা অরুণাচল প্রদেশের মংপা জনজাতির মানুষ। বহু বছর আগে তিব্বতের লাসা শহরের মনেস্ট্রি থেকে আমাদের উপর শাসন চালাত। সেই সময় থেকেই আমরা হীনযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। আমাদের এই সাংতি গ্রামে একটা মাটির মনেস্ট্রি ছিল প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। সেখানে একজন লামা থাকতেন। গ্রামের মানুষের দেওয়া চাল, সবজি দিয়েই তাঁর চলে যেত। মংপা জাতির মানুষ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেওয়ার আগে চাঁদ সূর্যের পুজো করতেন। এঁরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন।

মনেস্ট্রির মাটির দেওয়ালে কাঁচা হলুদ দিয়ে সেদিন আমার ঠাকুরদা সূর্য আঁকছিলেন। লামার দিব্য ভাব এল। আমার ঠাকুরদাকে ডেকে বললেন, 'তোর ঘরে এক সিদ্ধ লামার জন্ম হবে। বংশে বুদ্ধের আশীর্বাদ আছে। ওকে নিতে লামার দল আসবে। দৈব নির্দেশে ওকে খুঁজে নিয়ে যাবে।' এই আদেশ শোনার পর সাংতি গ্রামে আমাদের মান-সম্মান বেড়ে গেল। সবাই আমাদের সমীহ করতে লাগল। তারপরই শুরু হ'ল ভারত-চীন যুদ্ধ।

সেবার বুমলা পাস হয়ে দলাই লামা পোর্টালা প্যালেস ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় তাঁর সাথে ওঁর এক সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর নাম লোবসাং সাংতেন। দলাই লামাকে ভারতে পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে যান পোর্টালা প্যালেসে, নিজের সাধকদের কাছে। বিপদগ্রস্ত তিব্বতীদের ছেড়ে, নিজের

দেশ ছেড়ে, নিজের উপাসনাস্থল ছেড়ে তিনি ভারতে থাকার কথা ভাবতে পারেননি। উনিশশোবাষট্টি সালের একুশে নভেম্বর দক্ষিণ তিব্বতের শিং জ্যাং অঞ্চলে লোবসাং সাংতেনকে হত্যা করা হয়। লোবসাং-এর মৃত্যুর পরে পোটালায় দৈব নির্দেশ হয় যে ভারতবর্ষেই লোবসাং-এর পুনর্জন্ম হবে, তিনি চতুর্দশ দলাই লামার কাছে ফিরে যাবেন। দলাই লামা নিজে তাঁকে ডেকে নেবেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজে। যেভাবে দলাই লামার নির্বাচন হয় সেভাবেই বৌদ্ধ লামারা লোবসাংকে নির্বাচন করে নিয়ে যাবেন। উনিশশোবাষট্টি সালের ডিসেম্বরে চীন ভারত আক্রমণ করল। চীনা সৈন্যরা বুমলা পাস দিয়ে ঢুকে, সেলা পাস পার করে ভারতীয় সৈন্য আর নিরীহ গ্রামের মানুষদের মারতে মারতে দিরাং-এ এসে পৌঁছায়।" সিয়াংচু একশ্বাসে বলে যাচ্ছিলেন ঘোরলাগা তান্ত্রিকের মতো। কিন্তু আমি এতক্ষণ মন দিয়ে শুনেও বুঝতে পারছিলাম না যে ভারত-চীনের বাষট্টির যুদ্ধের সাথে সিয়াংচুর ছেলের সম্পর্ক কোথায়! আমার চোখেমুখে সন্দেহের ছাপ দেখে সিয়াংচু মুচকি হেসে বললেন, "হাঁ ম্যাডামজী, আপ সোচ রহে হো কি ভারত-চীন ওয়ার কি সাথ মেরা কেয়া তালুক হ্যায়! হ্যায় ম্যাডামজী, হ্যায়! বহত গেহেরা তালুক হ্যায়! অওর থোড়া শুন লিজিয়ে, সব সমঝমে আ যায়েগা! তো কাহা থে হাম – চায়না আর্মি দিরাং হোকে সাংতি ভ্যালি চলা আয়া।" সিয়াংচু আবার সেই ঘোরলাগা তান্ত্রিকের মতো নীচু স্বরে গল্প বলতে থাকেন, "তখন সাংতি ভ্যালিতে অঘ্রাণের ধান কাটা চলছে। মংপা ছেলে-মেয়েরা পাহাড়ের ধাপে ধাপে নেমে ধান আর মকাই ফসল তুলছে। চীনা সৈন্যরা গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে হত্যাকান্ড শুরু করে দেয়। সৈন্যরা বলতে চাইছিল, হয়তো বলেছিল 'তোমরা ভারত ছেড়ে চীনের অধীনে চলে এসো।' কিন্তু মংপারা তাদের ভাষার কিছুই বুঝতে না পেরে কোনো উত্তরই দিতে পারেনি। সৈন্যরা উত্তর না পেয়ে তাদের জেদী এবং বিদ্রোহী ভেবে গুলি চালিয়ে দিয়েছিল। সাংতি ভ্যালির সবুজের মধ্যে ইতিউতি ছড়িয়ে থাকল রক্তেভেজা লাশ। সাংতির পুরনো মনেস্ট্রিতেও হামলা করল তারা, মনেস্ট্রির সেই হীনযানী লামাকে ওরা হত্যা করল, তাঁর মৃতদেহ পড়ে রইল মনেস্ট্রির মাটির বারান্দায়। মৃত্যুর আগে তিনি চীনা সেনাদের তাঁর মংপা ভাষায় বলে যান, 'ঈশ্বরের নিবাস পোটালা প্যালেসে। ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত নিবাসে একদিন ঠিক ফিরে যাবেন।'

এরপর বহু বছর পার হয়ে যায়। এই ইতিহাস কমবেশি গ্রামের সবাই জানে এবং সান্ধ্য-আড্ডায় গ্রামবাসীর মুখে মুখে ঘোরে। সেই দেবশিশুর জন্মের আশা সবাই প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল।"

সিয়াংচু খানিক দম নিয়ে আবার বলেন, "আমার তৃতীয় সন্তান রিংপোচে জন্মের প্রায় দুবছর পর থেকেই মছলি, আন্ডা, মাস কুছ নেহি খাতা। যখন গ্রামের চার পাঁচ সালকা বাচ্চা ময়দানে খেলে বেড়ায় তখন রিংপোচে সাংতি নদীর তীরে বসে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র বলে, জপের মালা নিয়ে চুপ করে বসে জপ করে, জামা-প্যান্ট পরতে চায় না, দাদুর খয়েরি একবস্ত্র পরে থাকে, কিছুতেই তাকে বশে আনা যায় না। নিজের সিদ্ধান্তে সে সম্পূর্ণ অনড়। প্রথম প্রথম আমাদের বেশ অবাক লাগত, অস্বস্তি হতো; কিন্তু ক্রমশ ওর এই আচরণ আমাদের সহ্য হয়ে যায়। রিংপোচের মা ওকে আরো বেশি করে আগলে রাখতেন। ধীরে ধীরে আমরা ছেলেকে গ্রামের মানুষদের থেকে আড়াল করতে শুরু করলাম। ওকে ঘর থেকে প্রায় বেরই করতাম না, কিন্তু এভাবে বেশিদিন আগলে রাখতে পারলাম না। রিংপোচে যখন পাঁচ বছরে পা দিল, তখন ওর মাথাভরা চুল, আপেলের মতো দুটো গাল আর মিষ্টি হাসির মায়ায় একদম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে আমাদের।

সে সময় একদিন গ্রামে এলেন উচ্চকোটির একদল লামা। তাঁরা আসেন চোলিং গ্রাম, ম্যাকলিওডগঞ্জ, ধর্মশালা, হিমাচল প্রদেশ থেকে। তাঁরা খোঁজ করেন এক দেবশিশুর, যে যাবে তাঁদের সাথে মহানির্বাণের পথে। এই প্রক্রিয়ার নাম তাঁদের ভাষায় গোল্ডেন অর্ণ। এই উচ্চকোটির লামা পর্ষদ তৈরি হয়েছে বহু নির্বাচনের মাধ্যমে। দৈব নির্দেশে তাঁরা জানতে পারেন কোথায় দেবশিশু এসেছে, ধ্যানের মাধ্যমে তাঁরা জেনে নেন সেই দেবশিশুর রূপ আর ঠিকানা।

তারপর এক অপরাহ্নে সংকেত দেখে দেখে ওঁরা এসে পৌঁছে যান সাংতি ভ্যালির মাটির ভংগ্নদশার সেই পুরনো মনেস্ট্রির সামনে। তারপর সেখানে দিন তিনেক সাধন-ভজন করে ওঁরা সোজা এসে পৌঁছে যান আমাদের বাড়িতে। ওঁদের হাতে ছিল লোবসাং সাংতেনের ব্যবহৃত এক সেট জিনিসপত্র, যা তাঁরা তিব্বত থেকে আনিয়েছিলেন। আর ছিল কিছু মেকি

সেট। এই সবের মধ্যে ছিল ঘড়ি, কাপ, প্লেট, ডিশ্, জপের মালা, জুতো, ছড়ি, জামা এবং ওরাকল। অরিজিনাল সেট ও আরো ক'টা মেকি সেট ওঁরা সাজিয়ে রাখলেন আমার ছেলে রিংপোচের সামনে। কী অদ্ভুত ম্যাডাম, আমরা আমাদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না! রিংপোচে বেছে বেছে ঠিক সেই ক'টা সামগ্রীই তুলল যেগুলো লোবসাং-এর আসল ব্যবহৃত জিনিস। আমার দুচোখে তখন অশ্রুধারা। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এও কি সম্ভব! কী বিস্ময়কর এই পৃথিবী! কী বিচিত্র এই ধর্মচর্চা! যতবার রিংপোচে লোবসাং-এর আসল ব্যবহৃত কাপ, প্লেট, ঘড়ি, মালা খুঁজে খুঁজে তুলছে ততবারই লামাদের মুখে এক অপার্থিব স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠছে। জীবন কী অদ্ভুত! পৃথিবীতে এমন কত কী ঘটে যা আমাদের যুক্তি তর্ক বিজ্ঞান দিয়ে মেলাতে পারি না, রিংপোচে কেমন অনায়াসে মিলেমিশে যাচ্ছে লামাদের সঙ্গে, যেন ওরা কতকালের পরিচিত! এক বৃদ্ধ লামার কোলে বসে সে মিটিমিটি হাসছে। সে প্রস্তুত লামাদের সঙ্গে বিদায় নিতে! মাতা পিতার প্রতি তার বিন্দুমাত্র মায়া নেই। জীবন! হা জীবন! কী বিচিত্র! লোবসাং-এর জামা, মালা, ঘড়ি পরে রিংপোচে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত! কিন্তু বাধ সাধল রিংপোচের মা, তিনি কিছুতেই তাঁর শিশুকে কোলছাড়া করতে চান না, মায়ের বাধার মুখে পড়ে লামারাও বেশ কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সে রাত্রে তাঁরা আশ্রয় নিলেন আমার ঘরে। সাংতি নদীতে সেদিন পূর্ণিমার আলো হীরের দ্যুতির মতো চিকচিক করছে। চিকচিক করছে মায়ের চোখের জলও। রিংপোচে বৃদ্ধ লামার কোলে পরম প্রশান্তিতে ঘুমোচ্ছে। সারা সাংতি ভ্যালি সেদিন চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। বুদ্ধের চোখের মতো ভ্যালি আজ স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত ও সুন্দর। গভীর রাতে দুই লামা নেমে এলেন ঘর থেকে, দীর্ঘ সময় তাঁরা চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে। সে এক অলৌকিক দৃশ্য। প্রকৃতির সাথে মানুষের কথোপকথন। সকালে লামার দল হাসিমুখে ঘর ছাড়তে তৈরি হলেন। জানিয়ে দিলেন বুদ্ধের নির্দেশে আরো তিন বছর রিংপোচে থাকবে মায়ের কাছে। তারপর একদিন গভীর রাতে ওই সাদা কন্থকে চড়ে যেভাবে বুদ্ধ বেরিয়েছিলেন মহানির্বাণে, পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ছেড়েছিলেন পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র – সেইভাবেই রিংপোচের যখন আট বছর বয়স হবে তখন পৃথিবীর কল্যাণের কাজে সে যাবে লামাদের সঙ্গে মহানির্বাণের পথে।" কথা বলতে বলতে সিয়াংচুর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। এবার তিনি চুপ করলেন।

আমিও নিশ্চুপ। সিয়াংচুর বৌ রান্নাঘরে ডিমের কারি বানাচ্ছেন। আমি সাংতি নদীর তীর থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

সমস্ত আকাশটা তারায় ভরা; আজও পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে সাংতি ভ্যালির পাহাড়, জনপদ। আমি রিংপোচের ঘরের দিকে এগোলাম। এমন দেবশিশুর দর্শন সবার ভাগ্যে ঘটে না। এই দেবশিশু পৃথিবীতে শান্তির বাণী ছড়াবে আজীবন। এটিই ওর জীবনের একমাত্র সত্য, একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকৃতি থেকে স্নিগ্ধ এক ধ্বনি শুনতে পেলাম। আকাশ, বাতাস, নদী, পাহাড় সবাই একসাথে যেন বলে উঠছে –

'হে শান্তির দূত, তোমায় প্রণাম।'

প্রণাম তোমায় শিশু বুদ্ধ!...

মননে আসাম

অমিত কুমার চক্রবর্তী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন – "ঈশ্বর নামক যে শক্তিটি লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে নিয়ত প্যাঁচ কষছেন, তাঁর অষ্টপ্রহর শুধুই একই চিন্তা, যেমন করেই হোক মানুষের যাত্রাপথ গুলিয়ে দিতে হবে | সতেরো থেকে সাতাশ গুলিয়ে দিতে পারলেই হ'ল, বাকি জীবনটা সে আর ভাঙ্গা মাজা সোজা করতে পারবে না | ভদ্রলোকের তাতেই বড় আনন্দ | কোটি কোটি মানুষ দিগভ্রান্ত হয়ে কষ্ট পাক, কষ্টে ছটফট করুক এবং শেষে ওই কষ্টের কারণেই যখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে তখন তিনি পতিতপাবন ইমেজটি তুলে ধরতে পারবেন| তাও ওই যে একটু আধটু সুখ ফিরিয়ে দেওয়া তা ইহজন্মে নয়, মৃত্যুর পরেও আর এক জন্মের কথা বলে তার জন্য ভুলিয়ে রাখা |"

ঈশ্বর, ভাগ্য, অদৃষ্টের পরিহাস এই কথাগুলো মানুষ প্রায়ই ব্যবহার করে| অনেকেই ভগবানে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অসুবিধায় পড়লে ভাগ্যের দোষ দেয় – বলে ওঠে, 'হায় কপাল' বা 'হায় ভগবান!' আসলে ভগবান আছেন, অথচ নেই – এই ভাবনার দোটানার মধ্য দিয়েই জীবন-সংসার প্রতিনিয়ত বয়ে চলছে | অজয় তার ৭০ ঊর্ধ্ব বয়সে পৌঁছে নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে যেন অনেকটা তেমনই উপলব্ধি করে|

সেই কবে সাত-আট বছর বয়সে বাবাকে হারায়; আর ঠিক তার এক বছর পর বিধাতার এক অমোঘ আদেশে ওদের আসামের বাসস্থান ছেড়ে রাতারাতি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হয়|

সালটা ১৯৬০, আসামে তখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি | অসমীয়া ও বাঙালিদের মধ্যে ভাষা নিয়ে জাতি-বিদ্বেষ দেখা দেয়, ছোটখাটো রেষারেষি প্রায়ই লেগে থাকত | কিন্তু সেবার বড় আকার ধারণ করে| বাঙালি ডাক্তার বা চা বাগানের বাঙালি ম্যানেজার ও কর্মচারীদের ওপর অসমীয়াদের ক্রোধ খুব বেশি ছিল | কারণ ডাক্তার এবং চা বাগানের অফিসারদের মধ্যে বাঙালিদের আধিপত্য ছিল| তাই সেবার তাদের ওপর অত্যাচার শুরু হয় | মারধোর থেকে অনেককে খুন পর্যন্ত করে তারা | গণ্ডগোল ক্রমশ বেড়ে যায় এবং চারিদিকের অনেক চা বাগানেই তা ছড়িয়ে পড়ে|

অজয়ের বড় জ্যাঠামশাই এমনই এক চা বাগানে কাজ করতেন টেকনিক্যাল এবং কোয়ালিটি ম্যানেজার হিসেবে|

একদিন চা বাগানের জনজাতি গোষ্ঠীর কর্মীরা (ওদের কুলি বলে ডাকা হয়) এসে খবর দেয় যে সেদিন রাত্রে বাঙালি বাবুদের মারার পরিকল্পনা চলছে| এই খবর পেয়ে অজয়ের জ্যাঠামশাই (উনি একাই বাগানে ছিলেন, পরিবারের বাকি সবাই তখন ডিব্রুগড়ে) এবং আর এক বাঙালি ভদ্রলোক বাগান ছাড়ার মনস্থ করেন| ওই ভদ্রলোকের সাথে ওঁর স্ত্রী এবং দুই শিশু ছিল| বিকেলের দিকে কুলিদের সাহায্যে ওঁরা চা বাগানের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েন | সাথে কিছু শুকনো খাবার নিয়েছিলেন | জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভিতরে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলেন তাঁরা| ওঁরা দুই রাত্রি ছিলেন জঙ্গলে| চা বাগানে চা গাছের জলের প্রয়োজনে কিছুটা দূরে দূরে অনেক নালা-নর্দমা কাটা থাকে | সেই নর্দমার জল তুলে রুমালে ছেঁকে শিশুদের খাইয়েছেন এবং নিজেরাও খেয়েছেন | তৃতীয় দিন জঙ্গলের অনেকটা দূরে অন্য এক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে ভোরবেলা ওঁরা তিনসুকিয়া যাওয়ার বাস ধরেন এবং সেখান থেকে ডিব্রুগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন|

ইতিমধ্যে ওঁদের বাগান ছেড়ে পালানোর খবর স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যায় | সেই পত্রিকার খবর পড়ে ডিব্রুগড়ের বাড়িতে সবাই খুবই চিন্তার মধ্যে ছিল| জ্যাঠামশাই বাড়ি ফেরায় সবাই চিন্তামুক্ত হয়|

তার কিছুদিন পর ১৫ই অগাস্টের রাত্রে ডিব্রুগড় শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়া এবং যেসব বাড়িতে খড়ের চালা ছিল সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় | পুলিশে খবর দিয়েও কিছু লাভ হয় না | সারারাত্রি হুলিগানদের দাপাদাপি চলে| সেদিন আর কারো রাত্রের খাবার

খাওয়ার অবস্থা ছিল না | অজয়রা ছোট-বড় মিলে প্রায় ১৭ জন মানুষ একটা ঘরে ভয়ে কুঁকড়ে রাত্রি কাটিয়েছে | মেজ জ্যাঠামশাই এক বিশাল রামদা নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন | যদি সত্যিই কেউ ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে তবে অন্তত কিছুটা সময় লড়াই করতে পারবেন এই আশায় | শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাড়ির ভিতরে কেউ ঢোকার সাহস করেনি | দাদা-দিদিদের পড়াতে এসে এক শিক্ষকমশাই সেদিন অজয়দের বাড়িতে আটকা পড়ে যান | উনি অসম সাহসী ছিলেন | গণ্ডগোলের এক ফাঁকে বেরিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন | যদিও সেই চেষ্টা বৃথা ছিল |

অজয়ের বাড়ির বয়স্করা গভীর চিন্তায় পড়ে যান | তাঁদের বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের অনেকেই শিশু ও বালক পর্যায়ের; তাই পরিস্থিতিটা সবাইকে ভাবিয়ে তোলে | অবশেষে স্থির হয় যে তাদের আসাম থেকে কলকাতায় চলে যাওয়াই সমুচিত হবে |

এর দু-এক দিনের মধ্যেই রাতারাতি পুরো পরিবার ডিব্রুগড় থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় | অজয় ও তার দাদা-বোনেরা মনে মনে কলকাতার কথা চিন্তা করে আনন্দ পাচ্ছিল; কারণ তারা কলকাতার ছেলেদের দুষ্টুমির নিদর্শন সিনেমায় দেখত | এবার ব্যাপারটার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যাবে |

ট্রেন ছাড়ার পর অজয় ভাবতে থাকে চেনা পরিবেশ ছেড়ে অচেনা কলকাতায় ওদের ভাগ্য আবার কোন পথে চালিত করবে তাদের!

তখন কলকাতায় যেতে হলে দুবার স্টিমারে নদী পেরোতে হতো | একবার গৌহাটি থেকে পান্ডু ব্রহ্মপুত্র পার হবার জন্য, আরও একবার কাটিহারের মনিহারি ঘাট থেকে বারাউনির সগ্রিকলি ঘাট, গঙ্গা পার হওয়ার জন্য | এখন দুই জায়গাতেই ব্রিজ হয়ে গেছে |

গৌহাটিতে পৌঁছে ওরা দেখেছিল অনেক বাঙালি পরিবার কলকাতায় যাওয়ার জন্য স্টিমারে উঠছে | স্টিমারে চড়ে অজয় আগের বছরের কথা মনে করতে থাকল | বাবার অসুখের জন্য সেবারও এইভাবে স্টিমারে এবং ট্রেনে কলকাতায় গিয়েছিল | বাবার মৃত্যুর পর আবার ওরা ডিব্রুগড়ে ফিরে এসেছিল |

এই ট্রেন ও স্টিমারে যাত্রাগুলো অজয়ের মনের ভিতরে ভ্রমণের আনন্দ জাগিয়ে তোলে এবং বলা যায় ভ্রমণের একটা শখ যেন সেই সময় থেকেই তার ভিতরে জন্ম নেয় |

স্টিমারে ও ট্রেনে যেতে যেতে অজয় যাত্রাপথের নানা দৃশ্য, যেমন আসামের চা বাগান, বিহার ও বাংলার ছোট ছোট টিলা, বিস্তৃত আমবাগান, বিস্তীর্ণ সবুজ ধানের ক্ষেত উপভোগ করেছে আর ডিব্রুগড় তথা আসামের দিনগুলোর কথা বার বার মনে করছিল |

ছোটবেলায় একান্নবর্তী পরিবারে অনেক দাদাদের সঙ্গে বড় হয়ে উঠছিল অজয় | পাড়ার ছোটদের সাথেও খেলাধুলা করে বেশ ছিল | ওদের বাড়ির বিপরীত দিকে গাঙ্গুলীদের বাড়ি | গাঙ্গুলীদের বড় ভাই আসাম ম্যাচ ফ্যাক্টরির চীফ ম্যানেজার ছিলেন | ওঁর বড় ছেলে, গৌতম অজয়ের সমবয়সী; তার এক ভাই ধ্রুব কিছুটা ছোট | ওদের সাথে এবং একটি অসমীয়া ছেলের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল অজয়ের | ওরা একসাথে খেলত | এছাড়া এক পাঞ্জাবি পরিবারের ছেলের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছিল | ওরা জালান নগর বলে একটা নতুন টাউনশিপে থাকত, যেটা অজয়দের পাড়ার খুব কাছে গড়ে উঠেছিল | ছেলেটির বাবা ওকে ক্রিকেট খেলার ব্যাট, বল, প্যাড কিনে দিয়েছিলেন | তাই ওর সাথে বন্ধুত্ব বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল | ডাকটিকিট জমানোর শখটাও ওর কাছ থেকেই পাওয়া | ডাকটিকিট জমানোর জন্য অজয় এবং ওর ওপরের দাদা (নতুনদা) মিলে একটা বই কিনেছিল | কিছু কিছু টিকিট ওরা দোকান থেকেও কিনেছিল | তবে বেশিরভাগ টিকিট চিঠির খামের থেকে সংগ্রহ করত | বইতে বিভিন্ন দেশের নাম লেখা আলাদা আলাদা পৃষ্ঠা ছিল | ডাকটিকিট সংগ্রহ হলে যখন সেই দেশের পৃষ্ঠায় লাগাত তখন ছবি ও দেশের নাম মিলিয়ে একটা বিশেষ অনুভূতি হতো | কারো কাছে একই রকম টিকিট দুটো থাকলে সে অন্য বন্ধুর সাথে পাল্টাপাল্টি করে নিত | সেই বই কলকাতায় আসার পর হাত বদল হতে হতে এক সময় হারিয়েই

যায় | অবশ্য চাকরির শেষদিকে এসে অজয় আবার কিছু ডাকটিকিট সংগ্রহ করেছিল; অল্প হলেও সেগুলো একটা ডায়েরিতে রাখা আছে|

বারাউনি থেকে ট্রেন ছাড়ার পর অজয় বাবার অসুখ, কলকাতা যাত্রা এবং মৃত্যুর কথা মনে করতে থাকল|

১৯৫৯ সালে পরিবারে হঠাৎ এক কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল| একদিন অজয় শুনল ওর বাবাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে চিকিৎসার জন্য | সাথে ওদের বড় দাদা থাকবে, বড়দা তখন এমবিবিএস পাশ করেছে | অজয়ের ঐ সময় ৬-৭ বছর বয়স | ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা তখন ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না | তার কিছুদিন পর মা, ছোট ভাই এবং দুই ছোট বোনসহ অজয়ও কলকাতায় রওয়ানা দেয়|

সেই প্রথম ওদের ট্রেনে চড়া | সেই প্রথম ওর ঘর ছেড়ে দূরে কোথাও যাওয়া | কলকাতায় সেবার ওরা দিদিমার বাড়িতে উঠেছিল | জ্ঞান হবার পর সেই প্রথম দিদিমা এবং মামা, মামী ও মাসিদের সাথে দেখা | কলকাতায় গিয়ে অবশ্য অজয়কে এক ভয়ঙ্কর কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় | মামাদের ও মায়ের সাথে অজয় প্রায়ই হাসপাতালে যেত বাবাকে দেখতে | বড়দা বাবার পাশে সব সময় থাকত | দেখত বাবা একটা বিছানায় শুয়ে আছে আর তার সামনে অনেকেই নিচুস্বরে কথাবার্তা বলছে | বাবা কয়েকবার তাকে কাছে ডেকেছিল | পরের দিকে আর ডাকত না | তখন ওর পিসিমাদের ওকে দেখে চোখে জল এসে যেত, আর ওকে জড়িয়ে ধরত | অজয় ধীরে ধীরে বুঝতে শিখল যে ও বাবাকে হারাতে চলেছে | তার কিছুদিন পরে বাবার শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে এল এবং শেষ পর্যন্ত বাবা না ফেরার দেশে চলে গেল| সেটা ছিল ১৯৫৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর, যেটা অজয় পরে বড়দার আত্মজীবনী 'Flight of Dreams' থেকে জানতে পারে | বাবার মৃত্যু অজয়ের মানসিক বয়স একলাফে অনেকটা বাড়িয়ে দেয় | বাবার কথা খুব কমই মনে পড়ে | কয়েকটা বিচ্ছিন্ন দিনের কথা ভেসে ওঠে মাত্র | বাবার একটা সাইকেলের দোকান ছিল| সেই দোকানের পাশে একটা ঘরে ভুবনকাকু থাকতেন, উনি বিভিন্ন আর্টের কাজ করতেন – পোস্টার, ব্যানার আঁকা ও লেখার কাজ | বাবার এক সর্দার বন্ধু ছিলেন; তাঁর জীপ নিয়ে তিনি প্রায়ই বাবার কাছে আসতেন| সেই জীপ গাড়িতে চড়ে একটু ঘুরে আসত অজয় ও তার ভাই-বোনেরা, সেটা খুবই আনন্দের ছিল|

বাবার মৃত্যুর পর ওরা আবার আসামে ফিরে আসে এবং আগের মতো স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা এবং খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে | কিন্তু সেও বেশিদিন স্থায়ী হ'ল না| আসামের দাঙ্গার জন্য পরের বছরেই ওদের আবার আসাম ছাড়তে হ'ল|

ট্রেনে যেতে যেতে বড় জ্যাঠামশাই যে বাগানে কাজ করতেন সেখানকার কিছু কিছু কথা মনে পড়ে যায় | একবার ছুটিতে সেই বাগানে গিয়েছিল | সেখানের কোয়ার্টারে অনেক ফলের গাছ ছিল – আনারস, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু | বাতাবি লেবুকে ওখানে বলা হয় জাম্বুরা| এত জাম্বুরা হতো যে অজয়রা প্রায়ই এই জাম্বুরাকে ফুটবল বানিয়ে খেলায় মেতে উঠত | ওরা একবার চা বাগানের ধার দিয়ে যে লম্বা খাল (দরং) চলে গিয়েছে, সেখানে দাদাদের সঙ্গে ডিঙি নৌকায় চড়েছিল | সে ছিল এক অনাবিল আনন্দ | পাড়ার স্পোর্টসে দাদারা অংশগ্রহণ করত | বিশেষ করে সেজদা; হাই জাম্প, লং জাম্প ও পোলভল্টে বেশ পারদর্শী ছিল| সেজদা ডিব্রুগড়ের ডিভিশন লীগের একটা ক্লাবে ফুটবল খেলত|

২০১৭-তে একবার নতুনদা, সেজদা আর অজয় মিলে ডিব্রুগড়ে গিয়েছিল | সেজদা পাড়ার এবং শহরের বড় মাঠগুলো ঘুরে দেখার জন্য এবং ওর পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত| অজয়ও সব ঘুরে ঘুরে দেখেছে, পাড়ার বন্ধুদের অনেকের সাথে দেখা হয়েছিল | তবে অনেকেরই শরীর তখন ভেঙে গেছে | ডিব্রুগড়ের চারিয়ালি মোড়ে, যেখানে বাবার দোকান ছিল, সেই অঞ্চলটা ঘুরে দেখেছে | দোকানটা এক বিহারী লোক (যাকে বাবা লীজ দিয়েছিল) করায়ত্ত করে নিয়েছিল | এছাড়া জ্যাঠামশাইয়ের সেই চা বাগানটাও দেখতে গিয়েছিল, যদিও বাগানের মালিকানা

পাল্টে গেছে | বাগান, মাঠ, পুরনো কোয়ার্টার, চাংঘর (চা শুকোবার ঘর) এবং আশপাশের অঞ্চলগুলো পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছে| তাও যেন দেখার শেষ নেই| মন না মানলেও পুরনো স্মৃতি পিছনে ফেলে ফিরতেই হয়|

কলকাতায় পৌঁছে অজয়রা স্টেশন থেকে বেরিয়ে অনেক ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা দেখতে পেয়েছিল| খুব সম্ভব সেটা শিয়ালদহ স্টেশন ছিল | সেইরকম কয়েকটা টাঙ্গা করে ওরা বালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় | বালিগঞ্জে বাবা, জ্যাঠাদের বৃহত্তর যৌথ পরিবারের মেজ ভাইয়ের বাড়িতে ওঠা হয়| দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পরিবারের একদল আসামে আর একদল কলকাতায় চলে এসেছিল | তবে পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ বজায় ছিল | বালিগঞ্জের জ্যাঠামশাই তখন জীবিত ছিলেন না, জ্যেঠিমা ছিলেন| ওঁদের আগেই খবর দেওয়া ছিল| বাড়িতে ঢোকার পর মা, জেঠিমারা মেজ জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘরে ঢুকতেই জ্যেঠিমা প্রথমেই বলে উঠলেন, "কী রে, নিরু আইলি নাকি?" নিরু অজয়ের বড় জ্যেঠিমা | বৃহত্তর পরিবারের জায়েদের মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা ছিল এটা তারই প্রমাণ| এই জ্যেঠিমার পাঁচ ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি মিলে যথেষ্ট বড় সংসার| অজয়রা আসাতে সবাইকে একটু কষ্ট করেই থাকতে হ'ল | দিন পনেরো বালিগঞ্জে থেকে দমদমের পাতিপুকুরে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যায় অজয়রা | অজয়দের ভাই বোনেদের সবাইকে কাছাকাছি একটা স্কুলে ভর্তি করা হ'ল| মনে পড়ে অজয় তখন ক্লাস ফোরের ছাত্র| সেই সময় ক্লাস ফোরে বৃত্তি পরীক্ষা হতো | সব ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছিল| তাই অজয়ের আর ফোরের পরীক্ষা দেওয়া হয়নি|

পরের বছর, ১৯৬১ সালে ওরা দমদমে বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে আসে | সেই সময়টা পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল | মেজ জ্যাঠামশাইয়ের ওপর সংসারের প্রায় পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে| আসামের গণ্ডগোল কমার পর উনি আবার সপরিবারে আসামে ফিরে যান| দুই মেয়েকে ডিব্রুগড়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে হস্টেলে রাখার ব্যবস্থা করেন| মেয়েরা পরে স্কুলের পড়া শেষ করে আবার কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছিল | ইতিমধ্যে আর্থিক দিকের কথা চিন্তা করে বড়দা উচ্চ শিক্ষায় না গিয়ে চাকরির চেষ্টা করে এবং পাঞ্জাবে সরকারী চাকরিতে যোগ দেয়; তাতে সংসারে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় | এর কিছুদিন পর বড়দার বিয়ে হয়| এই বড় বৌদির স্নেহ অজয়দের ভাইবোনেরা সবাই পেয়েছিল | দেওর-ননদের লেখাপড়ার দিকেও বৌদির খুব কড়া নজর ছিল|

বাঙ্গুরে আসার পর বড় জ্যাঠামশাই অজয় ও দুই দাদাকে দমদম ঋষি অরবিন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন | অরবিন্দ স্কুলে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করে দমদমের অন্য এক স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়| সেটাও বড় জ্যাঠামশাইয়ের ইচ্ছাতে, যাতে অজয় সায়েন্স নিয়ে পড়তে পারে|

এরপর অজয়দের পরিবার আবার এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় | বড় জ্যাঠামশাই গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হন | অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন| এই জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে অজয় লাহা মার্কেটে বাজার করা শিখেছিল | এছাড়া রেশন দোকানে গিয়ে চাল, গম, চিনি তোলার কাজটাও শিখেছিল|

কৃষ্ণ কুমার হিন্দু অ্যাকাডেমী (মতিঝিল) থেকে অজয় হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে | মতিঝিল স্কুলের স্মৃতিতে পড়াশুনার কথাই বেশি মনে পড়ে | এই স্কুলে এসে অজয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেত| সেখানে ওর সাথে রঞ্জন আর সুহৃদ নামে দুজন ছাত্রের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল| ওরা একসাথে হেঁটে বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াত করত | রঞ্জন অমরপল্লীতে আর সুহৃদ থাকত দমদম পার্কে | রঞ্জনের মা ওদের বিশেষ স্নেহ করতেন | অজয়ের ছাত্র জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময় কাটে এই বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে | অজয় আর নতুনদা ছিল কাছাকাছি বয়সের | আসাম থেকে আসার পর অজয় এবং নতুনদার বাঙ্গুরের অন্যান্য ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব হতে খুব বেশি সময় লাগেনি|

বাঙ্গুর তখন খুব সুন্দর একটা সাজানো গোছানো ছোট পাড়া। চারটে ব্লকে পরিকল্পনা করে প্লটগুলো তৈরি করা। কিছু কিছু প্লটে বাড়ি হলেও বেশিরভাগ খালি ছিল। তাই প্রায় প্রত্যেক পরিবারের ভাল মেলামেশা ছিল। আশপাশের খালি প্লটগুলোয় অজয়রা ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ইত্যাদি খেলত। আসাম থেকে এসে ওদের বাঙাল ভাষায় কথা বলার অভ্যাস পাল্টাতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। বন্ধুরা অজয় ও নতুনদার মুখে বাঙাল এবং কলকাতার মিশ্র ভাষা শুনে আনন্দ পেত। বাড়িতে অবশ্য ওরা বাঙাল ভাষাতেই কথা বলত।

দুর্গাপূজার সময় ওদের বাড়ির খুব কাছেই প্যান্ডেল হতো। সেই সময় পড়াশুনার চাপ কম থাকত, অজয় তাই প্যান্ডেলের নিচে কিছু বন্ধুর সাথে গুলি খেলায় মেতে থাকত। তাছাড়া প্যান্ডেলের বাঁশ বেয়ে কতটা ওপরে ওঠা যায় তার প্রতিযোগিতা হতো। আরো একটা নেশা ছিল জলকাদা ডিঙিয়ে ভেসে যাওয়া কাটা ঘুড়ি ধরা।

বাঙ্গুরে একটা সুন্দর পার্কে স্বচ্ছ জলের একটা পুকুর ছিল, তাতে বাঁধানো ঘাট; পার্কের চারপাশ সবুজে ঘেরা বড় বড় কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছ। এইসব গাছে চড়াও ছিল ওদের খেলার একটা অঙ্গ। পাতিপুকুরে থাকার সময় একটা পুকুরে অজয় দাদাদের সাথে জলে নেমে ভেসে থাকতে শিখেছিল। বাঙ্গুরের পুকুরে ভালভাবে সাঁতার শিখতে পারল। গরমের ছুটির সময় বন্ধুদের সাথে এই পুকুরের জলে ভেসে থাকতে কী ভালই যে লাগত!

হায়ার সেকেন্ডারির পর, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে খেলাধূলা বজায় রাখার ইচ্ছে ছিল অজয়ের। কিন্তু নানা অসুবিধার কথা ভেবে পিছিয়ে আসে। বাঙ্গুরের বাড়িতে থেকেই অজয়ের পাঁচ বছরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়াশুনা চলে। বাসে, ট্রেনে যাদবপুরে পৌঁছে, কলেজ সেরে আবার সেইভাবে বাড়ি ফিরে, আবার পড়তে বসা এই রুটিন পাঁচ বছর ধরে চলেছিল। কলেজে পড়ার সময় অজয় দু-একটা টিউশনি শুরু করে কিছু হাত খরচের উদ্দেশ্যে।

অজয়ের কলেজ জীবনের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময় গিয়েছে ১৯৭০-৭১ সালে। নকশাল আন্দোলনের ঢেউ সেই সময় যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতেও আছড়ে পড়ে। তখন ওদের থার্ড ইয়ার। প্রায়ই পরীক্ষার সময়সূচির পরিবর্তন হয়ে যেত। ক্যাম্পাসে যাদবপুরের ভাইস চ্যান্সেলরের খুন হওয়া এবং ওদের ক্লাসের এক ছাত্রের নাম জড়িয়ে পড়ায় ওদের সকলের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এতে অজয়দের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে। অজয়ের তখন একটাই লক্ষ্য ছিল, যে করেই হোক পাস করে একটা চাকরি জোগাড় করা। এতদিন জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে থেকে বড় হওয়া ওর মনকে বড় কষ্ট দিত। চাকরি করে এই যৌথ সংসারের কষ্ট কিছুটা কমাতে পারলে ওর মন শান্ত হবে এই ভাবনা ওকে পেয়ে বসে। তাই আর বেশি পড়াশুনা করার কথা ভাবতে পারেনি। কলেজের শেষ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ায় মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। এটা ওর কাছে এক বিরাট পাওয়া। এরপর অজয় মাস্টারস ডিগ্রিতে ভর্তি হয় যাতে stipend হিসেবে কিছু টাকা হাতে আসে। এই সময় সে চাকরির চেষ্টাও করে যায়। কর্নাটকে অল্প সময় একটা চাকরি করে পছন্দ না হওয়ায় ফিরে আসে। তার ঠিক পরে পাবলিক সেক্টর ফার্টিলাইজার কম্পানি থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পায় এবং ওকে আসামের নামরূপ ইউনিটে জয়েন করতে বলে। আসামের সাথে অদ্ভুত যোগাযোগের খাতিরে মাস্টার ডিগ্রীর পড়া ছেড়ে সেখানের চাকরিতে যোগ দেয় অজয়। সেখানে একটা ছোট চা বাগানের পাশে পাহাড়-নদী ঘেরা জায়গায় সরকারী চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য বন্ড জমা দিতে হয়, তার জন্য গ্যারান্টার দরকার পড়ে। মেজ জ্যাঠামশাই তখন ডিব্রুগড়ের কাছে বকুলবাগানে ম্যানেজার ছিলেন, তাই গ্যারান্টির কোনো অসুবিধা হয়নি। নামরূপ জায়গাটা ডিব্রুগড় থেকে গাড়িতে দু'ঘন্টার পথ। নামরূপে প্রায় ৬ মাস প্রাথমিক ট্রেনিং ছিল। সেই সময় সে অনেকবার বকুল বাগান, ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়ায় ঘুরে এসেছে। ডিব্রুগড়ে ওদের পুরনো পাড়ায় গিয়ে বন্ধুদের সাথে দেখা করত এবং ওদের ছেড়ে আসা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকত। পায়ে হেঁটে পুরো অঞ্চলটা ঘুরে ছেলেবেলার স্মৃতির সাথে মিলিয়ে দেখতে চাইত। ছোটবেলায়

সবকিছুই অনেক বড় বলে মনে হতো, বড় হয়ে সেসব যেন

অনেক ছোট হয়ে গেছে, রাস্তাঘাটের দূরত্ব অনেক কমে গেছে বলে মনে হয়।

৬ মাস নামরূপে কাটিয়ে সে দুর্গাপুরে আসে পরবর্তী ট্রেনিং-এর জন্য। নামরূপ এবং দুর্গাপুরে ওদের ট্রেনিং হস্টেলে থাকতে হতো। ট্রেনিং পিরিয়ডে যেহেতু কাজের দায়িত্ব কম তাই হস্টেলের জীবন খুবই উপভোগ্য ছিল। দুর্গাপুরে প্রায় দুবছর ট্রেনিং-এর পর অজয়কে হলদিয়ায় যেতে হয়। সেখানে তার জীবনের প্রায় ১৭টা বছর কাটে। হলদিয়ায় মা, বোনদের নিয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। সেখানেই অজয় এক বোনের বিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তার ২-৩ বছর পর সে নিজেও বিয়ে করে সংসার পাতে। মা, বোন ও স্ত্রীকে নিয়ে ভালই ছিল। সহকর্মীদের পরিবারসহ মেলামেশা থাকায় অবসর সময়গুলো বেশ আনন্দে কাটত। বিয়ের এক বছর পর তাদের এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়।

এখানে নতুন প্রজেক্টে কাজ শেখার অনেক সুযোগ পেয়েছিল অজয়। কাজকর্মও ভালই চলছিল। কিন্তু কিছু মেশিনের সমস্যার জন্য শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার আদেশ আসে। স্বাভাবিকভাবেই সকল কর্মচারীদের ভাগ্য বিরূপ হয়ে ওঠে। তারা সবাই অন্য চাকরির খোঁজে থাকে; অনেকেই ধীরে ধীরে হলদিয়া ছেড়ে চলে যায়। অজয়ও অন্য চাকরির সন্ধানে ছিল। এমনই একটা চাকরির জন্য মুম্বাই যাওয়ার টিকিট কাটতে একদিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে সে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। জানতে পারে যে ওর স্ত্রী ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বাড়ির খুব কাছেই কম্পানির হাসপাতাল; সে ছুটে যায় হাসপাতালে, সিস্টারদের জিজ্ঞেস করতে থাকে ওর স্ত্রী কেমন আছে। কেউ পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারে না। দেখতে পায় ওর স্ত্রী অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে আছে। সেদিন ডাক্তারদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারেনি আঘাত কতটা। অজয় তার শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠায়। ডাক্তাররা পরামর্শ করে কলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট আনার ব্যবস্থা করেন। স্পেশালিস্ট ডাক্তার পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু স্থানীয় ডাক্তাররা কোনো আশা দিতে পারেন না। আবারও ভাগ্যের পরিহাসে অজয়ের জীবনে এক অভাবনীয় ছন্দপতন ঘটে। দুর্ঘটনার ৫ দিন পর অজয়ের স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করে। যাওয়ার আগে একবার এক সিস্টারকে বলতে পেরেছিল ওর ছেলেকে যেন ওঁরা দেখে রাখেন। টাউনশিপের বন্ধুদের সহায়তায় স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে অজয় আবার আর এক পথচলা শুরু করে। তখন তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ওই ১৬ মাস বয়সের ছেলেকে বড় করা। কাজের জন্য অজয়কে প্রায়ই এদিক ওদিক যেতে হয়, ছেলে তখন মায়ের দায়িত্বে থাকে।

এর পর আবার পাঞ্জাবের নাঙ্গালে ডেপুটেশনে যেতে হয় অজয়কে। সেবার মা ও ছেলেকে সাথে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও প্রায় ৭-৮ মাস লাগে কাজ শেষ হতে। ছেলেকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল, দয়ানন্দ পাবলিক স্কুল। সেখানে তারা কম্পানির গেস্ট হাউসে থাকত। গেস্ট হাউসটা একটা উঁচু জায়গায় ছিল। চারদিকে অসংখ্য গাছপালা। পেছনদিকে একটা সুন্দর ফুলের বাগান। গেস্ট হাউসে ঢোকার রাস্তার দুধারে ছোট ছোট ফুলগাছ পরিবেশটাকে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যে ভরিয়ে রাখত। নাঙ্গালে অজয়ের সাথে হলদিয়ার আরো চারজন সহকর্মী ছিল। ওরা একসাথে কয়েকটা দর্শনীয় স্থান ঘুরে এসেছিল, যেমন পাহাড়ের উপর 'নয়না দেবীর মন্দির'। বাসে যাত্রাপথের দুপাশের এবং পাহাড়ের উপর থেকে চারপাশের দৃশ্য বিশেষ মনোরম। একবার ওরা 'ধর্মশালা' ঘুরে এসেছে। পথে 'জ্বালামুখী' এক বিশেষ দর্শনীয় এবং পুণ্যস্থান (সতীপীঠ)। ধর্মশালার পাহাড়ি সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। নাঙ্গালের কাজ শেষে ওরা আবার হলদিয়ায় ফিরে আসে। এইভাবে প্রায় দেড় বছর কেটে যায়। অজয়ের চাকরি জীবনের অনিশ্চয়তা তখনও কাটেনি। স্ত্রী বিয়োগের পর দেখতে দেখতে পাঁচ বছর পেরিয়ে যায়। বাড়ির সকলের অনুরোধে সে আবার এক নতুন জীবন শুরু করে। এরপর হলদিয়া ছেড়ে, দিল্লি ঘুরে, চাকরির শেষ সাত বছর আবার নামরূপে কাটাতে হয়।

এরই মাঝে আসামের সুখ-দুঃখের স্মৃতি ভেসে আসে প্রায়শই। অজয়ের সন্তান এখন সাব্যস্ত। সেও তার নিজের সংসার পেতেছে। অজয় এখন ছেলের সুখী সংসার দেখে শান্তিতে জীবন যাপন করে।

{সত্য ঘটনা}

[এই রচনার ছবিগুলি লেখকের ক্যামেরায় নেওয়া হয়েছে।]

উড়ান

সুজয় দত্ত

টার্মিনালের এদিকটা এতক্ষণ বেশ নিরিবিলি ছিল | ডিপার্চার গেটগুলো ফাঁকা, সামনে পাতা সারি সারি চেয়ারেও অল্প দু-চারজন, আশপাশের খাবারের দোকান আর স্যুভেনির শপে সকালের সেই লম্বা লাইন আর ভীড়ভাট্টা অদৃশ্য | কিন্তু আর বেশীক্ষণ নয় | একটু পরেই শুরু হবে দুপুরের ব্যস্ততা | পাশাপাশি অনেকগুলো গেটে এসে দাঁড়াবে একের পর এক বিমান – দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রী নিয়ে | আর তারই প্রস্তুতিতে টার্মিনালের বিমানকর্মীদের মধ্যে দেখা যাবে তৎপরতা, ঘন ঘন নির্দেশ আসবে ওয়াকিটকিতে, মানুষের পদশব্দে আর ক্যারিঅন লাগেজের চাকার শব্দে জমজমাট হয়ে উঠবে চারিদিক | ডাক পড়বে লায়লারও | অমুক গেটে তমুক জায়গা থেকে আসা ফ্লাইটে একটা হুইলচেয়ার লাগবে সাড়ে বারোটায়, তারপরেই উল্টোদিকের গেটে অপেক্ষমান প্লেনটায় যাত্রী ওঠার ঠিক আগে আরও একটা, সেটা মিটতে না মিটতেই হয়তো ছুটতে হবে একটু দূরে অন্য কোনো গেটে | বেশ অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে না | প্রথম প্রথম একটু দিশাহারা লাগত এরকম চাপের মুখে, কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে লায়লা | দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেল এই কাজে | চলৎশক্তিহীন বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী যাত্রীদের হুইলচেয়ার পরিষেবা দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের পরিতৃপ্তি আছে | ভালই লাগে ওর | দিনে অন্ততঃ কয়েকটা মুহূর্ত নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় – যেন ওকে ছাড়া চলবে না কিছু অসহায় মানুষের | সেটাই বা কম কী?

গুরুত্ব জিনিসটার স্বাদই তো পেল না তার এই একুশ বছরের জীবনে লায়লা হুসেইনি | এমন দেশে জন্মেছে, যেখানকার সমাজে নারীর মূল্য আর অধিকার খুঁজতে যাওয়া এমনিতেই মরুভূমিতে জল খোঁজার মতো | তার ওপর আবার ওরা সংখ্যালঘু হাজারা – ওদের আদি বাড়ী মধ্য-আফগানিস্তানের বামিয়ানে; ছিল | এখন আর নেই | দেশের কট্টরপন্থী জঙ্গীদের রোষে অসংখ্য হাজারাকে সর্বস্ব হারিয়ে স্বদেশেই উদ্বাস্তু হতে হয়েছে | একবার নয়, বারবার | দেশের অতীত ইতিহাস যেমন তার সাক্ষী, তেমনি সাম্প্রতিক বর্তমানও | আজ থেকে প্রায় বছর পঁচিশেক আগে তালিবানরা যখন তাদের ক্ষমতা দখলের প্রাক্কালে বল্খ প্রদেশের বিখ্যাত শহর মাজার-এ-শরীফ জিতে নিল, তখন লাগোয়া হাজারিজৎ বা হাজারিস্তানের নিরীহ মানুষও রেহাই পায়নি | ভিটেমাটি-ছাড়া হয়ে একবস্ত্রে চলে আসতে হয়েছিল লায়লার ঠাকুরদাকে তাঁর পুরো পরিবার নিয়ে কাবুলের শহরতলীতে | রুটিরুজির জন্য | লায়লার জন্ম সেখানেই | ওর দুই বোন নাজিয়া আর ফেরেবাও তাই | জ্যাঠতুতো দাদা খালেদের জন্ম অবশ্য হেরাটে – সেখান থেকে উৎখাত হয়ে তাদের পরিবার অচিরেই এসে জুটেছিল ওদের সঙ্গে | ওর বাবা-জ্যাঠার তখন জোয়ান বয়স, দিনরাত গতরে খেটে অমানুষিক পরিশ্রম করে পরিবারটাকে দাঁড় করাল কোনোরকমে | যাহোক একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটল, দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার সংস্থান হ'ল | ব্যস, ঐটুকুই | এর বেশী আবার কী থাকবে একদল অবাঞ্ছিত উদ্বাস্তুর?

কিন্তু না – ছিল আরও কিছু লুকনো সম্পদ | লায়লার মা জাহরার বুকের মধ্যে | সযত্নলালিত সামান্য কিছু আশা-স্বপ্ন তার তিন মেয়েকে নিয়ে | লেখাপড়া শিখবে তারা, স্বনির্ভর হবে একদিন, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে | কিন্তু হায়, এ পোড়া দেশের অতি-রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় নারী শিক্ষার অধিকার তো কারাগারে বন্দী আসামীদের মুক্ত বায়ু সেবনের অধিকারের মতো | প্রশ্নই ওঠে না | তবে ইচ্ছে আর সংকল্পটা যদি পবিত্র আর আন্তরিক হয়, আল্লাহতালা একটা না একটা রাস্তা ঠিকই খুলে দেন | এক্ষেত্রেও তাই হ'ল | আমেরিকার মদতপুষ্ট সরকারের তত্ত্বাবধানে আর আমেরিকার টাকায় সারা দেশে যে মেয়েদের স্কুলগুলো খোলা হয়েছিল তালিবানদের ক্ষমতাচ্যুতির পর, তারই একটায় ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেল লায়লা – হাজারা হওয়া সত্ত্বেও | তার জন্য অবশ্য ওর বাবাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি, কম তদ্বির করতে হয়নি | বিবি জাহরার মুখ চেয়ে আর মেয়েটার অদম্য উৎসাহকে নস্যাৎ করে দেওয়ার মতো কঠিন হৃদয় হতে না পেরে হামিদ হাল ছেড়ে দেয়নি | তারপর দিদির দেখাদেখি দুই বোনও ভর্তি হ'ল স্কুলে | অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাসের পাশাপাশি চলল ইংরেজি শেখা | সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা একটা বিদেশী ভাষাকে আত্মস্থ করা চাট্টিখানি কথা নয়, তবে এই কঠিন চ্যালেঞ্জটার মধ্যে এক ধরনের মজাও আছে, আর আছে তাৎক্ষণিক উপযোগিতা | এই

যেমন, জ্যাঠতুতো দাদা খালেদ স্কুলের গন্ডি পেরোতে না পেরোতেই সেখান থেকে শেখা চলনসই ইংরেজির দৌলতে কাছাকাছি একটা আমেরিকান সেনা ছাউনিতে দোভাষীর কাজ পেল। সদ্য বয়ঃসন্ধিতে আসা লায়লা অবশ্য দোভাষী-টোভাষী হতে চায় না। তার মনে তখন উঁকি দিচ্ছে জীবনে আরও অনেক বড় কিছু করার বাসনা। ডাক্তার হওয়ার।

স্বপ্নভঙ্গ হতে অবশ্য খুব বেশী সময় লাগেনি। দীর্ঘ দু'দশক ধরে যুদ্ধ আর আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের ব্যর্থ চেষ্টার পর হঠাৎ কয়েক বছর আগে আমেরিকা যেই সিদ্ধান্ত নিল পাততাড়ি গুটোনোর, ঝপ করে আচমকা অন্ধকার নেমে এল লায়লাদের জীবনে। শুধু ওদের তিন বোনের লেখাপড়া শেখায় ইতি তো নয়, আরও বিরাট খাঁড়া ঝুলছে মাথার ওপর। ক্ষমতায় ফিরে তালিবানরা বেছে বেছে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেই তাদের ওপর যারা আমেরিকান বাহিনীর হয়ে কাজ করত। খালেদ বাঁচবে না, ওরাও সম্ভবতঃ না। এই পরিস্থিতিতে একটাই রাস্তা – খালেদের দোভাষী সার্ভিসের প্রতিদানে আমেরিকানদের কাছে ওদেশে শরণার্থী হয়ে যাওয়ার অনুমতি ভিক্ষা। সে পাওয়া কি অতই সোজা? প্রাণভয়ে ভীত হাজার হাজার আফগান যে তাদের বিপন্ন হাত বাড়িয়ে রয়েছে ওই একই আর্তি নিয়ে। আর আমেরিকা মোটেই উদারহস্ত নয় এ-ব্যাপারে।

শেষ অবধি ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল ওদের। আমেরিকার এক উদ্ধারকারী প্লেনের এককোণে জায়গা হয়েছিল ওদের পরিবারের। না, ভুল হ'ল – পুরো পরিবারের তো নয়। তালিবানদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আইসিস কাবুলের বাগরাম এয়ার বেসের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তেরোজন আমেরিকান সৈনিকের সঙ্গে যে বিপুলসংখ্যক নিরীহ আফগানকেও মারল, তার মধ্যে ছিল লায়লার জ্যাঠা আর জ্যাঠতুতো দাদা খালেদ। সেই ছিন্নভিন্ন রক্তস্নাত দেহদুটো আজও তার দুঃস্বপ্নে ফিরে ফিরে আসে, ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয় ওকে। কিছু মানুষের জীবনে এমন কোনো কোনো মুহূর্ত আসে যখন মনটা পাথরের মতো নীরব, নিথর, অনুভূতিহীন হয়ে যায় – চোখ ভুলে যায় অশ্রু ঝরাতে। ওটা ছিল সেইরকম একটা মুহূর্ত। সবাই বুঝবে না।

যাইহোক, শেষ অবধি ওদের প্লেন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠেছিল। জীবনের প্রথম উড়ান লায়লার। চোখেমুখে অপার বিস্ময়, মনে একরাশ আশংকা আর অনিশ্চয়তা, বুকের ভেতর গুমরেওঠা কান্না – পিছনে ফেলে আসা জন্মভূমির জন্য। আর কোনোদিন ফেরা হবে কি? কে জানে?

তারপর নতুন দেশে এসে অনেক নিয়মকানুনের বেড়াজাল পেরিয়ে শেষে মিশিগান রাজ্যের ডিয়ারবর্ণ শহরে এক ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ওঠা, কাছেই শরণার্থীদের জন্য তৈরী বিশেষ স্কুলে নাজিয়া আর ফেরেবার ভর্তি হওয়া, এবং বহুকষ্টে দুটো ওয়ার্ক পারমিট জুটিয়ে নিয়ে হামিদ আর লায়লার জীবিকার সন্ধান। সেই সূত্রেই ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে এই বিমানকর্মীর চাকরি।

হঠাৎ কাছের রানওয়েটা থেকে একটা বিশাল বোয়িং ৭৭৭ ভীষণ গর্জনে মাটি ছেড়ে ওঠার শব্দে চমক ভাঙে লায়লার – এক ঝটকায় স্মৃতি থেকে বাস্তবে ফেরে। কিন্তু মাটির সঙ্গে কোণাকুণিভাবে ক্রমশঃ আকাশের দিকে উঠতে থাকা প্লেনটার দিকে তাকিয়েই আবার মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর, অবর্ণনীয় দৃশ্যের কথা – দেশ ছেড়ে চলে আসার দিন বাগরাম এয়ার বেসে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার মানুষের সঙ্গে ওকেও যা দেখতে হয়েছিল। তালিবানের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাওয়া বেশ কিছু আফগানকে পেটের ভেতর নিয়ে আমেরিকান বিমান

বাহিনীর একটা বিশাল প্লেন রানওয়ের দিকে রওনা দিয়েছে ওড়ার প্রস্তুতিতে। নিরাপত্তা রক্ষীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে তার পিছনে পিছনে ছুটছে আরও অসংখ্য আফগান – যেন বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটাকে কিছুতেই ফস্কে যেতে দেবে না। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একজন প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে চলন্ত প্লেনের চাকার কাছটা দুহাতে আঁকড়ে ধরল। খুব চেনাচেনা লাগছে ছেলেটাকে – কী যেন নাম? কী যেন নাম? মনে

পড়েছে! জাকি আনওয়ারি | খালেদ ভাইয়ের ছোটবেলার বন্ধু | একী, প্লেনটা যে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে – জাকিভাই এখনো চাকা থেকে ঝুলছে? খানিকটা ওঠার পর প্লেন তার চাকা গুটিয়ে নিল | আর জাকি ভাই? ওই যে দ্যাখো – কেমন আকাশ থেকে মাটির দিকে নেমে আসছে ওর শরীরটা | তীব্রবেগে আছড়ে পড়ল টারম্যাকে | জীবনে অনেক উঁচুতে ওঠার স্বপ্ন দেখত তো – সে সাধ ওর অপূর্ণ রইল না | খুব ভাল ফুটবল খেলে ছেলেটা, খুব ভাল | না না, ভুল হ'ল | খেলে না | খেলত |

"হেই লেইলা," হঠাৎ কাঁধে মৃদু টোকা | চমকে তাকায় ও | ভেরোনিকা ডাকছে | ভেরোনিকা লোপেজ – এই টার্মিনালে ওর সহকর্মী | মেক্সিকান, কথায় তাই স্প্যানিশ টান – "ইউ আর নীডেড অ্যাট গেট টোয়েন্টিসেভেন |" সাতাশ নম্বর গেটে প্যারিসের ফ্লাইটে বোর্ডিং হবে এবার | তাই ডাক পড়েছে লায়লার | অনেকগুলো হুইলচেয়ার দরকার | সেখানকার প্যারা-অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে যাচ্ছে একদল প্রতিবন্ধী অ্যাথলিট | সোনা জেতার লক্ষ্য নিয়ে উড়ে যাবে ওরা | স্বপ্নের হাতছানিতে |

ফেলিদিদি

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

যখন থেকে ছোটবেলার স্মৃতি শুরু হয়েছে, সেই দিনগুলোতে ফিরে গেলে বাড়ীর যে ক'জনের কথা মনে পড়ে তাঁরা হলেন বাবা, মা, বড়ঠাকুমা, ছোটঠাকুমা ও ফেলিদিদি | ছোটঠাকুমা হলেন আমার বাবার মাসীমা | ফেলিদিদি আমাদের বাড়ীতে রাত-দিনের কাজ করত বটে, কিন্তু আমার স্মৃতিতে সে ছিল আমাদের পরিবারেরই একজন | আমাদের বাড়ীতেই থাকত | ফেলিদিদির আপনজন বলতে ছিল তার দাদা, যাকে আমরা 'কিষ্টদাদু' বলতাম আর তার পরিবার | ফেলিদিদিকে বড়ঠাকুমা, ছোটঠাকুমা 'ফেলি' বলে ডাকতেন, বাবা-মা বলতেন 'ফেলিমাসী', আর সম্পর্কে আমাদের ঠাকুমাতুল্য হলেও আমরা ভাই-বোনেরা তাকে 'ফেলিদিদি' বলেই ডাকতাম |

ছোটবেলায় পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে ফেলিদিদির একটা পা পঙ্গু হয়ে যায়, সেজন্য একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত | ফেলিদিদি খুব মুখরা ছিল ও প্রয়োজনে গালিগালাজও করত | সেই কারণে অনেকেই তাকে একটু সমীহ করে চলত |

ছোটবেলায় আমি এমন বদমাইশ ছিলাম যে সহজ বাংলায় 'বাঁদর' বললে কিছুটা সঠিক সম্বোধন করা হবে | বাবা স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন | সোমবার সাইকেলে করে স্কুলে যেতেন, সারা সপ্তাহ স্কুলের হস্টেলে থাকতেন আর শনিবার বাড়ী ফিরে আসতেন | আমার বদমায়েশির নালিশ করার ব্যাপারে আমার মায়ের টাইমিং সচিন তেন্ডুলকারের স্ট্রেট ড্রাইভকেও হার মানাত! বাবা শনিবার প্রায় দেড়-দু'ঘন্টা সাইকেলে করে ঘর্মাক্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় যেই না বাড়ীতে এসে সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করাতেন – শুরু হয়ে যেত মা'র নালিশ | আর বাবা হাতের কাছে যা পেতেন – লাঠি, চেলাকাঠ, কিছু না পেলে হাতের পাঁচ আঙ্গুল, তাই দিয়ে শুরু হতো মার! কারো ক্ষমতা ছিল না বাবাকে থামানোর | ব্যতিক্রম ছিল ফেলিদিদি | আমার কান্নার আওয়াজ তার কানে পৌঁছানোমাত্রই যেখানেই থাকুক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যতটা তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব চলে আসত | "ওরে আমার ছেলেকে মেরে দিল রে |" বলে কাঁদতে কাঁদতে বাবার হাত থেকে হাতিয়ার সরিয়ে নিত | কখনো-সখনো ফেলিদিদির গায়েও আমার মারের নমুনা গিয়ে

পড়ত | "একরত্তি ছেলেকে এমন মারে!" বলত, আর প্রায়শই আমার কান্নার সঙ্গী হতো!

বাড়ীর বাইরে থেকেও মা-ঠাকুমাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ আসার বিরাম থাকত না | বাড়িতে এসে কেউ নালিশ করলেই আমার ছোটঠাকুমার এক উত্তর ছিল; বলতেন, "তোমরা সেখানেই কেন দু-চার ঘা বসিয়ে দিলে না, আমাদের বলতে এসেছ এখন?" সেখানেও ব্যতিক্রম সেই ফেলিদিদি | নালিশকারীকে গালি-গালাজ করে, "দূর হ" বলে বলে তাড়া করত |

একবার খেলতে গিয়ে আমার এক বন্ধু দিল আমার মাথা ফাটিয়ে! বাড়ীতে এসে হুলুস্থূল কাণ্ড, রক্তাক্ত মাথা আর তার ওপর চলছে মা এবং ছোটঠাকুমার শাসন ও বকাঝকা | ফেলিদিদি চলল তার সেই মধুর বাক্যবাণ নিয়ে আমার আক্রমণকারীর খোঁজে | তাকে খুঁজে, তার বাড়ী গিয়ে, গাল পাড়তে পাড়তে সমস্ত দোষ তার ওপর চাপিয়ে তবে শান্তমনে বাড়ী ঢুকল!

তারপর যখন আমরা একটু বড় হয়ে স্কুলের গণ্ডি পার করে কলেজে ভর্তি হব হব করছি, তখন স্বভাবতই ফেলিদিদি বয়সের ভারে বুড়ি হয়ে গিয়েছে | তার কর্মক্ষমতা প্রায় লোপ পেয়েছে | তখন তার নিজেরই দেখাশুনো করার ক্ষমতা নেই | সে তখন তার দাদার বাড়ীতে ফিরে গেল | মনে পড়ে, ফেলিদিদির দুবেলার খাবার, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্তর সব বাড়ী থেকে মা-ঠাকুমারা পাঠিয়েছেন | আমরা যখন হস্টেল থেকে বাড়ী আসতাম, বিকেলে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতে যাবার খুব নেশা ছিল | খেলতে যাবার ঠিক আগেও যদি মা-ঠাকুমা বলতেন ফেলিদিদির খাবার পৌঁছে দিতে, কোনোদিন সেই কাজে বিমুখ হইনি | একবার হ'ল কি – তখন ফেলিদিদির দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, কোথাও যেতে গেলে পেছন ঘষে ঘষে, হাতের ওপর ভর দিয়ে কোনোরকমে স্থান পরিবর্তন করত | আমি দেখা করতে যেতে আমায় বলল, "আমাকে একবার বাখুলে (বাড়ী) নিয়ে চ'না বাবা!" আমি তখন খেলতে যাবার তাড়ায় কোনক্রমে পালাতে পারলে বাঁচি | কিন্তু ফেলিদিদির সেই আকুতি মিনতি শুনে ফিরে গেলাম | একটা চটের থলে জোগাড় করে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে গেলাম ফেলিদিদিকে বাড়ীতে আনতে | বাড়ীতে এসে তার সে কী আনন্দ! আনন্দে চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে!

যতদিন ফেলিদিদি বেঁচে ছিল, মনে পড়ে সব সময় হস্টেল থেকে বাড়ী ফিরে ফেলিদিদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসতাম | তারপর কখন একদিন ফেলিদিদি এই জগতের সমস্ত মায়া কাটিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দিল!

ফেলিদিদির অপত্য স্নেহ-ভালবাসা আজও হৃদয়ের গভীরে সেই একইভাবে অনুভব করি! সত্যিই কি সেই অনুভূতি আর ফেলিদিদির মতো দরদী মানুষকে ভুলে যাওয়া সম্ভব!...

চিলেকোঠার আয়না

সফিক আহমেদ

চুঁচড়োর মগরায় আমাদের বাড়িতে একটা চিলেকোঠা ছিল। যত সব পুরনো আসবাবপত্র ডাঁই করে রাখা থাকত সেই চিলেকোঠাতে। আর তার মধ্যে মেহগনি কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত একটা আয়না ছিল। পারদ উঠে যাওয়া কালের ক্ষতচিহ্ন ছিল এই আয়নার জায়গায় জায়গায়। আমাদের মতো একটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে এমন একটা বনেদি আসবাব কী করে যে এল সে নিয়ে অনেক মতামত আছে মা-কাকিমাদের মধ্যে। কেউ বলে ঠাকুমাকে ভালবেসে ঠাকুরদা নাকি কোনো রদ্দি নিলাম থেকে কিনে এনেছিল আয়নাটা। আবার কেউ বলে ঠাকুমার বাপেরবাড়ি থেকে যৌতুকে এসেছিল।

সে যাই হোক, বাড়ি যখন বাবা কাকাদের মধ্যে ভাগ হয়, কোনো ঘরই এত বড় ছিল না যে ওই দেয়ালজোড়া আয়না লাগানো যায়; তাই সেই আয়নার গতি হয়েছিল চিলেকোঠায়। আর সবার ঘরে ঘরে গলা মুখ দেখার মতো আয়না লাগিয়ে কাজ চালাত মা-কাকিমারা।

মা-কাকিমাদের ভাগের সংসারে যতই অশান্তি থাক, দৈনন্দিন কাজের শেষে দুপুরের শেষ রোদ্দুরে দুই কাকিমা আর মা আমাদের লম্বা বারান্দাতে রোদে পিঠ দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসত গল্প করতে; আর তাদের পিঠে বাহারি রেলিংয়ের ছায়াগুলো অদ্ভুত নকশা তৈরী করত। মায়েদের সাথে যোগ দিত কমলিমাসি। কমলিমাসি এ বাড়ির পুরনো কাজের লোক; সে মা-কাকিমাদের বিয়ের বহু আগে থেকেই আছে এ বাড়িতে। তাই কাজের মাসি হলেও মা-কাকিমাদের উপর মাঝে মাঝে বেশ কর্তৃত্বও ফলাত। দুপুরের এই রসালো গল্পগুজবে সবথেকে উৎসাহী অংশগ্রহণকারী ছিল কমলিমাসি। আমাদের বাড়ির পুরনো ইতিহাস থেকে শুরু করে পাড়ার যত ফস্টিনস্টির খবর, সবই তার নখদর্পণে।

আমাদের প্রভাবতী গার্লস হাইস্কুলে গরমের ছুটিতে হোমওয়ার্ক দিত রোজ এক পাতা করে হাতের লেখা আর দশটা করে অঙ্ক করা। আমি দুপুরে বারান্দায় বসে হোমওয়ার্ক করার অছিলায় কান খাড়া করে শুনতাম দুপুরের এই আসরের বিভিন্ন গল্প। কমলিমাসির একটা কথা প্রায়ই কানে আসত, "তোমরা বাবা বৌ-মেয়েরা চিলেকোঠার আয়না ঘরে যেও না। ওই আয়না পুরনো ঘটনা দেখায় আবার ভবিষ্যৎও দেখায়। ও আয়না তোমার প্রতিচ্ছবি নয় তোমার মনের ছবি দেখায়।"

মা-কাকিমারা চেপে ধরে কমলিমাসিকে, "মাসি তুমি গুল না মেরে বলো তো কী আছে ওই আয়নায়, যে তুমি সবসময় আমাদের ভয় দেখাও; আজ না শুনে তোমাকে ছাড়ছি না।"

- "সে আমি বলতে পারব না; তবে যদি পাঁচ কান না করো, আর দাদাবাবুদের না জানাও তবে বলতে পারি।"

মা-কাকিমারা সমস্বরে বলে উঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কাক পক্ষীও জানতে পারবে না মাসি।"

এদিক ওদিক তাকিয়ে মাসি শুরু করে, "তোমরা তো কেউ দেখোনি সুরমাকে। সুরমা দাদাবাবুদের সব থেকে বড় বোন। তোমরা বিয়ে হয়ে এবাড়িতে আসার আগেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল তাকে। সুরমা ছিল অসামান্য সুন্দরী। ছোট থেকেই তার ছিল নাচ শেখার সখ। ওদের বাবাও ছিলেন সৌখিন মানুষ। তখন ওই বড় ঘর, যেটা এখন ভাগ করে দুটো ঘর বানিয়ে বড়দাদাবাবু আর মেজদাদাবাবু থাকে, সেখানে প্রায়ই বসত নাচগানের আসর। ওই ঘরের দেয়ালজুড়ে টাঙানো ছিল সেই আয়না। নাচগানের আসর ভেঙে সবাই চলে যাওয়ার পরেও অনেক রাত পর্যন্ত প্রায় অন্ধকার ঘরে বড়বাবু পাত্তর হাতে নিয়ে বসে থাকতেন, মৌতাত নিয়ে ওই আয়নার দিকে তাকিয়ে। বড়মা তাড়া দিতে এলে জড়ানো গলায় বলতেন, 'কেন বিরক্ত করছ? দেখো, আয়নাতে এখনো ঝাড়বাতি নেভেনি, তিন তালে এখনো ঝড় তুলছে নূপুর, আতরের গন্ধ এখনো ভাসছে বাতাসে, আমি ফিরে যাচ্ছি ছোটবেলায় যখন আমার বাবা নাচঘরে বসে থাকতেন, আর আমি উঁকি দিয়ে দেখতাম। এই আয়না সব মনে রাখে। আমাকে এখন থাকতে দাও স্মৃতির আসরে।' তারপর মৌতাত কাটলে প্রায় ভোরের আলো ফোটার সময় ফিরে যেতেন বিছানায়।

দিনেরবেলা বড়বাবু কর্মব্যস্ত এক অন্য মানুষ। খুব ভালবাসতেন বড় মেয়ে সুরমাকে। ভাল পড়াশোনা করানোর সাথে সাথে বেনারস থেকে এক গুরুজীকে আনিয়ে তালিম দিয়েছিলেন তাকে নাচে পারদর্শী করতে। বিকেল থেকে সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত সেই নাচঘরে চলত তালিম। এক সদ্য যুবা তবলিয়াও আসত সঙ্গত করতে। সুরমাও অসম্ভব ভালবাসত

নাচতে | তার তখন উঠতি বয়স | সদ্য যৌবনের চিহ্ন ফুটে উঠছে দেহে | নাচের তালে তালে মোহময়ী মুদ্রাতে মাতিয়ে দিত শেষ বিকেলের আসর | গুরুজীর বয়স হয়েছিল তাই কখনো কিছুটা তালিম দিয়ে বেরিয়ে যেতেন, আর বলে যেতেন তবলার সাথে অভ্যাস করতে নতুন শেখানো তাল আর লয়|

সুরমা যেমন ভাল ছিল পড়াশোনায়, তেমনই হয়ে উঠছিল নাচে পারদর্শী | স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে শুধু সুরমার নাচের জন্যই সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত | সেই সুরমা হঠাৎ একদিন বাবাকে বলল, 'আমি আর নাচ শিখব না, বাবা | গুরুজী চলে গেলে আমার প্রাকটিস করতে ভাল লাগে না |'

বড়বাবু ছিলেন রগচটা মানুষ, কিছুটা নাচ পাগলও | সুরমা নাচ ছেড়ে দেবে বলাতে তাকে একটা চড় মেরে বলেছিলেন, 'খবরদার এরকম কথা বলবে না |' তারপর সুরমার কান্না দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না থামিয়ে বলেছিলেন, 'তুই আমার স্বপ্নের মেয়ে, তোকে আমি শিক্ষায় সরস্বতী আর রূপেগুণে মেনকা করে তুলতে চাই | তুই আমার মেয়ে না বলে, লোকে যেন আমার পরিচয় দেয় তোর বাবা হিসাবে | নাচ ছাড়িস না মা |'

বাবার কথা অমান্য করতে পারেনি সুরমা, ফিরে গিয়েছিল নাচের দৈনন্দিন তালিমে | এরপর খুবই মনমরা থাকত সে | মাস

শিল্পী: সফিক আহমেদ

তিনেক পর একদিন সারা বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে | অনেক খোঁজাখুঁজির পর চিলেকোঠার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল তার অচৈতন্য দেহ | বড়বাবুর ডাক্তার বন্ধু এসে দেখে বলেছিলেন বিষক্রিয়ায় অস্বাভাবিক মৃত্যু | লোকলজ্জার ভয়ে থানা পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে ডাক্তারের হাতেপায়ে ধরে ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়েছিলেন আর সাত তাড়াতাড়ি দাহ করা হয়ে গিয়েছিল দেহ | তারপর থেকে বড়বাবু মরা মানুষের মতো বেঁচে ছিলেন | নাচঘর স্তব্ধ, তবু তিনি সেই অন্ধকার ঘরেই বসে থাকতেন পান-পাত্তর হাতে, আয়নার দিকে চেয়ে | আয়নায় নাকি দেখতে পেতেন সুরমার করুণ মুখ আর নাচের তালিম | রাতের পর রাত কেটে যেত বড়বাবুর স্থাণু অবস্থায় বসে থেকে |

একদিন ভোররাত্রে হঠাৎ বড়মাকে ঘুম ভাঙিয়ে বলেন, 'গুরুজী আর তবলিয়াকে খবর দাও আজ একবার আসতে | আমি শুনব সুর-তাল-লয়, আমি আমার সুরমাকে মনে করতে চাই |'

বড়বাবুর ডাক অবজ্ঞা করতে পারলেন না গুরুজী | হাজির হলেন তবলিয়াকে নিয়ে | সন্ধ্যেবেলা নাচঘরে আবার আলো জ্বলল | আয়নার সামনে গুরুজীর বোল আর তবলিয়ার সঙ্গতের সঙ্গে মানসচক্ষে বড়বাবু দেখছিলেন পরম আদরের সুরমার নাচ | বড়বাবু গুরুজীকে প্রণাম করে বললেন, 'জলপান করে আপনি আজ আসুন | আমি আরেকটু তবলা শুনব |' এরপর বেশ কিছুক্ষণ তবলা শুনে বড়বাবু এগিয়ে দিলেন এক গ্লাস পানীয় তবলিয়ার দিকে | তাতে চুমুক দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল তবলাবাদক |

সেই বিশাল আয়নার দিকে তাকিয়ে বুকফাটা আর্তনাদ করে বড়বাবু বলেছিলেন, 'মা সুরমা, আমাকে ক্ষমা করে দিস | আমি তোর কথা না শুনে এই পশুটার কাছে তোকে ফেরত পাঠিয়েছিলাম দিনের পর দিন যৌন অত্যাচার সহ্য করতে | আজ তোর সামনেই আমি এই নরপশুটাকে বলি দিলাম | আজ তোকে মুক্তি দিলাম, আর তুই ফিরে আসিস না এই আয়নায় |'

তারপর যতদিন বেঁচেছিলেন বড়বাবুর বাকশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল | অর্ধমৃত অবস্থায় কাটিয়েছিলেন বাকি জীবন | ওই আয়না নাচঘর থেকে খুলে নিয়ে রাখা হয়েছিল চিলেকোঠায় |"

এই পর্যন্ত গল্প বলে কমলিমাসি বলল, "আজ এই থাক, বেলা পড়ে এল; বাবুদের চা দিতে হবে | আরেকদিন বলব আয়নার ভবিষ্যৎ দেখানোর গল্প |"

মা-কাকিমারা স্থাণুবৎ | বিকেলের পড়ন্ত আলোতে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের চোখমুখ থমথম করছে | কমলিমাসি উঠে যেতে তারাও চুপচাপ উঠে গেল |

সেদিন আমার হোমওয়ার্ক একটুও এগোল না |

অমানিশা

নন্দিতা ভট্টাচার্য

বিপিনবাবু ও পূর্ণিমাদেবীর বিয়ের পর সন্তান আসে প্রায় ১৮ বছর পর | স্বভাবতই খুশির হাওয়া পরিবারে | সমস্যা হ'ল মেয়ের গায়ের রং নিয়ে | বিপিনবাবু ও পূর্ণিমাদেবী দুজনেরই গায়ের রং যথেষ্ট ফর্সা, কিন্তু তাঁদের সন্তান একে কালো, তার ওপর আবার মেয়ে! ঠাকুমা-জ্যাঠা-জ্যেঠিরা নাক সিঁটকায় | "পূর্ণিমার কোলে অমাবস্যা" – বলে সবাই হাসাহাসি করে |

ঠাকুমা বলে, "নিশ্চয়ই হাসপাতাল থেকে বাচ্চা পাল্টে দিয়েছে, আমাদের গুষ্টিতে এমন কেউ নেই |"

তাতে যদিও বিপিনবাবুদের কিছু যায় আসে না, মেয়ের নাম রেখেছেন 'অমানিশা'| অমানিশা খুবই দুরন্ত-ছটফটে-চঞ্চল আর ভীষণ বুদ্ধিমতী একটি বাচ্চা | স্কুলে কোনদিনও ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় না | স্কুলের টিচাররা খুবই ভালবাসেন, তবে রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে 'কালো' কথাটা সব সময়ই শুনতে হয় তাকে | বিপিনবাবুর চিন্তা গায়ের রং যেন কোথাও বাধা না হয়ে দাঁড়ায় অমানিশার জীবনে | পূর্ণিমাদেবীর চিন্তা বিয়ে হবে তো!

অমানিশা কলেজে যেতে শুরু করলে বুলিইং (bullying)-এর শিকার হয় | কিন্তু তার মেধা আর রেজাল্টের জন্য আস্তে আস্তে সে সবারই প্রিয় পাত্রী হয়ে ওঠে |

একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে অমানিশার একটা হোর্ডিং-এর দিকে নজর গেল, 'মডেলিং/অভিনয় শেখার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান'|

খাবার টেবিলে সে বাবাকে বলল, "বাবা আমি মডেলিং করব?"

বিপিনবাবু কিছু বলার আগেই জ্যেঠতুতো দাদা/দিদিরা বলে উঠল, "কুঁজোরও তো চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছা হয়!" এই বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল তারা |

অমানিশার খুব কষ্ট হ'ল, খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে গেল সে |

বিপিনবাবু মেয়েকে বললেন, "তোর যেটা ভাল লাগে করবি, আমার পূর্ণ সম্মতি আছে |"

বাবা-মায়ের ভরসা পেয়ে অমানিশা কলেজ শেষ করে মডেলিং ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হ'ল |

আর তারপর –

পাঁচটা বছর কেটে গেছে |

জ্যেঠতুতো যে দিদি হেসেছিল, সে স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে এসে উঠেছে | আর জ্যেঠতুতো দাদা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে |

এদিকে অমানিশা?...

আজ সে দেশের সেরা মডেল | দেশ বিদেশের পত্রপত্রিকায় ওর ফটো বেরোয় – আজ আমেরিকা, তো কাল লন্ডন এই করে বেড়াচ্ছে | মুম্বাইতে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, পৃথিবীর সেরা কয়েকটা গাড়ি | বাবা-মাকে নিয়ে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় |

এখন ঠাকুমা, জ্যাঠা, জ্যেঠি, দাদা, দিদি, আত্মীয়স্বজন, পড়শীরা সবাই খুব গর্ব করে অমানিশার ফটো দেখিয়ে বলে, "এটি আমার নাতনি, এ তো আমার বোন, এ আমার আত্মীয়, এ আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে," ইত্যাদি...

ইচ্ছে হয়ে ছিলি

ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যিই আরাম করার দিন এখন মনোময়ের | অবসরের পর নতুন ছন্দে বেঁধে ফেলেছিলেন নিজের জীবনটা | প্রাতঃভ্রমণ, বাজার-হাট, ব্যাঙ্ক-পোস্টঅফিস, বাড়ির সকলের ছোটখাটো অসুখ বিসুখে ডাক্তার বদ্যি, বিকেলে কিছু পরিচিত বয়স্ক মানুষের সঙ্গে পাড়ার পার্কে আড্ডা – কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুর কাটতে লাগল | প্রাতঃভ্রমণ শীতকালে, বর্ষাকালে বন্ধ | ধীরে ধীরে পায়ের জোর কমল, বাকি রইল দোকান বাজারের কাজ | তাও বন্ধ হ'ল একদিন বাজারে গিয়ে অসুস্থ হবার পর | কয়েকজন পরিচিত মানুষ সঙ্গে করে বাড়িতে দিয়ে গেল | রাস্তায় সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ি বাড়ল; হার্টের ব্যামো ধরা পড়ল, হাঁটতে গেলে হাঁপ ধরে | প্রাতঃভ্রমণ পুরোপুরি বন্ধ হ'ল | এখন সবসময় মনোময় শোনেন, "তুমি বসো আমরা করে দিচ্ছি", "তোমাকে আর বাইরে যেতে হবে না, আমি নিয়ে আসব... |"

মনোময় ভাবেন মেয়েদের জীবনে সেরকমভাবে অবসর থাকে না | সেটাকে একরকম আশীর্বাদও বলা যায় | সংসারের কাজ কিছুটা হলেও তো থাকে, তাতেই দিনের অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকা যায় | এইরকম একটা সময়ে মনোময়ের অবসর জীবনটাকেই বোঝা বলে মনে হতে লাগল | কতক্ষণ আর বই, পত্রপত্রিকা নিয়ে দিন কাটানো যায়! কাজের মানুষ মনোময় ভাবেন হঠাৎ এইরকম নিষ্কর্ম হয়ে গেলে জীবনটাই কিরকম পানসে হয়ে যায় |

সেই পানসে জীবনে স্বাদ এসেছিল যখন গোগোল একটু বড় হ'ল | গোগোলকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, গল্প বলা, খেলাচ্ছলে একটু পড়ানো – এইসব নিয়ে দিন কাটছিল | ধীরে ধীরে গোগোল আর একটু বড় হ'ল, ওরও নিজের একটা জীবন গড়ে উঠছিল | বিকেলবেলা দাদুনের সঙ্গে বেড়িয়ে ওর মন ভরে না | ও বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চায় | মনোময়েরও বয়স হতে লাগল | সংসারের মধ্যে থেকেও ধীরে ধীরে একা হয়ে যাচ্ছিলেন মনোময় |

এইরকম সময়ে একটা ছোট্ট কথা মনোময়ের জীবনটা বদলে দিল | সেই যে কথায় বলে না একটা স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে! তেমনি মানুষের জীবনেও একটা ছোট কথা, ছোট ঘটনা জীবনটাকেই বদলে দেয় |

একদিন বিকেলে মনোময় নিজের ঘরের সামনে ইজিচেয়ারটায় বসে আছেন | এমন সময় গুটি গুটি গোগোল এসে হাজির | সেই ছোটবেলায় দাদুর বিকেলের সঙ্গী থাকত গোগোল | প্রথমে দাদু শক্ত করে নাতির হাত ধরে বেড়াতেন; ধীরে ধীরে সময় বদলাল, নাতিই দাদুর হাত ধরে দাদুকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসত | তারপর আরেকটু বড় হয়ে গোগোলের বিকেলে মাঠে খেলতে যাওয়া শুরু হলে বিকেলবেলা দাদু-নাতির দেখা হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল |

- "কীরে, খেলতে যাসনি?"
- "না দাদুন, আজ খেলা হবে না | দাদুন একটা কথা বলব, কাউকে বলবে না?"
- "কী এমন গোপন কথা রে কাউকে বলা যাবে না?"
- "আগে বলো কাউকে বলবে না |"
- "ঠিক আছে, ঠিক আছে বলব না | বল |"
- "দাদুন, পাখি পুষব, কিনে দেবে?"
- "পাখি পুষবি? সে কী রে!"
- "হ্যাঁ দাদুন, আমার বন্ধুর বাড়িতে দেখে এসেছি | বদ্রিপাখি, নানা রঙের হয়, দারুণ সুন্দর |"

মনোময়ের কানে তখন আর কোনো কথাই ঢুকছে না | উনি পেছিয়ে গেছেন প্রায় ষাট বছর আগে, গোগোলের বয়সে | পাখি পোষার সখ হয়েছিল বালক মনোময়ের, টিয়াপাখি | বাবাকে বলেছিল, 'বাবা, পাখি আর খাঁচা কিনে দেবে? পুষব' | বাবা ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, 'পাখি পুষবি? লেখাপড়া কর মন দিয়ে, পাখি পুষবে! যত্তোসব' | ছেলের ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে মায়ের মন গলেছিল | বলেছিল, 'কাঁদিস না | আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলব |' মা বোধহয় বাবাকে বোঝাতে পারেনি | দুঃখ ধীরে ধীরে সয়ে যায়, মনোময়েরও সয়ে গিয়েছিল | কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় কিছুটা হলেও থেকে গিয়েছিল মনের গভীরে |

আজ গোগোলের একটা কথা – 'দাদুন, পাখি পুষব কিনে দেবে?' মনোময়ের সেই সুপ্ত বাসনাটা জাগিয়ে দিল | সেদিনের মতোই চোখ ছলছল করে করে উঠল প্রৌঢ়ের | তবে আজ অন্য কারণে | গোগোলের পাখি পোষার ইচ্ছে মনোময়ের সুপ্ত ইচ্ছেকে যেন জীয়নকাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দিয়েছে | উনি

ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন গোগোলের ইচ্ছা পূরণ করবেন। আসলে উনি নিজেরই ইচ্ছা পূরণ করতে চলেছেন, তাই এই আনন্দাশ্রু। গোগোলের নরম শরীরটা জড়িয়ে ধরে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন 'দাদুন রাজি'।

এর পরের কয়েকটা দিন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কাটল গোগোলের, দাদুনেরও। এক ফাঁকে গোগোলের সঙ্গে ওর বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পাখির খাঁচা, পাখি দেখে মনোময় মুগ্ধ হয়ে যান। ওঁর ধারণা ছিল পাখি পোষা মানে একটা খাঁচা আর একটা টিয়াপাখি; সেই রকমই তো বায়না ছিল তাঁর বাবার কাছে। কিন্তু এ যে মস্ত খাঁচা! কত পাখি, কত রঙ!

বাড়ি এসে ভয়ে ভয়ে গোগোল জিজ্ঞেস করল, "দাদুন, হবে না?"

- "কেন হবে না? ঠিক হয়ে যাবে।"

- "দাদুন, তুমি এইটা একটু পড়ে নাও, এখানে বদ্রিপাখি সম্পর্কে সব দরকারি কথা লেখা আছে।" মায়ের মোবাইল ফোনটা এনে গোগোল গুগল খুলে দাদুনকে দেখায়। গোগোলের এখন দশ বছর বয়স। মনোময় নিজের দশ বছরের কথা ভাবেন।

- "হ্যাঁরে, তুই এত কী করে শিখলি?"

- "এ তো খুব সহজ দাদুন। তোমাকেও শিখিয়ে দেব।"

- "আমার আর এই বয়সে এসব শিখে লাভ নেই, পড় দেখি কী লিখছে ওখানে।"

- "যারা পাখি পোষে তারা সাধারণত বদ্রিপাখি দিয়েই শুরু করে।"

- "বাঃ, আমরা তাহলে ঠিকই শুরু করছি।"

- "আকারে খুব ছোট, খুব সুন্দর দেখতে, নানান রঙের হয়।"

- "সে তো দেখতেই পেলাম। অস্ট্রেলিয়ার পাখি বাবা! সাহেব পাখি। ভীতু ও লাজুক প্রকৃতির হয়; খুব ভাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইগুলো খুব দরকারি কথা। খাঁচা বড় করে করতে হবে যাতে পাখিরা একটু ওড়াউড়ি করতে পারে।"

ধ্রুবর বিয়ের পর বাড়িতে দোতলা করা হয়েছিল। আধখানা ছাদ জুড়ে দক্ষিণমুখো দুটো ঘর সামনে ঢাকা বারান্দা। তার সামনে খোলা ছাদ। নানারকম মরশুমি ফুলের টব দিয়ে সাজানো। পাশাপাশি লঙ্কা, টমেটো, একটা দুটো বেগুন গাছ, একটু ধনেপাতা এদের নিয়েই মনোময়ের সময় কাটে। এটাই এখন মনোময়ের সাম্রাজ্য।

- "পড়, তারপর কী লিখেছে।"

- "এই দেখো, এইখানে লিখছে পাখি যেন কিছুক্ষণের জন্য রোদ্দুর পায়।"

- "খুব ভাল কথা। এই দেখ, বারান্দার এই পাশটায় খাঁচা থাকলে পূবের রোদ্দুর রোজ সকালে পাবে। আবার এখান থেকে আকাশটাও কিছুটা দেখতে পাবে। আকাশ না দেখতে পেলে পাখি কখনো ভাল থাকে? এরচেয়ে ভাল কিছু হয় না। যাকগে আরও অনেক কিছু জানতে হবে, তবে সেসব পরে জানলেও চলবে। আগে তো খাঁচা আর পাখি নিয়ে আসি।"

ধ্রুব অফিসে যায়। মিতা আর গোগোল যায় স্কুলে। ফলে দিনেরবেলা যে যার মতো খেয়ে নেয়। রাতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। রমলা বললেন, "হ্যাঁরে গোগোল, দাদুর সঙ্গে একটু বেশি ভাব দেখছি ক'দিন। ব্যাপারটা কী? কিছু বায়না আছে নিশ্চয়ই।"

মনোময় আর গোগোল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মনোময় ভাবেন এবার শর্তভঙ্গ করার সময় হয়েছে। গোগোলকে চোখ টিপে বলেন কোনো চিন্তা নেই। তারপর বলেন, "গোগোলের পাখি পোষার শখ হয়েছে।"

মা-বাবা অবাক, "সেকী! সে যে অনেক ঝামেলা, কে দেখাশোনা করবে? আমরা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না, গেলে ফিরে এসে দেখব সব মরে গেছে, লেখাপড়ার ক্ষতি হবে, এসব কে ওর মাথায় ঢোকাল?"

ধ্রুব আর মিতার এক ঝাঁক প্রশ্নের মুখে পড়লেন মনোময়। রমলা অবশ্য কোনো কথা বললেন না। সকলের কথা শুনছেন আর ভাবছেন বলটা কোনদিকে গড়ায়। মনোময়ের ছোটবেলায় পাখি পোষার শখ ছিল – সে গল্প রমলার জানা ছিল।

মনোময় তাঁর কথাগুলো দুদিন ধরে, ধীরে ধীরে বলতে একটু সময় নিলেন। বললেন, "পাখি পোষায় কোনও ঝামেলা নেই। একটি সন্তানকে বড় করতে কত ঝামেলা। আমরা কি কখনো তাকে ঝামেলা বলে মনে করি? করি না তো; কারণ সন্তানের প্রতি আমাদের ভালবাসা। আর শিশুকেও ভালবাসতে শেখাতে হয়। গোগোল যদি জন্ম থেকে দেখত বাড়িতে খাঁচায় পাখি আছে, তার প্রতি ওর মায়া, ভালবাসা গড়ে উঠত। আমার মনে হয় ওর ইচ্ছেয় যে পাখিগুলো আসবে তাদের প্রতি ওর অনেক বেশি মায়া, মমতা, ভালবাসা জন্মাবে। আর যার মনে

ভালবাসা থাকে সে শুধু পাখিকেই ভালবাসবে তা নয়, সকলকেই ভালবাসতে শিখবে।

শোন গোগোল, মা-বাবা রেগে যাচ্ছে, কিন্তু আমি তোর দলে। পাখি কিনে আনলেই কিন্তু হবে না, তার যত্ন করতে হবে, সময়ে খেতে দিতে হবে, প্রতিদিন জল বদলে দিতে হবে। অসুখ করলে ওষুধ দিতে হবে। পারবি তো?"

মনোময় টেবিলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গোগোলের হাঁটুতে একটা চিমটি কাটে। গোগোল ওর নিষ্পাপ, বড় বড় চোখদুটো তুলে ঘাড় নাড়ে। মনোময়ের মায়া হয়। সত্যিই তো স্কুল, পড়া, বন্ধুদের সঙ্গে খেলার পর কী করে ও পাখির সব কাজ করবে? মনোময় হেসে বলেন – "আমি তো তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট আছিই, আমি সাহায্য করব। কিন্তু দায়িত্ব তোমার, এটা মনে রাখতে হবে।"

সবাই হেসে ওঠে। মনোময় সস্নেহে গোগোলের মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দেন।

ছুতোর মিস্ত্রী এসে কাজ শুরু করে দিল। সেদিন স্কুল থেকে ফিরেই একছুটে দোতলায় গিয়ে গোগোল দেখে খাঁচা নয়, একটা খাঁচাঘর তৈরী। খাঁচার মধ্যে একটা শুকনো গাছের ডাল, তিনটে কলসির গায়ে ফুটো করে পাখিদের ঢোকা বেরোনোর রাস্তা করা। গাছের ডালে দোলনা।

- "দাদু, এত বড়?"

- "বাঃ, ওড়বার একটু জায়গা দিতে হবে না? উড়তে না পারলে কি পাখির শরীর ভাল থাকে?"

মহালয়ার দিন ছ'টা পাখি এসে গেল। সেদিন ঘটা করে উদ্বোধন হ'ল। বাড়ির সব কাজকর্ম বন্ধ, কেউ ছাদ থেকে নামছেই না। গবেষণা চলছে, কোন পাখিটা সবচেয়ে সুন্দর। পাখিগুলো উড়ছে, গাছের ডালে বসছে, দোলনায় দুলছে।

- "দাদুন, ওরা খুব খুশি হয়েছে মনে হচ্ছে।"

- "হবে না? আমরা যখন ছোট বাড়িতে থাকতে থাকতে বড় বাড়ি কিনি আমরা খুশি হই না? ওদেরও তো পাখিওয়ালার খাঁচা থেকে এখানে এসে মনে হচ্ছে রাজপ্রাসাদে এসেছে।"

রমলা বলল, "শোন, আজ মহালয়ার দিন এরা এসেছে। কে কবে জন্মেছে জানি না, আমরা এদের জন্মদিন প্রতি বছর মহালয়ার দিন পালন করব।"

ধ্রুব বলল, "খুব ভাল কথা মা, কিন্তু জন্মদিনের এখনও এক বছর দেরী। আজ জন্মের দিনটাও তো পালন করতে হবে। আমরা বরং সন্ধ্যেবেলা ছাদে ডিনার করব। আমি ছাদে আলোর ব্যবস্থা করে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে ফেলছি। মা, তুমি আর মিতা ভাল রান্নাবান্না করে ফেলো।"

- "দাদুন, আমরা তো ভাল ভাল খাব, আর এরা?"

- "দেখো, দেখো, গোগোলের ঠিক খেয়াল আছে পাখিদের কথা। গোগোল, পাখিরা তো রাত্তিরে খায় না। আর আজকের খাবার তো দেওয়া হয়েই গেছে।"

- "তবু কিছু একটা দেব আমরা যখন খাব। খেতেও তো পারে!"

- "ঠিক আছে। ফল তো সব আনা আছে, কিছু একটা দিস।"

- "দাদুন, তুমি স্ট্রবেরি এনেছ, দেবো?"

- "হ্যাঁ হ্যাঁ, সাহেব পাখি তো, আজ বিশেষ দিনে স্ট্রবেরি দেওয়াই ভাল।"

একদিন মনোময় ধ্রুবকে বলছিলেন, "দেখ পাখি পোষা মানে শুধু একটা শখ বা একটা খেয়াল নয়। এটা একটা শিশুকে গড়ে দিতে পারে। সে পশুপাখি, প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়, তার দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়, সে ভালবাসতে শেখে।"

- "বাবা, তুমি আমাকে এসব বলছ কেন? আমি প্রথমে একদিন লেখাপড়ার ক্ষতি হবে – এসব বলেছিলাম। কিন্তু তুমি যদি কিছু বলো সে বিষয়ে আমি কখনও প্রশ্ন করি কি?"

- "না না, আমি সেকথা বলতে চাইনি। লক্ষ্য করেছিস কি গোগোলের স্বভাব কেমন বদলে গেছে? বেলা অবধি ঘুমোন অভ্যাস ছিল, ডেকে ডেকে তুলতে হতো; এখন কেমন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে যায়। আমি ওকে বলেছিলাম, পাখিরা তোমার বন্ধু। ওরা ভোরবেলা উঠে বন্ধুকে দেখলে খুশি হয়। রোজ সকাল সকাল উঠে ওদের সঙ্গে দুটো কথা বলে যাবে। এইটুকুতেই কাজ হয়ে গেছে। আর সত্যিই সকালবেলা গোগোলকে দেখেই ওদের ডানা ঝাপটানো, কিচিরমিচির বেড়ে যায়।"

- "হ্যাঁ বাবা, আমি লক্ষ্য করেছি।"

- "আমি সব কাজ করে দিই, কিন্তু আমি ওকে বলি এসব তোমার কাজ, আমি তোমার হয়ে করে দিচ্ছি। আমি বুড়ো হয়েছি। কবে ওষুধ দেবার দিন, কবে চান করানোর দিন আমার আর আজকাল এসব মনে থাকে না। আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি সব কাজ করেছি কিনা। আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ভুলে যাই। ও এসে

মনে করিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি গিয়ে করি, ও খুব খুশি হয়। তবে স্নান আমাকে করাতে দেয় না। পাইপ দিয়ে বৃষ্টির জলের মতো ওদের স্নান করাতে গোগোল খুব ভালবাসে।"

*****

আজও প্রতিদিনের মতো পাখির ডাকেই ঘুম ভেঙেছিল। পূব আকাশ তখন রাঙা হয়ে আসছে। এই সময়টা মনোময় আর রমলার একান্ত নিজস্ব। ছাদে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসেন। একসঙ্গে দুজনে চা খান। নানা কথা, পুরনো কথা বলে কিছুটা সময় কাটে। আজও তেমনভাবেই শুরু হয়েছিল দিন। রমলা নীচে নেমে গেলেন স্নান, পুজোপাঠ ও দৈনন্দিন কাজে। তখন পূবের রোদ্দুরে পাখিরা স্নান করছে। সারারাতের সঞ্চিত এনার্জি নিয়ে খাঁচার মধ্যে ডানা ঝটপট করছে, শুকনো গাছের এডাল ওডালে বসছে। দোলনায় জোড়ায় জোড়ায় বসে দোল খাচ্ছে। মনোময় সূর্যপ্রণাম, সূর্যের স্তব করে খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। পাখিরা তখন দল বেঁধে কিচির মিচির করে তাদের প্রিয় মানুষটাকে সুপ্রভাত বলে। মনোময় ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বকবক করেন। এমন সময়ে গোগোল এসে গেল। পাখিরা গোগোলকে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে ডানা ঝাপটাল। গোগোল ওদের বন্ধু।

- "দাদুন ঐ দেখো, ঐ দেখো হাঁড়ির মধ্যে তাকাও, দুটো বাচ্চা ফুটেছে।"

- "তাই নাকি, দেখি তো" বলে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে এগিয়ে আসেন। মাথাটা একটু টাল খেয়ে গেল কি! অনেক চেষ্টা করে হাঁড়ির মধ্যের অন্ধকারে ঠাহর করতে চেষ্টা করেন, আবছা দেখতে পেলেন নতুন প্রাণের নড়াচড়া।

আজ রবিবার, মনোময়ের ছুটি। আজ গোগোল পাখির সব কাজ করবে। খাঁচা পরিষ্কার, পাখিদের খাবার দেওয়া, জলের জায়গাগুলো ভরে দেওয়া, স্নান করানো। অন্যদিন মনোময় এসব নিজেই করেন। ছুটির দিনেও উনি করতে পারেন, কিন্তু গোগোলকে একটু দায়িত্বশীল করার জন্যে এই ব্যবস্থা।

মনোময় এই সময়টায় নরম রোদে গাছপালাগুলোর পরিচর্যা করে নেন। গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে, আগাছা তুলে পরিষ্কার করলেন। তারপর লঙ্কাগাছগুলোর পাতা কুঁকড়ে গেছে দেখে স্প্রেয়ার এনে উবু হয়ে বসে গাছগুলোতে ওষুধ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আবার মাথাটা টলে উঠল, এবার একটু বেশি। শরীরটা একটু অন্যরকম খারাপ লাগল। উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন। শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে গোগোল দেখে দাদুন পড়ে আছে মাটিতে।

মনোময় এখন বিছানায়, তাকে ঘিরে রয়েছে রমলা, ধ্রুব, মিতা, গোগোল। পাড়ার একজন ডাক্তার দেখে গেছেন। অ্যাম্বুলেন্স আসছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে যেতে হবে।

*****

পাখিগুলো খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারা সব কিচির মিচির করে কত কথা বলতে বলতে মনোময়কে নিয়ে ভেসে চলেছে আকাশে। যেন রামধনু ভেসে যাচ্ছে আকাশের বুক চিরে। মেঘের মাঝখান দিয়ে ভেসে যেতে যেতে ওরা ঘন নীল আকাশে পৌঁছে যায়। মনোময় ভাবেন এত নীল আকাশ তো আগে দেখেননি। বুঝতে পারেন এখানে বাতাস বিশুদ্ধ তাই। উড়তে উড়তে এক সময় বাতাস পাতলা হয়ে আসে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে কষ্টটা বাড়ে। মনোময় বলেন, "বিদায় বন্ধুরা। যাও, তোমরা এবার ফিরে যাও। এখনকার পথ আমার একার, এখানে কেউ কারো সঙ্গী হতে পারে না। যাও, ফিরে যাও, গোগোল তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে যে!"

ঈশ্বর

হিন্দি অণুগল্প: সুকেশ সাহনী

অনুবাদ: বেবী কারফরমা

পেটে অজস্র যন্ত্রণা... ব্যথায় ছটফট করছি... | স্ত্রী আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে, তার হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর কাঁপছে | ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আমার গালে পড়ছে, গরম অশ্রু অনুভব করতে পারছি | দুদিন সে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেনি | সে ঈশ্বরের কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইছে |... ঈশ্বর?... জোর করে চোখ খুলে চারিদিক দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম, কেবল ঘোলাটে... চারিদিক কেবল ঘোলাটে... ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না... |

ঘরে কীর্তনের আয়োজন | সিনেমার গানের সুরে কীর্তনের সুর চড়ছে | শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভিড়ে পরিস্থিতি আরো সঙ্গিন হয়ে পড়েছে | কিছুটা সময়ের ব্যবধানে কেউ না কেউ আসছে আর বলছে "সব ঠিক হয়ে যাবে, ঈশ্বরকে ডাকো |..." ঈশ্বর?... সিনেমার গানের সুরের মাঝে নায়ক নায়িকার ভিড়ে তাঁকে দেখতে পেলাম না... |

নিমকাঠে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছি, একটা ঘন্টা বাজার আওয়াজ শুনছি | গ্রহের দোষ কাটাতে কোন সিদ্ধ পুরুষের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি... | আস্তে আস্তে নেশারু দুনিয়ায় তলিয়ে যাচ্ছি, স্ত্রীর গলার আওয়াজ সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছি, "ঈশ্বর আমার স্বামীকে তোমার চরণে স্থান দিও |..." ঈশ্বর?... | মন্ত্রোচ্চারণ এবং ঝাড়ফুঁকের মাঝ থেকে ওঠা ধোঁয়ায় তাঁকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না... |

শ্মশানে আমার অস্থিগুলো বেছে বেছে বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেছে | স্ত্রীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে | আমার চাকরিটা ও পেয়েছে | শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ও কাজ করতে ব্যস্ত, আমার বুড়ো মা-বাবার জন্য ওই এখন ছেলে, আর আমার সন্তানদের ওই এখন বাবা | ও এখন পূজাপাঠে (ঈশ্বর বন্দনায়) আর সময় পায় না |... ঈশ্বর?... উনি এখন ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন |

অরুন্ধতী

সুজাতা দাস

একটা গন্ধ আজ ক'দিন ধরে অপালার চারপাশে ছেয়ে আছে | কীসের গন্ধ! কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, তাই নিজেই ঠিক করে নিল এটা মৃত্যুর গন্ধই হবে বোধহয় | মৃত্যুর গন্ধ কি এমনিই হয়? নিজের মনেও সংশয় অপালার | সেদিনও পেয়েছিল এই গন্ধটা, যেদিন অ্যাম্বুলেন্সটা এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের অ্যাপার্টমেন্টের গেটের সামনে | সেদিনও অ্যাম্বুলেন্স দেখে খুব অবাক হয়েছিল অপালা |

কিছু আগে স্কুল থেকে ফিরেছিল অপালা | স্নান সেরে এককাপ ব্ল্যাক কফি বানিয়ে সবেমাত্র চুমুক দিতে যাবে, হঠাৎ সাইরেনের শব্দে চমকে উঠল সে | কাপটা তাড়াতাড়ি সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে দৌড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল |

হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্স কেন? আইডিয়াল অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলায় মাত্র কয়েক মাস হ'ল এসেছে তারা | তবে মাসের বেশিরভাগ সময়ই অপালা ফ্ল্যাটে একাই থাকে | অরুণ, অপালার স্বামী মাসের বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকেন অফিসের কাজে | কিন্তু অপালার স্কুল এখানে, তাই এই ব্যবস্থা |

এক নামী প্রাইভেট কম্পানির একজিকিউটিভ অফিসারদের অন্যতম অপালার স্বামী, অরুণ, তাই ব্যস্ততাও বেশি |

এই অ্যাপার্টমেন্টে অলটাইম সিকিউরিটি, সাথে সবরকম আধুনিক ব্যবস্থাও বর্তমান | অরুণ বাড়ি না থাকলে অপালার সংসার বলে কিছুই থাকে না সে সময় | এই কয়েক বছর হস্টেলে আছে ভেবেই আনন্দে থাকে, এটাই অভ্যাস হয়ে গেছে অপালার, কারণ তারা এখনও সংসারী হয়ে উঠতে পারেনি |

প্রায় পাঁচ বছর হ'ল তাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও মাতৃত্বের স্বাদ পেল না অপালা – এই কষ্টটাও মাঝে মাঝেই মুচড়ে ওঠে তার মনে | যখন অবসর সময় কাটানোর কোনও সঙ্গী থাকে না তার কাছে তখন একটা কচি হাতের হাতছানি যেন হৃদয়ের ব্যথাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় | সেই কথা অপালা বলেছে অরুণকে, কিন্তু অরুণ বাইরে থাকার কারণে ভরসা পায় না, তাই বোধহয় তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের জগৎ নিয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করে চলেছে |

নিজের চিন্তাতে মগ্ন ছিল অপালা; সাইরেনের আওয়াজে চমকে তাকিয়ে দেখল অ্যাম্বুলেন্সটা বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টের বাউন্ডারি ছেড়ে। অনেক চেষ্টা করল দেখতে যে কে অসুস্থ হয়েছেন, কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কারণে কিছুই চোখে পড়ল না। ভাবল কাল সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় সিকিউরিটি ডেস্কে জেনে নেবে নাহয়। ফিরে এসে কফির কাপটা হাতে নিয়ে দেখল কফিটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে; আবার গরম করতে ইচ্ছেও হ'ল না, তাই কফিভর্তি কাপটা বেসিনে নামিয়ে রেখে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু মন থেকে কিছুতেই সরছে না অ্যাম্বুলেন্সের ব্যপারটা। এসব ভাবনার মাঝেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ কী একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল তার; ঠক্ ঠক্ আওয়াজ কানে এল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হ'ল, কে এই অসময়ে কলিংবেল না বাজিয়ে দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করছেন! দু'ভ্রুর মাঝে একটা ভাঁজ নিয়ে ঘুমচোখে দরজা খুলে অবাক হয়ে বলে উঠল অপালা, "মাসিমা আপনি!"

- "আসব অপা?" বললেন অরুন্ধতী দেবী।

- "এত রাতে আপনি কেন মাসিমা? পায়ে ব্যথা নিয়ে কেন উপরে উঠে এলেন? আমাকে ডাকলেই তো আমি চলে যেতাম নিচে।"

- "একটু দরকার ছিল তোমার সাথে অপা। আসলে বেশি সময় নেই তো হাতে, তাই ভাবলাম একবার তোমার সাথে দেখা করে যাই।"

মানে! কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে তাকাল সে অরুন্ধতী দেবীর মুখের দিকে। তারপর বলল, "আপনি আগে আরাম করে বসুন তো মাসিমা; আমি চা করি, তারপর দুজনে মিলে চা খেতে খেতে শুনব আপনার কথা।" বলে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল অপালা।

তারপর চায়ের জল চাপিয়ে, একগ্লাস জল এনে রাখল অরুন্ধতী দেবীর সামনে। অরুন্ধতী দেবীর ঠিক উল্টোদিকে বসে অপালা বলল, "বলুন মাসিমা, কী বলবেন আমাকে?"

অরুন্ধতী দেবী কিছু না বলে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হ'ল অপালা। মাসিমার চেহারায় আজ যেন কোনও কষ্টের লেশমাত্র নেই, বদলে অদ্ভুত এক দীপ্তি খেলে বেড়াচ্ছে তাঁর চোখে মুখে। ওপর ঠোঁটের তিলটা যেন সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে মাসিমার।

হঠাৎ হালকা হেসে হাত বাড়িয়ে জলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিলেন অরুন্ধতী দেবী, তারপর বলতে শুরু করলেন, "অপালা, আজ দুপুরে হঠাৎই তোমার মেসোমশাইয়ের শরীরটা খারাপ হ'ল খুব। তুমি তো সে সময় বাড়ি থাকো না, তোমার ফোন নম্বরটা অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কাজের সময় যেমন পাওয়া যায় না কিছুই, আজও তেমনই হ'ল, পেলাম না। তখন বীরেনদাকে ফোন করলাম, বীরেনদাই ছোটাছুটি করে তোমার মেসোমশাইকে অ্যাপলো হাসপাতালে ভর্তি করা থেকে শুরু করে ডাক্তারের সাথে কথা বলা, সবই করলেন একাই।"

কিছু সময় চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করলেন, "আসলে এখানে সকলেই তো একা থাকেন, ছেলেমেয়েরা চাকরি নিয়ে বিদেশে নিজেদের মতো আছে; এদিকে বাবা-মাকে দেখার কেউ নেই। বৃদ্ধাশ্রমের মতোই যেন এই অ্যাপার্টমেন্টেটা।"

আবার একটু থেমে বললেন, "আমার তো কেউই নেই অপালা, সকলের সাথে ঠিকমতো পরিচয়ও নেই আমাদের, একমাত্র তোমাদের আর বীরেনদাদের সঙ্গে ছাড়া। যতক্ষণ না সবকিছু টেস্ট হচ্ছে ততক্ষণ বোঝাও যাবে না কী হয়েছে ওঁর। ডাক্তারবাবু এই কথাই বলেছেন, তাই একটু চিন্তা হচ্ছে।"

- "চিন্তা করছেন কেন মাসিমা? অ্যাপলো হাসপাতালে কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, তাঁরা তো মেসোমশাইয়ের দেখভাল করছেন। আপনি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যান; আমি সকালে খোঁজ নেব মেসোমশাই কেমন আছেন।"

অপালা খেয়াল করল অরুন্ধতী দেবী কেমন যেন একটু উসখুস করছেন। সেটা দেখে বলল, "আর কিছু বলবেন মাসিমা?"

- "তোমাকে কয়েকটা কথা বলতেই এসেছিলাম। তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো অপা?"

- "না না অসুবিধা হবে কেন? আপনি বলুন না, আমি তো আপনার মেয়ের মতোই মাসিমা।"

- "সেটা মনে করেই এসেছি তোমার কাছে, চুপিচুপি একটা কথা বলি অপালা।"

- "হ্যাঁ বলুন না, সংকোচ কেন মাসিমা?" বলেই অপালা ভাবল, মাসিমার কি টাকার দরকার, যা উনি বলতে পারছেন না ঠিক করে! কথাটা ভাবার সাথে সাথেই অরুন্ধতী দেবী বলে উঠলেন, "না অপালা, আমার টাকার দরকার নেই, তোমার মেসোমশাই

সব গুছিয়েই রেখেছেন।"

চমকে উঠল অপালা, মাসিমা বুঝলেন কী করে যে সে এই কথাটাই ভাবছে!

- "এটা রাখো অপা।" বলে একটা প্যাকেট অপালার হাতে দিয়ে অরুন্ধতী দেবী বললেন, "এটাতে একটা চিঠি আছে, যেটা পড়ার অনুরোধ রইল; তবে এখন নয়, সময় হলে পড়ে নিও, কেমন? আর একটা কথা, তোমার মেসোমশাই বাঁচবেন না আমি জানি..." কথাটা বলতে বলতেই দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল অরুন্ধতী দেবীর গাল বেয়ে। "আমারও আর সময় নেই, তাই তোমাকে দিলাম এটা, চিঠিটা পড়ে সেইমতো কাজ কোরো তুমি। ভেবেছিলাম একদিন আমরা দুজনেই তোমাদের কাছে এসে জমিয়ে গল্প করব আর তখন খামটাও দেব। আমরা আইনমতো সবকিছু করে রেখেছি, যাতে আমাদের মৃত্যুর পরে কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু ভগবানের অন্যরকম ইচ্ছা।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অরুন্ধতী দেবী। "আমাদের তো কোনও সন্তান নেই, তাই আমাদের মৃত্যুর পর তুমিই আমাদের কাজ করো।" বলে অরুন্ধতী দেবী অপালার একটা হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিলেন। একটা হিমশীতল ছোঁয়া অপালার সমস্ত শরীরটাকে চমকে দিল। এত ঠান্ডা স্পর্শ কীভাবে একজন মানুষের হতে পারে!

- "কেন এসব ভাবছেন মাসিমা, মেসোমশাই ভাল হয়ে যাবেন, আপনিও তো দেখছি অনেকটাই ভাল আজ, শুধু শুধুই চিন্তা করছেন আপনি।"

- "না অপালা, আর চিন্তা করছি না, সব ভাবনা তোমাকে দিয়ে দিলাম তো! এবার আমি নিশ্চিন্ত। আর হ্যাঁ, আমি হাসপাতালে তোমার নম্বরটাই দিয়েছি, যদিও জানি সেই অধিকার আমার নেই। কিন্তু বীরেনদা আজ এত পরিশ্রম করেছেন যে রাতে তাঁর ঘুমের খুব প্রয়োজন ছিল। তা না হলে কাল আর ছোটাছুটি করতে পারবেন না উনি। তোমার ঘাড়েই বা আর কতকিছু চাপাব মা!" একটু ইতস্তত করে বললেন অরুন্ধতী দেবী।

- "মাসিমা আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যান, আমি হাসপাতালে ফোন করে সব জেনে নেব।"

কথা শেষ হতে উঠে দাঁড়ালেন অরুন্ধতী দেবী। তাই দেখে অপালা বলে উঠল, "আমি কি আপনাকে পৌঁছে দেব মাসিমা?"

- "না মা, আমার শরীর এখন একদম ঠিক আছে। সন্ধ্যেবেলা হঠাৎই মাথাটা কেমন যেন করছিল, হয়তো তোমার মেসোমশাইয়ের চিন্তাতেই। একা একা ভালও লাগছিল না কিছু; মনে পড়ছিল সেই প্রথম তোমার মেসোমশাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার মুহূর্তের কথাগুলো।

ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়েছিলাম, তারপর কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম আমার আর কোনও কষ্ট নেই..." কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, "এখন তবে আসি অপা।" বলে চলে গেলেন লিফ্টের দিকে।

একটু অবাক হলেও, খুব একটা খারাপ লাগাল না অপালার। ভাবল যাক বাবা, সুস্থ হয়ে গেছেন মাসিমা, এবার ভালয় ভালয় মেসোমশাই ফিরে এলেই নিশ্চিন্ত। হঠাৎ সেন্টার টেবিলের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'ল অপালা। মাসিমাকে দেওয়া জলের গ্লাসটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, যেমন জল তেমনই আছে – কিন্তু মাসিমা তো খেয়েছিলেন জলটা!

ভাবনার মাঝে মনে পড়ল গ্যাসে চায়ের জল চাপানো আছে, দৌড়ে গেল কিচেনে, অবাক হয়ে দেখল গ্যাস অফ্ করা। কিন্তু অপালার মনে আছে সে গ্যাস অন করেই চায়ের জল চাপিয়েছিল। চিন্তার মাঝেই অন্য একটা গ্লাসে জল ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল পুরোটা। তারপর ভাবল কী আজেবাজে চিন্তা করছে সে শুধু শুধু! কিচেন থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে যাওয়ার সময় টি-টেবিলে রাখা খামটা হাতে নিতে গিয়ে অপালা দেখল একটা নয়, দুটো খাম রয়েছে সেখানে। অবাক হয়ে খাম দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু তার স্পষ্ট মনে আছে একটাই খাম নিয়েছিল সে অরুন্ধতী দেবীর হাত থেকে।

এ সবের মাঝে হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠায় চমকে উঠল অপালা। একটা অচেনা নম্বর – এত রাতে! ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখল – চারটে দশ। ফোন রিসিভ করতে একজন মহিলার গলা ভেসে এল ওপার থেকে, "মিসেস অপালা মজুমদার?"

- "হ্যাঁ বলছি।"

অপর প্রান্ত তখন বলে চলেছে, "আপনার পেশেন্ট এইমাত্র মারা গেছেন।"

স্তব্ধ অপালা কোনও সাড়া দিতে পারছিল না কথাটা শুনে, ভাবছিল কীভাবে জানাবে মাসিমাকে এই খবরটা।

ওপার থেকে "হ্যালো হ্যালো" করেই যাচ্ছেন মহিলা।
সম্বিত ফিরলে অপালা শুধু বলল, "আমরা আসছি।"
কী করবে বুঝতে পারছিল না অপালা। বীরেনকাকুকে ফোন করতে হবে। সে কথা ভেবে মোবাইলের বোতামে আঙুল ছুঁয়ে মনে হ'ল এভাবে নয়, ওঁরও অনেক বয়স হয়েছে। তাই জামাকাপড় বদলে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে, দরজায় চাবি লাগিয়ে বীরেনকাকুর ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। একটু থেমে তারপর কলিংবেলের সুইচ টিপল। মিনিট পাঁচেক পরে আওয়াজ এল, "আসছি...।" কাকিমার গলা পাওয়া গেল, "কে এত সকালে?"
- "আমি অপালা, দরজা খুলুন কাকিমা।"
অবাক অবস্থায় দরজা খুললেন রুপমা দেবী; বললেন, "অনেক রাতে ঘুমোতে গেছি তো মা, তাই... এসো, ভেতরে এসো। তোমার কাকুকে ডাকছি।" বলে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই অপালা বলল, "কাকিমা, মেসোমশাই মারা গেছেন আজ সকাল চারটে দশে।"
কথাটা শুনে কাছের সোফা ধরে বসে পড়লেন রুপমা দেবী। অপালাও ততক্ষণে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছে।
হঠাৎ রুপমা দেবী কেঁদে ফেললেন; অরুন্ধতীকে কীভাবে দেবেন এই খবর!
অপালার চোখেও তখন জল, খানিক আগেই অরুন্ধতী দেবী এসেছিলেন অপালার কাছে, এটা শুনে চমকে উঠলেন রুপমাদেবী। বললেন, "বলো কী! যে মানুষ একা হাঁটতে পারে না সে তোমার ঘরে এসেছিল?"
অপালা চমকে উঠে বলল, "তাই তো!" এটা তো ভাবেনি সে! আর যখন ফিরে গেলেন তখন একদম সুস্থ মানুষ, দিব্বি নিজেই হেঁটে লিফ্টে উঠলেন। অপালা সবকিছুই বলল, এমনকি মুখে আগুন দেবার কথাটাও, সাথে ওকে দেওয়া খামদুটোর কথাও। কথার মাঝে কখন কাকাবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন, দুজনের কেউই খেয়াল করেনি। কাকাবাবুর গলা শুনে দুজনেই একসাথে তাকাল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু পুরোটাই শুনেছিলেন। বললেন, "তাহলে চলো সবাই নিচে যাই। এভাবে এখানে বসে থেকে লাভ নেই। তিনজনে নিচে নেমে এলেন। ততক্ষণে সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। রুপমা দেবী প্রথমে অরুন্ধতী দেবীর ফ্ল্যাটের কলিংবেল টিপলেন। সমানে বেজে যাচ্ছে, কেউ দরজা খুলছে না দেখে একটু অসহায় বোধ করলেন তিনি। তারপর অপালা আর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। একবার নিচে সিকিউরিটি ডেস্কে খবর দাও, অরুন্ধতী দরজা খুলছে না কেন?" বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।
এদিকে ওদের এখানে দেখে ফ্ল্যাটের অনেকেই উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছেন। ততক্ষণে খবর পেয়ে নিচ থেকে দুজন সিকিউরিটি গার্ড এসে ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দরজা খুলল না।
এর মধ্যে অরুন্ধতী দেবীর কাছে যে মেয়েটি কাজ করে, সে চলে এসেছে। অপালার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, "কী হয়েছে এখানে, দিদি?"
অপালা বলল, "মাসিমাকে কখন থেকে ডাকছি, কিন্তু মাসিমা দরজা খুলছেন না।"
মেয়েটি বলল, "আমার কাছে চাবি আছে। সকালে তো ঠাকুমা খোলেন না দরজা! দাদুও বেরিয়ে যান; তাই আমার কাছে একটা চাবি থাকে, আমি দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকি, দিদি।"
অপালা বলল, "তাড়াতাড়ি দরজা খোল।"
সবাই সরে দাঁড়ালে দরজা খুলে দিল কাজের মেয়েটি। ঘরে ঢুকে বলল, "ভেতরে এসো সবাই, আমি ঠাকুমাকে ডাকছি।"
ভেতরে ঢুকে তিনজনে ভাবছিলেন কীভাবে অরুন্ধতী দেবীকে খবরটা দেবেন। হঠাৎ কাজের মেয়েটির চীৎকার শুনে প্রথমে অপালা, তার পেছনে ওঁরা দুজন ছুটে গেলেন ঘরের ভেতরে। ঠিক সেই সময় অপালা ঐ মিষ্টি গন্ধটা পেল এই ঘরে, যেটা এ ক'দিন সবসময় পাচ্ছিল সে। খুব অবাক হয়ে রুপমা দেবীকে জিজ্ঞাসা করল, "কাকিমা আপনি পাচ্ছেন একটা মিষ্টি গন্ধ এই ঘরে?"
- "না তো মা, বলে অদ্ভুতভাবে তাকালেন অপালার দিকে।"
তারপরের কয়েক ঘন্টা কীভাবে কেটেছে একমাত্র এই তিনজন আর কাজের মেয়েটিই বুঝেছে।
সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ডাকা হলে তিনি এসে দেখে বললেন, কম করে দশ ঘন্টা আগে মারা গেছেন অরুন্ধতী দেবী।
এই ঘটনার অনেক পরেও অপালা হিসেবে মেলাতে পারেনি – কীভাবে সেদিন মাসিমা উপরে এসেছিলেন তার কাছে। এদিকের সবকিছু সামলে কাকাবাবু আর অপালা গেল

নার্সিংহোমে। সেখানকার সব ফরম্যালিটি সেরে বাড়ি আনা হ'ল মেসোমশাইকে। তারপর দুজনকে একসাথে নিয়ে যাত্রা করলেন ফ্ল্যাটের সব মানুষজন নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে।

তার আগে সবার সামনে খোলা হ'ল সেই খামদুটো, যার একটাতে ছিল টাকা আর একটাতে অপালাকে দেওয়া তাঁর নির্দেশ। পুরোটাই ছিল আইনসম্মত।

অপালা খুব কেঁদেছিল সেদিন। অনেক ছোটবেলায় অপালার মা-বাবা মারা গিয়েছিলেন। মা-বাবার স্নেহ থেকে সে বঞ্চিত ছিল চিরজীবন। তার বেশ খানিকটা মাসিমা পূরণ করতেন মাঝে মাঝেই। কিন্তু এতবড় জায়গা তার জন্য ঠিক করে গিয়েছেন মাসিমা আর মেসোমশাই মিলে! সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি অপালা।

অরুন্ধতী দেবীর ইচ্ছেমতোই তাঁকে লালপাড় গরদের শাড়িতে বধূর সাজে সাজানো হয়েছিল; মেসোমশাইকেও নতুন ধুতি পাঞ্জাবিতে। দুজনেই যেন ঘুমিয়ে আছেন পরম নিশ্চিন্তে। এই দৃশ্য দেখার জন্য শ্মশানে মানুষের ঢল নেমেছিল সেসময়। একসাথেই আগুন দিল অপালা পাশাপাশি রাখা দুজনের পার্থিব শরীরে। এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখল সকলে। একটু একটু করে অগ্নিশিখা গ্রাস করতে থাকল দুজনকেই, হঠাৎ অপালা চীৎকার করে কেঁদে উঠল 'মা...' বলে।

ঠিক তখনই অরুণ উপস্থিত হ'ল সেখানে, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল অপালাকে।

তার পরের সব কাজও অপালাই করল নিজের মা-বাবার কাজ মনে করে, শুদ্ধমতে, নিষ্ঠা সহকারে। তার মা-বাবা যখন মারা গেছেন অপালা তখন খুব ছোট ছিল।

সমস্ত কাজ শেষে উকিলবাবুর সাথে দেখা করল অপালা। কাকাবাবু আর অরুণকে নিয়ে অরুন্ধতী দেবীর নির্দেশ মতোই খোলা হ'ল উইল।

কাজের মেয়ে, উমাকে দিয়ে গেছেন এক লক্ষ টাকা তার বিয়ের জন্য। আর তাঁদের ব্যক্তিগত ফ্ল্যাটটি দিয়ে গেছেন যেসব দুঃস্থ অথচ লেখাপড়ায় ভাল ছেলেমেয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে না পেরে কলকাতায় পড়তে আসতে পারে না, তাদের থাকার জন্য; তবে পুরোটাই থাকবে অপালার দায়িত্বে।

একটা জমি ছিল রাজারহাটে, সেখানে বৃদ্ধাশ্রম করার দায়িত্ব দিয়েছেন কাকাবাবু বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে। সেই কাজের টাকাপয়সা আর গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় সব ব্যবস্থা করে গেছেন মেসোমশাই নিজেই।

উমা এখন অপালার কাছে থাকে। মাসিমা ও মেসোমশাইয়ের ঐ ফ্ল্যাটে এখন ছয়জন ছেলে থাকে। তারা সত্যিই লেখাপড়ায় খুব ভাল। একজন রাঁধুনি আছে, সে এসে এদের খাবার রান্না করে দিয়ে যায়। আর সবাই বেরিয়ে গেলে রান্নার দিদি থাকতে থাকতেই উমা ঘরদোর পরিষ্কার করে আসে প্রতিদিন।

হঠাৎ একদিন অপালা সেই মিষ্টি গন্ধ আবার পেল নিজের ঘরে, যে গন্ধটা অরুন্ধতী দেবীর মৃত্যুর পর ঘরে ঢুকে পেয়েছিল অপালা, আজ থেকে কয়েক মাস আগে।

তার ঠিক নয় মাস পরে অপালার কোল জুড়ে এল এক ফুটফুটে মেয়ে, যার উপর ঠোঁটের বাঁপাশে একটা বড় তিল।

রুপমা দেবী নার্সিংহোমে বাচ্চাকে দেখতে এসে চমকে উঠলেন তিলটা দেখে; মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সেই নামটা "অরুন্ধতী"!

অপালা প্রচন্ড ক্লান্তিতেও হেসে বলল, "হ্যাঁ কাকিমা, আমার মা এসেছেন আমার কাছে।..."

কান্নাফুল

মল্লিকা ব্যানার্জী

- "কত যত্ন করছি তবু কিছুতেই ফুল আসে না, কোকোপিট, গোবর সার, সাদা সাদা কেমিক্যাল গুলি, সব দিয়ে দেখেছি! আসলে লক্ষ্ণৌ থেকে আনা বীজ তো! আমেদাবাদের গরমে মানিয়ে নিতে পারছেই না! বোকা গাছটা বোঝে না মানিয়ে নিতেও শিখতে হয় – ফুল আসলে দেখতে কেমন সুন্দর লাগে! ঠিক যেন ছোট ছোট মুক্তোর দানা, গন্ধে পাগল হতে হয়।" টবের গোড়ায় খুরপি চালাতে চালাতে বলে সুপ্রিয়া।

উল্টোদিকের টবে গন্ধরাজের পাতাগুলো ধুয়ে দিতে দিতে হেসে বলে ওঠে পাপিয়া, "ঠিক ফুটবে দেখো! তবে মাঝে মাঝে একটু অযত্নও করো, বেশি নজর পেয়ে ও নিজেকে না জানি কী ভাবছে। দু'তিন দিন পাত্তা না দিয়ে দেখতে পারো, আমি তো তাই করি।"

- "ওটাই যে পারি না, ভালবাসলে তাকে আঁকড়ে ধরি, অবহেলা করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!" ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস চেপে কথাগুলো বলে সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়াকে দেখলেই বোঝা যায় ও ভাল নেই! আগে যেমন হাসিখুশি ছিল, সেই ভাবটা উধাও! কষ্ট চেপে লড়ে যাচ্ছে। পাপিয়া জানে সময় হলে ঠিকই আসবে সুপ্রিয়া তার পাপিয়াদির কাছে! খালি ভয় করে বেশি দেরী না হয়ে যায়।

পাপিয়াদের পারিজাত রেসিডেন্সিতে বি ব্লকের চোদ্দতলায় ছাদের একপাশে বেশ কিছু টবে গাছ এনে লাগিয়েছে মহিলারা মিলে। প্রতি বুধবার বিকেলে এসে জড়ো হয় সবাই, ছাদের একদিকে অনেকটা জায়গার ওপর সুন্দর শেড দেওয়া, নীচে আর্টিফিশিয়াল ঘাসপাতা, একপাশে সুন্দর একখানা দোলনা রাখা। ছাদের চার কোনায় চারখানা বিশাল টবে সাদা, লাল, হলুদ, গোলাপি কাগজ ফুলের গাছ, বৃষ্টিহীন রুখা-শুখা মাটির বুক থেকেও কীভাবে যে সুধারস আহরণ করে নিজেদের এমন রঙিন রাখে বোগানভেলিয়ার দল বোঝা মুশকিল।

প্রথম দিন সুপ্রিয়াকে দেখে পাপিয়ার মনে হয়েছিল ঠিক যেন ঐ রঙিন কাগজ ফুল, বেশ ঝলমলে সাজগোজ, একটু বেঁটে কিন্তু বেশ ফর্সা আর মোটাসোটা – এককথায় মিষ্টি দেখতে! কানে এসেছে মেয়েটা লক্ষ্ণৌর, শিল্পী কিন্তু মুখরাও! কাছাকাছি গেলে কখন গায়ে কাঁটা ফুটিয়ে দেবে বলা যায় না!

বুধসন্ধ্যায় মেয়েদের জটলায় সুপ্রিয়া একা কোনদিনই আসে না। সমস্যাটা শুরু হয়েছিল গোড়ার দিকে। গুজরাটী, মারাঠী, বিহারী, ওড়িয়া সব ভাষাভাষীর মহিলারাই আসে, কিন্তু সুপ্রিয়া প্রথমদিন এসেই বলে ফেলেছিল "ওরা ঠিক লক্ষ্ণৌর কালচারের সাথে খাপ খায় না।" কথাটা চাপা থাকেনি; ফলে 'নাকউঁচু' বদনাম হয়েছিল শুরুতেই। সাথে সাথে চালু হয়েছিল মুখরোচক সমালোচনা সুপ্রিয়া আর তার স্বামী অর্জুন চৌহানকে নিয়ে। এসময় সব ভাষাভাষী একাত্ম হয়ে যায়! সবই কানে আসে পাপিয়ার, তবে এসব থেকে নিজেকে একটু গুটিয়েই রাখত নিজেকে।

পাপিয়া গেলেই বুধসন্ধ্যার পরিবেশটা কেমন যেন বদলে যায়! মিষ্টি গলা পাপিয়ার – হিন্দী, বাংলা সব ধরনের গান গায়, এসময় ঠিক ওর সঙ্গ ধরে সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়াও নাচে কখনও কখনও পাপিয়ার গানের সাথে, মুড ভাল থাকলে নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনায়। কোনোদিন নিজের আঁকা নিয়েও ছাদে আসে, পাপিয়াকে একটা সুন্দর সূর্যমুখী ফুল এঁকে দিয়েছে জিন্সের কাপড়ের ওপর। এখন কমপ্লেক্সের তীজ, জন্মাষ্টমী, নবরাত্রির অনুষ্ঠানে নাচ-গান শেখানোর ভার পড়ে পাপিয়া আর সুপ্রিয়ার ওপর।

পাপিয়া কলকাতার মেয়ে, স্বামীর কর্মসূত্রে আমেদাবাদে আছে, পারিজাত রেসিডেন্সির বারো তলায় ভাড়া থাকে। ঠিক ওদের ওপর তলার ফ্ল্যাটে থাকে অর্জুন চৌহান আর তার দ্বিতীয় স্ত্রী সুপ্রিয়া। অর্জুন চৌহানের প্রথম পক্ষের স্ত্রী কুসুমের নামে ফ্ল্যাট। বাইশ বছরের ছেলে জিতু আর আঠারো বছরের মেয়ে নীতুকে রেখে হঠাৎই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন কুসুম। কুসুমভাবী খুবই মিশুকে ছিলেন বলে শোনা যায়। কুসুমের মৃত্যুর ঠিক ছ'মাসের মাথায় বছর পঁয়তাল্লিশের সুপ্রিয়াকে বিয়ে করে এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসেন অর্জুনবাবু। স্বভাবতই প্রথম থেকে ব্যাপারটা কমপ্লেক্সের মহিলাদের ভাল লাগেনি। পাপিয়াও প্রায় একই সময়ে ভাড়া আসায় সুপ্রিয়া কুসুমভাবীর পরিচিতদের ছেড়ে পাপিয়াকেই আঁকড়ে ধরেছিল, অহেতুক সমালোচনার মুখোমুখি হতে কেই বা চায়! পাপিয়ার মনে আছে গোড়ার দিকে সুপ্রিয়াকে নিয়ে টুকরো টুকরো কথা

হাওয়ায় উড়ত। কমপ্লেক্সের কিছু মহিলার দৌলতে – 'বাইজী বাড়ি থেকে ভাইয়া তুলে এনেছে, ছম্মকচ্ছল্লো, টাকার জন্য অর্জুন ভাইসাবকে ফাঁসিয়েছে নয়তো কেউ এত ধেড়ে ধেড়ে ছেলেমেয়ের বাবার গলায় মালা দেয়! তাও আবার এই বয়সে এসে!' এইসব কথা হরদম শোনা যেত।

পাপিয়ার কেন কে জানে উল্টে অর্জুন চৌহানকে খুব সুবিধের মানুষ মনে হতো না। পুরুষের দৃষ্টি পড়বার ক্ষমতা কমবেশি সব নারীরই থাকে। গুটখা চিবানো, সোনার ব্রেসলেট, সোনার চেন গলায় ঝোলানো অর্জুন চৌহানকে এড়িয়েই চলত পাপিয়া।

সুপ্রিয়া বিয়ে হয়ে আসার মাস খানেক বাদে এক দুপুরে নিজেই চলে এসেছিল পাপিয়ার বাড়িতে; বলেছিল, "পাপিয়াদি, আমায় একবার গাইনির কাছে নিয়ে যাবে? ওঁর ডাকে সাড়া দিতে পারছি না, ভীষণ কষ্ট হয়, রাতগুলো বিভীষিকার মতো লাগে। অথচ উনি আমায় শাড়ি, গয়নায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এই সমস্যাটুকু না থাকলে আমার চেয়ে সুখী আর কে হতে পারে! কেন যেন মনে হয় আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি।

জানো, লক্ষ্ণৌতে আমাদের পাশেই এক বাঙালি পরিবার থাকত, খুব যাতায়াত ছিল, কাকিমা আমাকে বাংলা গান শিখিয়েছেন, বলতেও পারি ভাল। সময় আছে তোমার হাতে, আমার গল্প শুনবে? আমার জীবনটা বড় কষ্টের ছিল জানো! খুব ছোটবেলায় বাবা মারা যান – আমার মা নার্স ছিলেন, একা হাতে আমাকে আর ভাইকে বড় করেছেন। বিয়ের আগে লক্ষ্ণৌতে একটা ছোট স্কুলে আর্ট টিচার ছিলাম আমি, এছাড়াও বাড়িতে আঁকা শেখাতাম। অর্জুনের ছোটবোন আমার ছাত্রী কাম সহেলী ছিল। কুসুমভাবীর মৃত্যুর পরে একরকম জোর করে আমার মাকে রাজি করিয়ে নিজের ভাইয়ার সাথে বিয়ে দিল। আমরা ব্রাহ্মণ, ইউ পিতে ব্রাহ্মণের মেয়ের চৌহানের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে সেটা কেউ ভালভাবে মেনে নেয় না গো, তবু মা বলল – 'প্রিয়া,আমি আর ক'টা দিন বাঁচব! ভাই তার বউ নিয়ে নিজের সংসারে ব্যস্ত! তোকে থিতু দেখতে চাই আমি! মানা করিসনে মা, থাকবিও তো কতদূরে গিয়ে, কে কী বলল শোনার দরকার নেই।'

একটু ইতস্তত করে পাপিয়া বলেই ফেলে, "কিছু মনে করবে না, একটা প্রশ্ন করি? তুমি সুন্দর দেখতে, অল্প বয়সে তোমার মা বিয়ের চেষ্টা করেননি?"

অনেকটা সময় নিয়ে পাপিয়ার মানিপ্ল্যান্টে হাত বোলাতে বোলাতে বলে ওঠে সুপ্রিয়া, "ইউ পি'র মেয়ে, তায় পিতৃহীন, বিয়ে আবার দেবে না! বছর পনেরো হতেই গওনা হয়ে গেল। পুলিশে চাকরি করে ছেলে। একবারই শ্বশুরবাড়ি গেছি। যখন আমার বয়স আঠারোর কাছে, খবর এল বর নাকি মারা গেছে কোন গুন্ডাদলের পিছা করতে গিয়ে। বিয়ের ব্যাপারে কিছু বুঝবার আগেই বিধবা হলাম। শ্বশুরবাড়িতে আমায় ঢুকতে দিল না; মৃত বরকে চোখের দেখাও দেখতে দিল না। অপয়া বলে তাড়িয়ে দিল, এক কানাকড়ি সম্পত্তিও দেয়নি ওরা। কে লড়বে – বিধবা মা, নাকি ছোট ভাই! মায়ের রোজগার আর বাবার পেনশনে ভাই আর আমি পড়াটা চালিয়ে গেছি। বাবা বাড়িটা করেছিল বলে মাথার ওপর ছাদটা অন্তত ছিল। মা বলেছিল, 'তোর আবার বিয়ে দেব প্রিয়া!' কিন্তু ঈশ্বরের কী পরিহাস! পঁচিশ বছর বয়সেই আমার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেল! ফুলহীন, ফলহীন পাতাবাহার গাছ আমি পাপিয়াদি!" শেষের দিকে কান্নায় গলা বুজে আসে সুপ্রিয়ার।

পাপিয়া কী বলবে ভেবে না পেয়ে আস্তে করে ওর পিঠে হাত রাখে, কান্নাভেজা গলায় সুপ্রিয়া বলে ওঠে, "অর্জুনবাবুর এমন মেয়েই দরকার ছিল, যে কোনোদিন সন্তানের মা হবে না, শুধু শয্যাসঙ্গিনী হবে। আর, তাতেও এখন সমস্যা হচ্ছে! তবে বিয়ে হওয়ায় মা নিশ্চিন্ত হয়েছে। ভেবেছিলাম কুসুমদির ছেলে, মেয়ে আমায় 'মা' না বলুক, 'ছোটি মা' বলবে অন্তত! বাবা বিয়ে করছে শুনেই একরাশ ঘেন্না জমে উঠেছে ওদের মনে, মেয়ে কথাই বলে না, ছেলে দরকার পড়লে 'আন্টি' বলে ডাকে।"

কথা ঘোরাতে পাপিয়া বলে ওঠে, "আমার চেনা ভাল গাইনি আছেন। তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব কালই; অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখব।"

এরপর বছর ঘুরেছে। সমস্যা তো মিটেছে বটেই, সাথে সাথে পাপিয়া দেখেছে সুপ্রিয়া সত্যিই সুগৃহিনী! সুন্দর করে বাহারী গাছ, নিজের পেন্টিং দিয়ে ঘর সাজিয়েছে – তবু বাড়ির নেমপ্লেটে কুসুমভাবীর নাম জ্বলজ্বল করছে। ঘরের দেওয়াল থেকে সরায়নি কুসুমভাবী, বাচ্চাদের কোনও ছবি। কুসুমভাবীর শাড়ি-গয়না গায়ে তোলেনি সে, অর্জুনবাবু বলা সত্ত্বেও! বরের মঙ্গল কামনায় নানান পুজোপাঠ করছে যেমন, তেমনই গুটখা ছাড়ানোর জন্য কাকুতি মিনতিও করে চলেছে। ছেলে, মেয়ে ছুটিতে এলে ওদের পছন্দের রান্না করেছে,

জন্মদিনে কেক বানিয়েছে নিজে হাতে | বাচ্চাদের দেওয়া অপমান গায়ে মাখেনি, উল্টে হাত-খরচের পয়সা জমিয়ে সোনার দুল গড়িয়ে দিয়েছে মেয়েকে, ছেলেকে গলার চেন | এক কথায় জাপটে ধরেছে সংসারটাকে!

কিছু বছর পরে সুপ্রিয়া একদিন এসে বলে গেল – "জিতুর জন্য ব্রত রেখেছি, তুমি দুপুরে এসো | জানো, দুদিন আগে জীতু আমায় মা বলে ডেকেছে, নিজের মাইনের টাকায় শাড়ি কিনে দিয়েছে | ঈশ্বর এতদিনে সব সুখ দিলেন |"

পাপিয়াও সেদিন খুব খুশি হয়েছিল | আস্তে আস্তে সুপ্রিয়াকে নিয়ে গসিপ কমে এসেছে, বদলে তার গুণের কদর বেড়েছে | পাপিয়ার এক মেয়ে বিদেশে পড়ছে | সুপ্রিয়ার ছেলে মেয়েরাও ছুটি পেলে তবেই বাড়ি আসে; তাই কাছাকাছি বয়সী দুই সই ছাদের গাছ নিয়ে মেতে থাকে | পাপিয়ার ঝোঁক পাতাবাহারের | বেলি, গন্ধরাজ, কামিনী, সূর্যমুখী – সব ধরনের ফুলের গাছ আছে সুপ্রিয়ার | গাছে ফুল না ফুটলে ভীষণ মুষড়ে পড়ে সে, হয়তো নিজের সন্তান ধারণের অক্ষমতা ঢাকতেই এমন ফুল ফোটাবার জেদ | বছর খানেক হতে চলল লক্ষ্ণৌ থেকে আনা গাছে কেন ফুল আসছে না, সেই নিয়ে টেনশন চলছে |

হঠাৎ এর মাঝে ডি ব্লকে নতুন ফ্ল্যাট কিনে এখানে বাস করতে এল নীনা পান্ডে | এলাহাবাদের মেয়ে; সুপ্রিয়া ও পাপিয়ার সমবয়সী, কিন্তু দেখে অনেক ছোট লাগে | বড় বড় দুই ছেলেমেয়ের মা কিন্তু নায়িকাদের মতো ফিগার | কেরাটিন করা একঢাল চকচকে চুল কোমর অবধি, ফেসিয়াল করা দুধসাদা ত্বক, বড় বড় দীঘল পল্লবে ঢাকা চোখ – তার দিক থেকে নজর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব |

নীনার স্বামী সন্দীপ পান্ডে গুজরাট সরকারের বড় পোস্টে আছেন, নিপাট ভাল মানুষ | পাপিয়া দেখল কীভাবে যেন অর্জুন চৌহান খুব ভাব জমিয়েছে পান্ডেবাবুর সাথে | পাপিয়ার বর অবশ্য মৌখিক সদ্ভাবটুকুই রেখে চলেন সবার সাথে |

নীনা আর সুপ্রিয়া ইউ পি'র লোক হওয়ায় একসাথে খাওয়াদাওয়া, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত মাখামাখি শুরু হ'ল দুটি পরিবারে | সুপ্রিয়ার আজকাল আর ছাদ-বাগানে যাওয়ার সময়ই হয় না | যেসব গাছপালা তার এত প্রিয় ছিল; সে সব এখন পাপিয়ার হেফাজতে | কবিতা লেখা, আঁকা মাথায় উঠেছে | কখনও শাড়ি-গয়নার এক্সজিবিশনে, কখনও বা পার্লারে চলেছে সুপ্রিয়া, পাশে সুন্দরী নীনা – গাড়ির চালক অর্জুন চৌহান | ব্যবসা মার খেলে খাক – অর্জুনবাবু নীনার নেশায় সম্পূর্ণ মজেছেন | সরকারী অফিসার সন্দীপ পান্ডের সময় কোথায়!

এরপর লাগামছাড়া ঘটনা ঘটতে লাগল – সুপ্রিয়া লক্ষ্ণৌতে বাপের বাড়ি গেলে অর্জুনবাবুর ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে নাকি নীনাকে বেরোতে দেখা গেছে | সন্দীপবাবু অফিসে, সুপ্রিয়া বাপের বাড়িতে, নীনাকে ডাক্তার দেখাতে অর্জুনবাবু ছাড়া কে আর নিয়ে যাবে! নীনার ঘরে অর্জুনবাবুর আর অর্জুনবাবুর ফ্ল্যাটে নীনার ঘনঘন যাতায়াত দিনদিন দৃষ্টিকটুভাবে বেড়ে চলেছে | ভোরে নীনা মাঠে যোগাসন করতে যায়, অর্জুনবাবুও সুযোগ বুঝে মর্নিং ওয়াক শুরু করেছেন |

পারিজাত কমপ্লেক্সের হাওয়ায় আবার কথা ওড়াউড়ি চালু হয়ে গেছে | এবার সুপ্রিয়ার দুর্ভাগ্য নিয়ে চলেছে সহানুভূতির সুর | সবার বদ্ধমূল ধারণা নীনার মতো সুন্দরীরা চাইলেই ভ্রুভঙ্গিতে বেশ কিছু অর্জুনদের অনায়াসে নাচাতে পারে |

পাপিয়ার কানে সবকিছু আসছে! বাপের বাড়ি থেকে ফিরে সুপ্রিয়া নাকি দিনে দিনে দুর্মুখ হয়ে উঠছে, সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে বেশ কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী শুনে এসেছেন – অর্জুনবাবু দেবতুল্য | নীনা তার ভগিনীসম, লোকের নোংরা কথা শুনতে চায় না সুপ্রিয়া | অর্জুনবাবুর হাতে নীনা রাখী বেঁধেছে শুনে আড়ালে বলাবলি চলল, "দিন মে ভাইয়া / রাত মে সাঁইয়া |"

অনেকদিন পর সেদিন পাপিয়ার বাড়িতে এল সুপ্রিয়া | চোখের নীচে কালি, কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে চোখদুটো | খুব অসহায়ভাবে মাথা নীচু করে বলতে থাকল, "ঘর গড়তে চেয়েছিলাম, জানো, পারলাম কই! মা বেঁচে আছেন, তাই নিজেকে শেষ করে দিতেও ভয় করে | নীনাকে বোনের মতো ভালবেসেছিলাম, কী করে পারল আমার ঘরটা ভেঙে দিতে! ওকে তো সব দিয়েছেন ঈশ্বর – প্রেমিক স্বামী, সন্তান সুখ, সব! আমি তো একটু সম্মান আর বিশ্বাস আশা করেছিলাম, ভালবাসাটুকুও কুসুমদির অধিকার ভেবে দাবী করিনি | তবুও ঠকে গেলাম! সন্দীপদা ট্যুরে, আমি লক্ষ্ণৌতে – সেই সুযোগে ওরা মাউন্ট আবু ঘুরে এসেছে একদিনের জন্য | আরও কতশত জায়গায় গেছে কে জানে!

নীনাকে বলতে গিয়েছিলাম, সন্দীপদা বললেন – 'সব মিথ্যে, স্ত্রীর ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে | নীনার সৌন্দর্যে সব পুরুষই পাগল হয়, এসব নতুন কথা নয় | আর মেয়েরা হিংসেতে জ্বলে ফালতু বদনাম করে ওকে | পারলে নিজের ঘর সামলাও!' কী করা উচিত বুঝতে পারছি না; সংসার করার বড় লোভ গো আমার! দোষ তো আমার ঘরের লোকেরই! বুঝছি সব কিছুই, কিন্তু মন বলছে সব মেনে মুখ বুজে থাকাই উচিত, তাই না!

জানো, একবার দীক্ষা নিয়ে আশ্রমে ছিলাম, সেখানেও নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি এককালে! কান্না ছাড়া এই কপালে আর কিছু লিখতে বোধহয় বিধাতা ভুলে গেছেন! এখানে এসে কয়েক বছর সুখের মুখ দেখেছিলাম, একদিনও ঝগড়া হয়নি আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে | এখন যেন আমাকে উনি সহ্যই করতে পারছেন না | গভীর রাতে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে খুব ইচ্ছে হয় গো | উনি কি আর কোনোদিন আমার দিকে ফিরে চাইবেন না? রূপই সব! আমার নাচ, কবিতা, আঁকা – একদিন যেসব ওঁকে মুগ্ধ করত বলতেন, আজ তার কোনোই দাম নেই?"

উত্তর দিতে পারেনি পাপিয়া, জোর করে কাছে বসিয়ে দু'গ্রাস ভাত খাইয়েছে, মাথায় হাত বুলিয়ে একটার পর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছে |

সুপ্রিয়া ঘুমের আগে বিড়বিড় করেছে সমানে – 'তুমি সুখ যদি নাহি পাও... |' ঘুমের মধ্যেও ছোট বাচ্চার মতো কেঁদে উঠেছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

সেদিন বিকেলেই খবর এল হাই-ওয়েতে বিশাল অ্যাক্সিডেন্টের মুখে পড়েছে অর্জুনবাবুর গাড়ি, ড্রাইভার স্পটেই শেষ | এক সপ্তাহ যমে মানুষে টানাটানি চলে আউট অফ ডেঞ্জার যখন ডিক্লেয়ার করলেন মেডিকেল টীম, তখন জানা গেল হুইল-চেয়ার ছাড়া অর্জুন চৌহানের চলাফেরা করা সম্ভব নয় | এই সাতদিন শুধু একবেলা খেয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছে সুপ্রিয়া |

প্রায় মাস খানেক পরে একদিন ছাদের গাছে জল দিতে গিয়ে পাপিয়া দেখে ঝুলায় নিবিড়ভাবে বসে একে অপরের হাতের ওপর হাত রেখে খুব নীচু স্বরে কথা বলছে অর্জুন আর সুপ্রিয়া | পাশে রাখা হুইল-চেয়ারটা |

পাপিয়াকে দেখেই ছুটে এল সুপ্রিয়া – "তোমাকেই ডাকব ভাবছিলাম পাপিয়াদি | জানো, লক্ষ্ণৌ থেকে আনা সেই গাছটায় কত কুঁড়ি এসেছে, দেখবে চলো; আর একটা ফুলও ফুটেছে | ফুলের নামটা ভুলে গেছি গো!"

পাপিয়া হেসে বলে, "ওর নাম তো কান্নাফুল! ঐ গাছের গোড়ায় চোখের জল ঢাললে তবে যে ওতে ফুল ফোটে!"

একটি আষাঢ়ে গল্প

সুশোভন অধিকারী

রাতে ঘুমোবার আগে নতুন এক বদ-অভ্যাস হয়েছে আমার। আগে কোনও একটা বই নিয়ে শুতাম। পড়তে পড়তে চোখে ঘুম চলে আসত। কিন্তু এখন বইয়ের বদলে মোবাইল ফোন। সেখানে একটু ফেসবুক, একটু হোয়াটস্ অ্যাপ, একটু মেসেঞ্জারে চ্যাট, এইসব করতে করতে চোখে ঘুম আসার বদলে ডানা মেলে উড়ে পালিয়ে যায়। নেশাগ্রস্তের মতো শুধু আঙুল নেড়ে যাই ফোনের পর্দায়।

এখন আষাঢ় মাস। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। বৃষ্টির রাতে ঘুমোবার আগে মোবাইল দেখছি বুঁদ হয়ে। এমন সময়ে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে একটা ছবি দেখে আঁতকে উঠলাম। উনি আমার বন্ধু হতে চাইছেন। আরে! ইনি তো মারা গেছেন আজ তিন বছর হতে চলল। জগবন্ধু ঘোষ। ওঁর মৃত্যুতে স্মরণসভা হ'ল। আমি তাতে বক্তব্য রাখলাম। তিনি তো আমার বন্ধুই ছিলেন; ফেসবুকেও বন্ধু ছিলেন। এখন আবার নতুন করে বন্ধুত্ব পাতানো কেন? ভূতেরাও মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন নাকি? আঁতকে উঠলেও খুব একটা ভয় পেলাম না। কেননা জগবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমার খুবই সখ্যতা ছিল। উনি লিখতেন খুব ভাল, বিশেষ করে ভূতের গল্প। ভূতের গল্পে ওঁর লেখা যেন আরো বেশী খুলত। সাহিত্যিক ছিলেন। আর আমিও, একটু আধটু লেখালেখি করতাম আর কি! লেখার সূত্রে আমাদের আলাপ হয়েছিল প্রায় দশ বছর আগে। তখনই তিনি ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মী। আমি বয়সে অবশ্য ওঁর থেকে কিঞ্চিৎ ছোট ছিলাম। তখনও অধ্যাপনা করি। অবসরের খুব বেশী দেরী নেই। আমরা দুজনে একটা পত্রিকাও বের করেছিলাম কিছুদিন। তারপর একদিন তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। রে হ'ল, কেমো হ'ল, তিনি মারাও গেলেন। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা দুজনেই গল্প লিখলেও আমরা একে অপরের লেখাকে প্রশংসা করতে কোনো কার্পণ্য করতাম না। টেকনিক্যাল কিছু ভুল হলে অবশ্যই বলতাম কিন্তু সেটা করতাম গল্পের স্বার্থে। উনি ভূতের গল্প লিখলেও আমি কিন্তু কদাচ ভূতের গল্প লিখতাম না। আমার মনে হতো ভূতের গল্প কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়। তথাপি আমাদের বন্ধুত্বে কোন চিড় ধরেনি।

অতঃপর মৃত জগবন্ধুবাবুর পাঠানো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে প্রথমে একটু দোনামনা করলেও শেষে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দের সৃষ্টি হ'ল – 'টং'। ভূতেদের ইন্টারনেট এত স্ট্রং! অনুরোধ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিলে গেল! খুলে গেছে চ্যাট বক্স। তাতে লেখা পড়েছে – 'হাই, আমার মনে হতো ভূতের গল্প কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়। তথাপি আমাদের বন্ধুত্বে কোন চিড় ধরেনি।' যেন মৃত জগবন্ধুবাবু একটি হাই তুলে জীবন্ত হয়ে গেলেন। আমি চুপ করে রইলাম। তারপরেই আবার লেখা ভেসে উঠল – 'কেমন আছেন?'

বুক কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু কাঁপার কী আছে? আগেই বলেছি তিনি ছিলেন আমার প্রকৃত বন্ধু। শুভানুধ্যায়ী। কোনোরকম শত্রুতা ছিল না। তাহলে জীবিত অবস্থায় একজন ভাল বন্ধু থেকে মৃত অবস্থায় আমার ক্ষতি করতে যাবেন কেন? নাকি ভূতেদের ধর্মই হ'ল অন্যের ঘাড় মটকানো? না না, এ হতেই পারে না। তাহলে কি আমি জগবন্ধুবাবুর ভূতের সঙ্গে বাক্যালাপ চালাব? চুপ করে আছি দেখে আবার লেখা ফুটে উঠল – 'আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে।'

এবার তো কিছু লিখতেই হয়। লিখলাম – 'ভালই আছি। আপনার কথাও আমার মাঝে মাঝে মনে হয়।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল প্রেতের বাক্যস্রোত; 'আপনি ভাল থাকুন, আপনি দীর্ঘজীবী হোন, আমার কথা মনে পড়লে মাঝে মাঝে লিখবেন...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদিকে রাত বারোটা বেজে গেছে। এখনও যদি ভৌতিক লেখা চলতেই থাকে...! আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল। পাশে শুয়ে আছেন আমার গিন্নী তাঁর অচল হাঁটু নিয়ে। পাশ ফিরতে সময় লাগে। তাই ওপাশ ফিরেই তিনি বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন – "একটু ঘুমোতে দেবে, নাকি?"

- "কী করব বলো? মাঝরাতে ভূতে মারে ঢেলা!"

- "ভূতে ঢেলা মারে? মানে?" অত্যন্ত কসরৎ করে দু'মিনিট ধরে তিনি এপাশ ফিরলেন।

- "তোমার জগবন্ধু ঘোষকে মনে আছে?"

- "তোমাদের জগবন্ধুবাবু? যিনি ভূতের গল্প লিখতেন? তিনি তো মারা গেছেন!"
- "হ্যাঁ, মরে তিনি ভূত হয়েছেন।"
- "মানে?"
- "এখন ভূত হয়ে আবার আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন। একই ছবি । একই প্রোফাইল।"
- "বটে!"
- "আর আমিও অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি।"

গিন্নী মনে মনে কী একটা উচ্চারণ করলেন। আমার মনে হ'ল সেটা 'গাধা' হলেও হতে পারে। শব্দটি কর্ণগোচর না হলেও মর্মগোচর হ'ল বৈকি। মুখে বললেন, "দেখো গে যাও ওঁর কোনো আত্মীয় হয়তো ফোনটি ব্যবহার করছেন। ছবিটা পাল্টায়নি।"

- "হ্যাঁ, তাও হতে পারে।"
- "হতে পারে নয়, সেটাই হয়েছে। সারাক্ষণ শুধু ভূতের চিন্তা! তুমি এমন তো ছিলে না আগে! এখন মাথা থেকে ভূত তাড়িয়ে একটু ঘুমোও দিকি...।"

আমি মোবাইল ফোন অফ করলেও ঘুম আসতে চাইল না। জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কোনো ছেলেপুলে ছিল না। আত্মীয়স্বজনও তেমন কাউকে চোখে পড়েনি। মৃত্যুকালেও তেমন কেউ উপস্থিত ছিলেন না, আমাদের মতো কিছু সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব ছাড়া। তবে কি ওঁর স্ত্রী এখন ফোনটি ব্যবহার করছেন? তিনিও তো বয়স্কা। ওঁর দেখাশোনা করার কেউ নেই দেখে ওঁকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো হয়েছিল। আমরাই পাঠিয়েছিলাম; নিত্যানন্দ সরখেল, আমি...। বৃদ্ধাশ্রম থেকেই কি তিনি ফোনটি চালু করেছেন? কারুর সহায়তায়? তাই হবে হয়তো।

পরের দিন রাতে আবার মোবাইলটা চালু করেছি। ফোন অন করতেই টং করে একটা শব্দ। জগবন্ধু ঘোষের চ্যাট বক্স খুলে গেছে। লেখা পড়ল – 'অরিন্দমবাবু, আপনার সৌভাগ্যে আমি অত্যন্ত খুশী। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। বুঝতেই পারছেন আমি ওঁর স্ত্রী সুমিত্রা ঘোষ বলছি।'

- 'বুঝতে পেরেছি বলুন।'
- 'গত মাসে আমার উইডো পেনশন পাইনি। এ মাসেও এখনও ঢোকেনি। কী একটা প্রবলেম হয়েছে। ট্রেজারিতে গিয়ে ক্লিয়ার করতে হবে। এই শরীরে কবে যে যেতে পারব, জানি না। এদিকে এরা পেমেন্টের জন্য তাগাদা দিচ্ছে। কাকে আর বলব? আপনার দয়ার শরীর। আপনাকেই বলি। যদি কুড়ি হাজার টাকা আমাকে জি পে করে দেন তো বাধিত হই। আমি অবশ্যই শোধ দিয়ে দেব।' লেখার শেষে একটা কিউআর কোডের ছবি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইশ..., জগবন্ধুবাবুর স্ত্রীর এমন অবস্থা! নিজের ওপর ধিক্কার হ'ল। আমারই মাঝে মাঝে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। গিন্নী ওপাশ ফিরে শুয়ে আছেন। আমিও অনলাইনে কুড়ি হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম। ঝড়াং করে একটা শব্দ হ'ল। গিন্নী বিরক্ত হলেন –

- "কি, ঘুমোতে দেবে নাকি?"
- "তুমি ঠিকই বলেছিলে। ফোনটা জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী এখন ব্যবহার করেন।"
- "এখন মাঝরাত্তিরে তাঁর সঙ্গে চ্যাট করছ? বুড়ো বয়সে ভীমরতি হ'ল নাকি?"
- "না গো, বড় অর্থকষ্টে আছেন। আমার কাছে কুড়ি হাজার টাকা চাইলেন।"
- "তুমি দিয়ে দিলে? ঝড়াং করে?"
- "দিলাম তো।"
- "গাধা একটা! এবার সশব্দেই বললেন। শিগগির ফোন করো, শিগগির।"
- "এইরে! এখন সুইচড অফ বলছে যে...।"
- "তাহলেই বোঝো। পড়েছ হ্যাকারের পাল্লায়।"

সারারাত ঘুম এল না। পরের দিন ভোর না হতেই ছুটলাম সেই বৃদ্ধাশ্রমে। শুনলাম জগবন্ধু ঘোষের স্ত্রী সুমিত্রা ঘোষ এখানে ছিলেন বটে। তবে আজ থেকে প্রায় ছ'মাস আগে তিনি মারা গেছেন।

- "অ্যাঁ!" হাত পা যেন সেঁধিয়ে গেল আমার পেটের ভেতরে।
- "হ্যাঁ। ওঁর তো সেরকম কেউ আসতেন না। তবে আমাদের খাতায় নিত্যানন্দ সরখেল নামে একজনের নাম লেখা ছিল। তাঁকে খবর পাঠাতে তিনি এসেছিলেন। তিনিই ওঁর ব্যবহার করা কিছু জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন।"
- "নিত্যানন্দ সরখেল? 'ভৌতিক' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক?"
- "সেটা আমরা জানি না।"

বাড়ি ফিরলাম না। ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম থানায়, সাইবার ক্রাইম সেকশনে; অবশ্যই আমার গিন্নীর পরামর্শে। উনি প্রতি মুহূর্তে ফোন করে আমায় নির্দেশ দিচ্ছেন। থানার অফিসার কিন্তু ভাল ব্যবহার করলেন। বললেন, "চেষ্টা করব। এথিক্যাল হ্যাকার যোগাড় করতে হবে। মানে বিষে বিষে বিষক্ষয় আর কি! সময় লাগবে, তবে নিরাশ হবেন না।"

সাতদিন পর টাকা উদ্ধার হ'ল। অর্থাৎ অ্যাকাউন্টে আবার ফিরে এল টাকা। অফিসার ফোন করে বললেন, "নিজের প্রোফাইলটা এবার লক করে রাখবেন অরিন্দমবাবু, এইসব হ্যাকার ভূতেদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।"

রাতে প্রোফাইল লক করতে যাব, এমন সময় একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন।

- "হ্যালো!"
- "পেয়েছেন তো টাকা?"
- "আপনি কে বলছেন?"
- "নিত্যানন্দ সরখেল। মনে পড়ে? বহু বছর আগে আমাদের ভৌতিক পত্রিকার জন্য আপনার কাছে একটা ভূতের গল্প চেয়েছিলাম। আপনি দেননি। বলেছিলেন আপনি ভূতের গল্প নাকি লেখেন না। রাগ হয়েছিল আমার। তার একটা মিষ্টি প্রতিশোধ নেওয়া গেল। এবারের কাহিনীটা নিয়ে অনায়াসে একটা ভূতের গল্প লেখা যায়। লিখে ফেলুন আমি ঠিক নিয়ে আসব। কী ভাবছেন, আমি বেঁচে আছি কিনা! হা হা হা।

ফোনটা কেটে দিলাম। আমার প্রোফাইলটা তো লক করলামই, উপরন্তু নিত্যানন্দ ভূতের নম্বরটাও ব্লক করে দিলাম।

টিভির খবর

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

গাড়ির জানলার হাওয়ায় মেয়েটার মেঘবরণ চুল এলোমেলো হয়ে যায়। ওর চিবুক এলিয়ে থাকে মোমজোছনার মতো ম্যানিকিওর হাতে! মেয়েটার শরীরে এঁটে বসা শশার ফুলের মতো হলুদ রংয়ের টি-শার্ট। আর হাঁটুছেঁড়া জিন্স। ঠিক তখনই বৃষ্টি আসে। বন্ধ বাতায়নের কাচের ফ্রেমে মেয়েটা আটকে পড়ে বন্দিনী ম্যানিকুইনের মতো!

এরকম একটা মেয়ে এখন একটা গ্রামে চলেছে, যা ওর সাথে বেমানান। সে কলকাতার একটা নামজাদা টিভি চ্যানেলের বাজার গরম করে দেওয়া রিপোর্টার কাম অ্যাঙ্কর। গাড়িতে চেপে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সে যাচ্ছে জলঢাকার তীরে। ওখানেই মালতীর বাড়ি। অলিম্পিক্সে হাইজাম্পে সোনা জিতে সবে বাড়ি ফিরেছে মালতী বর্মন। মাটি থেকে আকাশের দিকে সবচেয়ে উঁচুতে লাফ দিয়েছে ওই গেঁয়ো যুবতী। তারই সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছে রিপোর্টার মেয়েটা। তার সঙ্গে যাচ্ছে নেহাতই মলিন পোশাকের একটা ছেলে, ফটোগ্রাফার। তার ছাপোষা চেহারায় উজ্জ্বল শুধু দুটো চোখ। মাটির মতো ধূসর তার গায়ের রং আর একটা শক্ত তেকোনা চিবুক।

খড়ের চাল আর মাটির দেওয়ালের বাড়ির উঠোনে মালতী দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে উদোম গায়ে কয়লার টুকরোর মতো ওর দুই ভাই। আর আধময়লা ফ্রকপরা ওর এক বোন। ওরা রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারকে এক ঘরের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। ঘরে হাঁপানিতে শয্যাশায়ী বাবা আর একলা হাতে সংসার সামলানো মা। ফটোগ্রাফার ছেলেটা ক্যামেরায় লক্ষ ওয়াটের আলো জ্বালিয়ে পিকচার ফ্রেম সাজিয়ে নিল চটপট। তার সামনে একচালার প্রতিমার মতো পোজ দিল মালতীদের মা বাবা আর চার ভাইবোনের সংসার। রিপোর্টার মেয়েটি বলল, "স্মাইল!" ফটোগ্রাফার ছেলেটি দেখল, গরিবের হাসিও মাঝে মধ্যে 'ব্রেকিং নিউজ' হয়ে ওঠে।

এরপর কিছু প্রশ্নোত্তর চলল। বিদঘুটে ডায়ালেক্টের কারণে মালতীদের বেশিরভাগ কথাই বোঝা গেল না। তা হোক,

সপরিবারে সোনার মেয়ের 'বাইট' তো পাওয়া গেছে! ওরা আর আহামরি কী বলবে! মালতী নিজে অবশ্য একটা 'এক্সক্লুসিভ' দিল, "মাকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রী!" খবরটা পাতে পড়তে না পড়তেই বুভুক্ষুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রিপোর্টার মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, "কী কথা হ'ল?"

মায়ের মুখে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ! মা বললেন, "আলোটা নিভভয়ে দেন! দেখতে পাই না!"

সোর্সকে গুড হিউমারে রাখতে হবে | ফটোগ্রাফার ছেলেটা তাই ফ্ল্যাশবাল্বের সামনে একটা ফিল্টার লাগিয়ে দিল!

এবার জবর খবর! প্রধানমন্ত্রী ফোনে বললেন, "আপনার মেয়েকে আমরা চাকরি দেব।"

মালতীর মা বললেন, "তা হবে নিকো | মালতীরে যে লাফান শেখায়, সেই খগেন মাস্টার বইলেছে, কাজকাম করলে চলবেনি | মালতীর আরও আচ্ছা কইরে লাফান শেখা লাগে!"

এরপর মুখ্যমন্ত্রী ফোনে বললেন, "আপনার মেয়েকে আমরা টাকা দেব, হিউজ প্রাইজ মানি।"

মালতীর মা বললেন, "হাতে টাকা দিবেন নাই | টাকায় লোভ বাড়ে | পতন হয় | টাকাটা খগেন মাস্টাররে দিয়া দেন | ওর দুইখান যন্তর কেনা লাগে | ওগলায় মালতীর লাফানের বল বাড়বে!"

একটা খবর করতে এসে আরেকখান ফাউ! রিপোর্টার মেয়েটার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হ'ল, মালতী নয়, অলিম্পিক্সে সোনাটা ও নিজেই পেয়েছে | মালতীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় সে ছেলেটার কাছে জানতে চাইল, "সব ছবি ঠিকঠাক?"

ফটোগ্রাফার ছেলেটা বলল, "কোনো ছবিই তুলিনি!"

- "তার মানে?"

- "মানে, এই মালতীদের কোনো ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা যায় না | মালতীরা বরং বাঁধানো থাক পাহাড়ের পাহারায়; সিনা টান করে দাঁড়িয়ে থাকা শাল সেগুনে | জলঢাকার পাথরকাটা জলছুরিতে।"

হতভম্ব মেয়েটা বারকয়েক 'এফ ইউ, এফ ইউ' বলতে বলতে গাড়ি স্টার্ট দিল, সিধে এয়ারপোর্ট | একলা ছেলেটা এবার আসল ছবি তোলা শুরু করল | খবরের লোকেদের ভাষায় যেগুলি হ'ল 'আঁতেল ছবি'! ওই কোন সুদূরে চা-বাগানের ঢাল | আকাশের গা বেয়ে ঝুম চাষ | পাকদন্ডীর বাঁকে সেই স্বপ্নাতুর মাউথ অর্গান!

সেদিন রাতের প্রাইম টাইমে টিভির পর্দা জুড়ে ফুটে উঠল রিপোর্টার মেয়েটির রূপসী 'হাফবাস্ট'! সোনার মেয়ের সপরিবার সাক্ষাৎকার | অনুষ্ঠানের নাম 'মা মেয়ে মাটি'! ছবি নেই | বদলে একটা সুচারু গ্র্যাফিক্স | একটা নদী | নদীপারে একটা পর্ণকুটির | পিছনে জঙ্গল | একটু ওপরে পাহাড়ের বর্ডার | সর্বোপরি নীলাকাশ | আর এককোণে ঘামেভেজা ভারতের জার্সিপরা মালতী, ভিক্ট্রি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছে! গলায় ঝুলছে সোনার মেডেল | ডানহাতে জড়ানো ভারতের জাতীয় পতাকা | প্রোগ্রাম সুপার ডুপার হিট | সোস্যাল মিডিয়ায় লাইভ | ভাইরাল!

বোকাবাক্সের সাজঘরে শুরু হ'ল নৈশ উল্লাস | কর্তারা সব টি আর পি মাপলে | সাকসেসের গ্র্যাফ উর্ধ্বমুখী, ঠিক মালতী বর্মনের মতো, হাইজাম্পে সোনা! এক গামলা দুধে শুধু এক ফোঁটা চোনা! ছবি নেই! কাজেই মাঝরাতে কর্তৃপক্ষ দুটো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়ে ফেলল | সেই রিপোর্টার মেয়েটার পদোন্নতি হ'ল | আর ফটোগ্রাফার ছেলেটার চাকরি চলে গেল | ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট!

ফেরা

আনন্দিতা চৌধুরী

- **"দে**বশ্রী? দেবশ্রী বলছেন?"
- "হ্যাঁ, কে বলছেন?"
- "আমি... আমার নাম নীলা।"
- "কে?"
- "আমার স্বামীর নাম দেবাশীষ মুখার্জি।"

দেবশ্রী আর সুজয় কোনরকমে নাকে মুখে দুটো গুঁজে এখন অফিসে বেরোবে। টাপুর আর টুপুর স্কুলে যাবে, শেষ মুহূর্তে মনে পড়েছে নতুন খাতা কেনা হয়নি। রান্নার দিদি দেরি করছে আজ আবার; শাশুড়িমা সেই নিয়ে গজর গজর করছেন। শ্বশুরমশাই গজর গজর করছেন খবরের কাগজে দেশের হালচাল দেখে। এই হুদ্দুর যুদ্ধ ছোটাছুটি ব্যস্ততা রোজকার সকালের রুটিন এই বাড়িতে।

দেবশ্রী কিন্তু এইসব আর শুনতেও পাচ্ছে না, দেখতেও পাচ্ছে না, চারপাশটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেছে তার। সুদূর, কোন সুদূরের অতীত থেকে কোন ভুলে যাওয়া সুরে কে যেন ডাক দিচ্ছে তাকে।

ফোনের ওদিকে কাঁপা কাঁপা গলায় মহিলা বলছে, "ও খুব অসুস্থ... ভাবলাম তোমাকে জানাই..."

নার্সিং হোমের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকায় দেবশ্রী। রিসেপশনে নাম বলতে এই ঘরের নম্বরই তো বলল, কিন্তু হাসপাতালের বেডে এ কে!

তাকে দেখে উঠে আসে বেডের পাশে বসে থাকা শ্যামলা ছোটখাটো চেহারার মহিলা।

- "দেবশ্রী? এসো। আমিই ফোন করেছিলাম, আমি নীলা।"

সসংকোচে ঘরে ঢোকে দেবশ্রী। বেড অবধি যেতে যেতে কেমন একটা ভয় যেন ঘিরে ধরে তাকে। কোথায় গেল সেই লম্বা চওড়া চেহারা, টকটকে রঙ! বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া এই শীর্ণ মানুষটিকে যেন সে নিজের স্মৃতির সঙ্গে মেলাতেই পারছে না। অস্ফুটে জানতে চায়, "কী হয়েছে?"

- "বেশ কিছুদিন ধরেই থেকে থেকে জ্বর, ভুল বকা। জ্বরের ঘোরে বারবার তোমার নাম নিচ্ছিল, তাই আমি এর-ওর থেকে খোঁজখবর করে তোমার নম্বর বার করলাম..."

দেবশ্রীর জানতে ইচ্ছে করে, সজাগ অবস্থায় আমার নাম নেয়নি একবারও, তাই না! সুস্থ অবস্থায় আমার কথা মনে আসেনি কখনো! পুরনো রাগটা আবার মাথা চাড়া দিতে চায়। ফোনটা পেয়ে ভাল করে কিছু বুঝে বা ভেবে ওঠার আগেই শাশুড়িমা বললেন, "যাও, তোমার যাওয়া উচিত।"

সুজন বলল, "ওদের আমি স্কুলে ছেড়ে দেব, তুমি যাও, দরকার হলে ডেকো আমায়।"

এখানে এলে যে পুরনো অভিমান, অপমান, দুঃসময়ের স্মৃতি আবার তেড়ে আসবে তার দিকে, তার শান্ত সুস্থিত জীবনটাকে নাড়িয়ে দেবে, সে তা জানত। তাই জন্যই সে ভুলে থেকেছে সেসব দিন। নিজের মানসিক স্থিতি, সংসারের শান্তি বজায় রাখতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এতকাল। নাহলে সামাজিক মাধ্যমে যেমন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে, এদের সঙ্গেও তো রাখতেই পারত, যোগাযোগ না হয়, অন্তত খোঁজটুকু। শতবার মনে হয়েছে, শতবার ভেবেছে নাহ্ থাক; সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

এসব কথা কিছুই বলল না দেবশ্রী। একে বলে কী হবে, এ তো তখন ছিলই না তাদের পরিবারে। আর সামনে শুয়ে থাকা মানুষটা – তার যা অবস্থা, তার ওপর আর রাগ-জ্বালা কী করে দেখাবে! শুধু কি রাগ-জ্বালা, আরো কত কী একে একে মনে পড়ে, যেসব কথা দেবশ্রী জোর করে ভুলে থেকেছিল, নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছিল; আজ এই হাসপাতালের ঘরে বিছানার পাশে বসে সব আবার তার মনে ভিড় করে আসে।

রথের মেলা – দাদার হাত ধরে গিয়েছিল দেবশ্রী; কিন্তু হাত ছাড়িয়ে ছুট লাগিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। ফিরে তাকিয়ে দাদাকে না দেখতে পেয়ে হাপুস নয়নে কেঁদেছে। তাকে ঘিরে জমে যাওয়া ভিড় ঠেলে দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছায়, সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে দাদাকে। তারা বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই খবর পৌঁছায়, তার রাগী বাবার বেদম প্রহারেও দাদা বলে দেয়নি বোনই তার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিল।

ভাইফোঁটার সকাল – বেলা গড়িয়ে যায়, দাদা বেপাত্তা। উপোসে বেহাল দেবশ্রী, রেগেমেগে একশা। অনেক বেলায় এসে পৌঁছায় দাদা। কোন এক দুর্ঘটনায় রাস্তা বন্ধ, হস্টেল থেকে অতদূর পথ হেঁটে হেঁটে ফোঁটা নিতে এসেছে সে।

তাই তার এতদিনের বিশ্বাসের ভিত কাঁপিয়ে তাকে আমূল নাড়িয়ে দেয় বিয়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দাদার প্রতিক্রিয়া | সুজনের সঙ্গে সম্পর্ক তখন ডানা মেলেছে সবে, তাড়া নেই তাদের কারোরই, ধীরেসুস্থে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তার পরের পদক্ষেপ নেবে, এমনটাই ভেবেছে তারা | কীভাবে যেন বাবার কানে খবর পৌঁছায়, ধুন্ধুমার বেঁধে যায় তার পরিবারে | বাবা, মা একটু বিরূপ হতে পারেন তার ধারণা ছিল; কিন্তু তড়িঘড়ি একেবারে অন্য জায়গায় সম্বন্ধ করে তার বিয়ে দিয়ে দিতে চাইবেন, এতটা সে আশঙ্কা করেনি | অসহায় হয়ে ছুটে যায় দাদার কাছে | দাদা – যে আজ অবধি সব বিষয়ে তার পাশে তার বল ভরসা হয়ে ছিল | দাদার নিষ্প্রভ আবেগহীন "বাবাই, মামণির অবাধ্য নাই বা হলি বনু"... বাক্যটুকু তাকে স্তব্ধ করে দেয় |

একবস্ত্রে ঘর ছাড়া, সুজনের হাত ধরে সোজা তাদের বাড়ি – সেখানে সাদর স্বাগতম, তাদের সাহায্য, উৎসাহ ও সমর্থনে পড়া চালানো, চাকরির চেষ্টা, চাকরি পাওয়া, সন্তান – সবই সম্ভব হয়েছে | তারাই হয়ে গেছে তার পরিবার; বাপেরবাড়ি বলে কিছুই নেই দেবশ্রীর | বাচ্চারা জানে তাদের মামাবাড়ি নেই, তারা কখনও দাদু-দিদার বাড়ি যায় না |

আজ হঠাৎ কেন! বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা সম্ভাবনা মনে জাগে | এরা কি তবে অর্থাভাবের কারণে আজ তাকে মনে করল? "চিকিৎসার খরচ-টরচ সব..."

নীলা যেন তার মন পড়তে পারে | একটু হেসে বলে, "ওসব আছে, ওসব নিয়ে কোনো চিন্তা নেই |"

লজ্জা পেয়ে যায় দেবশ্রী | সেটাও যেন বোঝে নীলা |

- "আসলে, গত কিছুদিন ধরেই দেখছি, ও কেমন যেন মনমরা হয়ে রয়েছে | চুপচাপ কীসব ভাবে, বলতে চায় না, কিন্তু আমি বুঝতে পারি, একটা ব্যথা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে মানুষটাকে |"

ব্যথা! ব্যথার কী জানো তোমরা, ভাবে দেবশ্রী | ঘরের মেয়ে নিজের জীবনের একটা সিদ্ধান্ত নিজে নিলে তাকে তোমরা পর করে দাও, তোমরা আমাকে ব্যথার কথা বোলো না |

নীলা বলে চলে, "বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, ও কিন্তু তোমাকে, তোমাদের অনেকবার ডাকতে চেয়েছিল | কিন্তু বাবাই আর মামণির কথার ওপর কিছুতেই ও..."

- "নীলা" বিছানার কাছ থেকে ক্ষীণ স্বর ভেসে আসে |

নীলা তাড়াতাড়ি কাছে যায় |

- "এখন কেমন লাগছে? দেখি, না জ্বর তো আর নেই | আমি একবার নার্সকে ডাকি | এই দেখো... কে এসেছে..."

- "কে? বনু! বনু তুই!"

একটি শব্দ | একটি ডাক | দেবশ্রী ভুলে যায় মাঝের বছরগুলো, এতদিনের অদেখা, অবজ্ঞা, অপমান | সে তখন ফিরে গেছে তাদের সাবেকি বাড়িতে – গ্রীষ্মের দুপুরে মা ঘুমোচ্ছেন, বাবা অফিসে, সে লুকিয়ে আছে টেবিলের নিচে, দাদা খুঁজছে তাকে | প্রতি দুপুরে দাভাইকে নিজের পছন্দের গল্পের বই ছেড়ে বনুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেই হবে |

মা বকেছেন, দুষ্টুমি করার জন্য ঘরে বন্ধ দেবশ্রী | বাইরে থেকে আস্তে ডাকছে দাভাই, জানলা দিয়ে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে আলুকাবলির ঠোঙা |

অঙ্ক পারছে না, দাভাই বোঝাচ্ছে, বারবার – রাগ নেই বিরক্তি নেই |

কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে দেয় দাদা |

- "তুই কী করে খবর পেলি? নীলা দিল? তুই এলি খবর পেয়ে! কতবার ভেবেছি, জানিস! সাহস হয়নি | যা ব্যবহার করেছি আমরা তোর সঙ্গে, তারপর..."

কেশে ওঠে দাদা | দেবশ্রী বলে, "থাক থাক, এখন অত কথা বোলো না দাভাই..."

- "আহ্, কতদিন পরে ডাকটা শুনলাম! কেমন আছিস তুই, কেমন আছে তোর বর? ছেলে, মেয়ে?"

ফোন বার করে ছবি দেখায় দেবশ্রী | "টাপুর, টুপুর! বাহ, বেশ নাম তো! যমজ? তোর মনে আছে বনু, মামণি তোকে শোনাতেন... বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান | আর তুই বলতিস... তিন কন্যে দান কেন? আমাকেও কি তোমরা দান করে দেবে?

দান করেই দিলাম তোকে আমরা, না রে! খোঁজখবরও নিলাম না | হ্যাঁরে, সে বাড়ির মানুষগুলো ভাল তো? ভাল রেখেছে তোকে?"

দেবশ্রী আর পারে না, বলেই ফেলে –

- "বাবা-মা নাহয় পুরনো দিনের লোক, তুমি তো আজকের ছেলে দাভাই | তুমিও জাত দেখে মানুষ বিচার করলে, সুজনকে মেনে নিলে না!"

- "জাত! না না, জাত নিয়ে আমি ভাবিনি তো!"

- "তাহলে তুমি কেন আমার পাশে দাঁড়ালে না দাভাই!"
- "পারিনি রে! বাবাই-মামণির মুখের ওপর কোনোদিন কথা বলতে পারিনি।"
- "কিন্তু কেন? অন্যায় দেখলেও চুপ করে থাকতে হবে সন্তানকে?"
- "আমি যে সন্তান নই। আমি যে আশ্রিত। ভুলে গেছিস?"

মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা, কোন শৈশবে আবছা শোনা, আধাবোঝা, আধা না বোঝা কথা মনে পড়ে দেবশ্রীর। তাদের কোন দুঃস্থ কর্মচারীর অনাথ সন্তানকে নাকি বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন তার বাবা-মা, দেবশ্রী জন্মায় তার আরো বেশ কিছু বছর পরে।

নীলা কখন ঘরে ঢুকেছে কেউ খেয়াল করেনি।

- "আমি আজ দেবশ্রীকে সব বলব, তুমি আমায় বাধা দেবে না। দেবশ্রী, কিছু মনে কোরো না, তোমার বাবা-মা ওকে আশ্রয় দিয়েছেন, বড় করেছেন, পড়াশোনা করিয়েছেন, সবই ঠিক আছে। কিন্তু কোনোদিনও সন্তানের স্থান দেননি, চিরকাল আশ্রিত করে রেখে দিয়েছেন। তোমার হয়ে কথা বলবে কি, ও তো নিজের হয়েই কোনোদিন কিছু বলতে পারেনি।"

চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন সরে যায় দেবশ্রীর। কিছু কিছু খটকা যেন আজ স্পষ্ট হয়ে যায়। সে তো শুনেছে, "কোথা থেকে এসেছ ভুলে যেও না", "ছোটঘরের ধারা যাবে কোথায়, ঠিক বেরিয়ে এসেছে"... দাভাই একটু অবাধ্য হলেই বাবা-মায়ের মুখে এইসব কথা শোনা যেত। কোনোদিনও ভেবে দেখেনি এর কারণ। আহা রে, এসব শুনে কী প্রতিক্রিয়া হতো দাভাইয়ের মনে তখন, কত কষ্ট না জানি পেয়েছে! তাও বনুর প্রতি কোনো ঈর্ষা, কোনো দ্বেষ তো দেখেনি সে কোনোদিন দাভাইয়ের মধ্যে, শুধু পেয়েছে আদর আর স্নেহ।

পূর্বের মলিনতা ধুয়ে পরিষ্কার চোখে দেবশ্রী দেখে আজ দাভাইকে। সহোদর নাই বা হ'ল, কিন্তু আত্মার আত্মীয় সে, শৈশবের সখা, খেলার সাথী।

দু'হাত দিয়ে সসম্মানে আর আন্তরিকতায় দাদা-বৌদির হাত ধরে দেবশ্রী।

- "পুরনো কথা ভুলে আবার নতুন করে শুরু করতে পারি না আমরা, দাভাই?"
- "পারি তো! পারতেই হবে।"

দাদা-বৌদির সঙ্গে রোজ হাসপাতালে দেখা করতে যায় দেবশ্রী। আলাপ হয় দুই পরিবারের। সুস্থ হয়ে একদিন বাড়ি ফেরে দাদা।

- "এবার বাড়ি আয় বনু। আর দূরে দূরে থাকিস না।"

পুজোয় উমা মা ঘরে আসবেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রথম পুজোয় দেবশ্রী বাপেরবাড়ি যাবে। এই প্রথম মামাবাড়ি যাবে টাপুর, টুপুর।

দুই পরিবারের মিলনে আনন্দের ধারা বয়ে চলে।

গোধূলি বেলায়

বীরেশ্বর মিত্র

গোধূলিবেলা, আকাশের রঙ লাল, অনেকক্ষণ ধরে রবীন্দ্র সদন বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে, মিনিবাসে উঠতে পারছি না, এত ভিড়। অফিসের বাসে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত এসেছিলাম, এখন এখান থেকে পাবলিক বাসে বাড়ি যাব। দাঁড়িয়ে আছি প্রায় আধ ঘন্টার ওপর হয়ে গেল।

ভিড় এখন একটু পাতলা হয়েছে । অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিলাম আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন একটি সুন্দরী মহিলা। নিশ্চয়ই বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন, কিন্তু তার কোনও তাগিদ দেখলাম না। হঠাৎ উনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন; এসে মৃদু স্বরে বললেন, "আমি কি আপনাকে একটু সঙ্গ দিতে পারি?"

আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। বেশ ভাল ঘরের মহিলা বলেই মনে হ'ল।

তিনি বললেন, "ঘাবড়াবেন না।"

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "ঠিক আছে চলুন।"

গিয়ে বসলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লনে, বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। আমার ভয় ও সংশয় দুটোই আছে পুরোমাত্রায়। কীভাবে কথা শুরু করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

তিনিই বলতে শুরু করলেন নিজের কথা দিয়ে। নাম বললেন, চন্দ্রিমা। সুন্দর নাম। সুন্দর চেহারা। ভাল সাজতেও জানেন। পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ, সব মিলিয়ে এক অন্য অনুভূতি হচ্ছিল আমার। গড়গড় করে অনেক কথাই বলছিলেন, কিন্তু সবই আমার একান দিয়ে ঢুকে ওকান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না আসলে তিনি আমার কাছে কী চান। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে তিনি তাঁর দিদির বাড়িতে থাকেন এবং তাঁদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। অভাবের সংসার, তাই টাইপিং শিখছেন একটা কাজের আশায়, আর ইতিমধ্যে হাতখরচের জন্য এই পথ বেছে নিয়েছেন। এদিকে মহিলা কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে খুবই সচেতন, আসলে ঠিক দেহ পশারিনি যাকে বলে, ইনি তা নন। টাকার বিনিময়ে শুধু কথা বলে আর সঙ্গ দিয়ে যদি পুরুষদের কিছু আনন্দ দেওয়া যায় সেটাই উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে যে এরকম ব্যাপার-স্যাপার হয় সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি বুঝতেও পারছিলাম না যে কী করব! এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই একটা ছুতোয় উঠে পড়ার চেষ্টা করছিলাম, অথচ ওঁর কথা শুনতেও খারাপ লাগছিল না। আমরা পরস্পরের মোবাইল নম্বর শেয়ার করলাম। এবার আমায় ফিরতেই হবে। কিছু টাকা ওঁর হাতে গুঁজে দেবার চেষ্টা করলাম, নিলেন না।

বললেন, "আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। পয়সার কথা আর তুলবেন না।"

বাস স্টপে এসে ওঁকে বাসে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আবার যোগাযোগ করব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

তারপর থেকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না ওঁকে। বার বার তাঁর কথাই মনে পড়ছে।

একদিন ফোন করলাম, দেখা করতে চাইলাম। দেখা করলাম। তারপর বার বার দেখা হতে লাগল। আপনি থেকে তুমি হ'ল। এরপর আমরা সারা কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় চষে বেড়িয়েছি। কত সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে দেরি হতো। কত মিথ্যেকথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছি মাকে। এ প্রায় হাবুডুবু খাবার জোগাড়। একদিন ওকে বলেই ফেললাম যে এই সঙ্গ দেবার ব্যাপার আমার একেবারেই পছন্দ নয়। বললাম আমার এক বন্ধুর দাদা একজন বিখ্যাত ডাক্তার, তাঁকে বলে তাঁর নার্সিংহোমে নার্সের চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। সে রাজি হ'ল।

শুরু করল নতুন জীবন, আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। হঠাৎ অফিস থেকে আমার ট্র্যান্সফারের খবর এল; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে হবে ব্যাঙ্গালোরে। বস বললেন কেরিয়ারের জন্য এটা নাকি খুব ভাল অফার। বাড়ির সবার সম্মতি নিলাম, বাবা যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। চন্দ্রিমাকে এবার এই কথাটা বলতে হবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আবার সেই ভিক্টোরিয়ার লনে। অনেক ভূমিকা সেরে কথাটা পাড়লাম। শুনে চুপ করে রইল চন্দ্রিমা। জিজ্ঞেস করল, "আমাকে ভালবাসো?"

'না' বলতে পারলাম না।

বলল, "আমাকে বিয়ে করবে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "ঠিক এখনই প্রস্তুত নই।"

ও বলল, "ভালবাসতে পারো কিন্তু দায়িত্ব নিতে এত ভয়?"

হয়তো তাই। কথা দিলাম, যোগাযোগ রাখব।

ব্যাঙ্গালোরে চলে এলাম। ক্রমশ অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। চন্দ্রিমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম, জানি এ বিয়ে একেবারেই সম্ভব নয়; বাড়ি থেকে অনুমতি পাওয়া এক্কেবারে অসম্ভব। আস্তে আস্তে যোগাযোগ কমিয়ে দিলাম। বুদ্ধিমতী মেয়ে; ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, কখনো সে নিয়ে কোনো কথা বলেনি আর।

এদিকে বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল সবাই। একসময় বাড়ির সবার পছন্দমতো সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে আবার ব্যাঙ্গালোরে ফিরলাম।

অনেকগুলো বছর কেটে গেল; চন্দ্রিমাকে ভুলতে পারলাম না। কিন্তু সাহস করে দেখাও করতে পারিনি। একবার ফোন করেছিলাম, শুনলাম নার্সিংহোমের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোন প্রাইভেট ফার্মে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। এর থেকে বেশি আর কোনও খবর পেলাম না।

প্রায় পনেরো বছর পরে, একবার যখন কলকাতায় গেছি, তখন ভাবলাম দেখা করব। কিন্তু তার তো কোনো ঠিকানা আমার কাছে নেই, খবর পাব কোথা থেকে! জেদ চেপে গেল, অনেক খোঁজাখুঁজির পর চন্দ্রিমার বর্তমান ঠিকানা বার করলাম।

গোধূলিবেলা, আকাশের রঙ লাল, প্রথম আলাপের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছিল। বাড়ি খুঁজে বেল টিপলাম অনেক চিন্তা মাথায় নিয়ে। দরজা খুলে দাঁড়াল একটি পনের-ষোল বছরের মেয়ে, বেশ সুন্দরী।

- "মা আছেন?"

কথা শুনে বেরিয়ে এল চন্দ্রিমা, আরও সুন্দরী হয়েছে, দেহ একটু ভারি এখন। আমাকে দেখে অবাক হয়ে ভিতরে এসে বসতে বলল। বুঝলাম অনেক প্রশ্ন, অনুযোগ, অভিমান লুকিয়ে আছে তার মধ্যে। মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল মামার পরিচয় দিয়ে। বলল বিয়ে করেছে ওর অফিসের সহকর্মী, এক তামিলিয়ান ভদ্রলোককে। ডাক দেওয়াতে তিনি এলেন, ভাঙা ভাঙা বাংলায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আবার ভিতরে চলে গেলেন।

এবার চন্দ্রিমার অনেক অভিযোগ, অনুযোগের উত্তর দেবার পালা আমার। দেখতে দেখতে ঘন্টাদুয়েক পার হয়ে গেল, চা জলখাবার খেয়ে উঠব, এমন সময় চন্দ্রিমা মেয়েকে ডাকল। বলল ওর স্বভাব নাকি অনেকটা আমারই মতো, একই রাশি তো! একটু অবাক হলাম। নাম বলল 'মঞ্জরী'।

- "বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো, খুব মিষ্টি!" – বলাতে লজ্জা পেয়ে উঠে চলে গেল মঞ্জরী।

এবার বিদায়ের পালা। চন্দ্রিমার দিকে তাকালাম, দেখলাম তার চোখ ছলছল করছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত বলতে পারল না।

'যোগাযোগ রাখব' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি। সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল রবিঠাকুরের সেই বিখ্যাত কবিতার একটি লাইন –

"রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

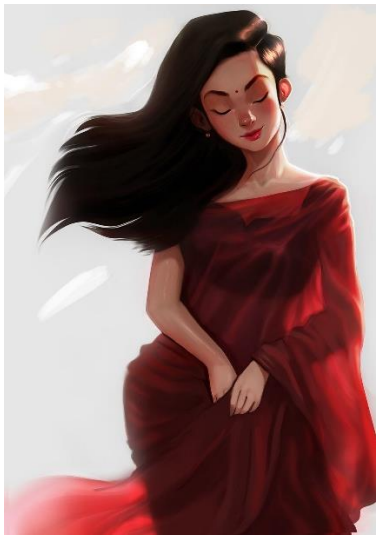

প্রশ্নের তোপ

হুসনে জাহান

সেদিন ইউটিউবে চোখে পড়ল এক ইংরেজির শিক্ষক আমাদের পরিচিত ইংরেজি "Curiosity kills the cat" প্রবাদের মানে বোঝাচ্ছেন তাঁর ছাত্রদের, অতিরিক্ত কৌতূহলের ফলে বিড়াল নিজেই ফাঁদে পড়ে যায় | তাঁর বিশ্লেষণ শুনে আমার মনে এক প্রশ্ন ওঠে, অতিরিক্ত কৌতূহলে বিড়ালের নিজের মৃত্যু হয়, নাকি যার সম্পর্কে সে কৌতূহলী তার বারোটা বাজিয়ে দেয়?

আমার একজন প্রবাসী বান্ধবী রেবার এক অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে এই প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল | সেই সাথে মনে এল যে কারো অধিক কৌতূহলের ফলে মাশুলটা আসলে কাকে পোহাতে হয়?

এক ছোট্ট ছেলের প্রথম বছর পূর্তির পার্টিতে গিয়েছিল রেবা | শিশুটির দিদিমা রেবার সাথে পরিচিত হবার আগ্রহে প্রশ্নের বাণে তাকে বিধ্বস্ত করে তোলেন | তার বিস্তারিত বিবরণ শুনে আর ইউটিউবে প্রবাদের বিশ্লেষণ দেখে আমার এই প্রবাদের নিহিত মানে বোঝার প্রশ্ন জাগল | ইঁদুর যখন ফাঁদে পড়ে তখন নিশ্চয়ই এই প্রবাদ প্রযোজ্য | তবে মানুষের বেলায় অধিক কৌতূহলে কে বিপদে পড়ে, রেবার গল্প শুনে এ প্রশ্নের উত্তর অন্যরূপে অনুমান করা যায় | তাহলে শুনি রেবার সেদিনের অসন্তোষের বিবরণ |

১০ বছর ধরে অনেক চিকিৎসার পর পরীর কোলে ফুটফুটে ছেলে এসেছে | পরীদের বিদেশের সমস্ত বন্ধুবান্ধব সপরিবারে ছেলের প্রথম জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রিত | রেবা এদের চেয়ে বয়সে বেশ খানিকটা বড় এবং এদের দলে মোটেই পড়ে না | এরা সবাই তার ছেলে ও বৌয়ের সমবয়সী | তবে তার প্রতিবেশী নীলা, এদের বান্ধবী | নীলার দুটি ছোট্ট মেয়ের সে হয়েছে বিদেশে পাতানো দিদিমা | তাই নীলার বান্ধবীর ছেলের অনুষ্ঠানে সে তার প্রতিবেশী আন্টিকেও নিয়ে এসেছে | রেবার বয়সী আরো কয়েকজনও আছেন এখানে | পরীর আর সব বন্ধুদের মা-বাবার মতো পরীর মাও ছেলেমেয়েদের কাছে আসা যাওয়া করেন | তিনিও এসময় ছিলেন মেয়ের কাছে |

পরী রেবাকে সাথে নিয়ে পিছনের মাঠে তার মা এবং অন্যান্য মায়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাঁদের কাছেই বসালো | প্রথমে একটু সংকোচ বোধ করলেও রেবার বন্ধুসুলভ ব্যবহারে পরীর মা খুশি হয়ে বেশ মন খুলে আলাপ শুরু করেন | রেবা সম্পর্কে সব খুঁটিনাটি জানার ইচ্ছায় তিনি অবিরাম প্রশ্নে রেবাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেন | তারই বিবরণ রেবা যেভাবে আমার কাছে ব্যক্ত করেছে সেটাই ক্রমিক আকারে সবার সাথে শেয়ার করছি |

প্রথম দফা –

- "আপনি এখানে কার কাছে আছেন?"
- "ছেলের কাছে |"
- "ছেলের কী নাম? কী করে ছেলে?"
- "আজকাল এখানে সবাই যা করে | কম্পিউটারের কাজ |"
- "সে কখন এসেছে এদেশে?"
- "সে এদেশে পড়াশোনা করেছে | তারপর কাজ শুরু করে |"
- "ওদের দেখিনি তো কখনও কোথাও!"
- "না, ওদের বাঙালি গ্রুপের সাথে ওঠাবসা নেই |"
- "শুনেছি আপনার বৌমা আমাদের দেশের মেয়ে নয় |"
- "না, সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মেয়ে |"
- "কোথায় ওদের দেখা হ'ল?"
- "অফিসে |"
- "আপনি বিয়েতে রাজী হলেন?"
- "হলাম | ওর তাকে পছন্দ, ওদের বিদেশের জীবন – আমি বললে শুনবে কেন?"
- "কেন শুনবে না? আপনি দেশের মেয়ে ঠিক করে বলতেন বিয়ে করতে হবে |"
- "সে কি হয় এখন আর? আমাদের দেশি ছেলেমেয়েদের সাথেই এরকম বলা চলে না | এখানে থাকা ছেলের সাথে তো তা একেবারেই সম্ভব নয় | তারপর ছেলে যদি রাগ করে আর বিয়েই না করে তাহলে? সে এক লম্বা-পাতলা-ফর্সা সাদাসিধে মেয়ে পছন্দ করে আমাকে জানিয়েছে এ মেয়ে শরাব ছোঁয় না, সিগারেট খায় না, অন্য পুরুষের সাথে ঘোরাঘুরি করেনি | তারপর কি আমার আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে?
- "আপনাকে ছেলে এসব বলল?"
- "হ্যাঁ |"

এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্নের জেরায় রেবা বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকল। কোনমতে সেখান থেকে উঠে পড়তে পারলে বাঁচে সে। নাহঃ, সে গুড়ে বালি। উঠতে দিলে তো! এত রসাল মুখরোচক গল্পের সবটুকু না শুনেই কি তিনি রেবাকে ছেড়ে দেবেন!

- "আরে, কোথায় যান? বসেন বসেন। এখনো তো জন্মদিনের কেক কাটাই হয়নি। না খেয়ে কী করে যাবেন?" বলে পরীকে ডেকে রেবার জন্য শরবৎ ও খাবার এনে দিতে বলে কিছুক্ষণ থেমে দম নিয়ে পরীর মা আবার তাঁর কৌতূহল নিবারণের প্রয়াসে মন দিলেন।

দ্বিতীয় দফা –

- "আপনার বৌ আমাদের ভাষা বোঝে?"
- "না"
- "শেখেনি?"
- "না।"
- "আপনি শেখাননি?"
- "শিখতে না চাইলে কি শেখানো যায়?"
- "আপনার ছেলে বাংলা জানে?"
- "হ্যাঁ।"
- "আপানার ছেলে বৌকে বাংলা শেখায়নি?"
- "না, ও তো এই বিদেশেই পড়াশোনা করেছে। ইংরেজি ভাল জানে। ওর কোনো অসুবিধা হয় না।"
- "তাহলে আপনার নাতিরা কেউ বাংলা জানে না? আপনি তো দুজনকেই ভাল করে বাংলা শেখাতে পারতেন।"
- "বড় নাতিকে শেখাতে পারিনি। আমি তখন এখানে নিয়মিত থাকিনি। দেশে চাকরির কারণে আমি ওর সাথে বেশি সময় কাটাতে পারিনি। মাঝে মাঝে বেড়াতে এসেছি। তাই বড় নাতিকে বাংলা শেখানোর সুযোগ হয়নি। রিটায়ার করার পর ছোটজনের বেলায় বেশি আসতে পেরেছি। তাই সে আমার কাছে কিছুটা শিখে নিজের শখেই এখন লিখতে, পড়তে ও বলতে পারে মোটামুটি। তাছাড়া সবার তো ভাষা শেখার আগ্রহ থাকে না।"
- "আপনার ছেলের বাসায় তাহলে সবাই ইংরেজিতেই কথা বলে?"
- "হ্যাঁ।"
- "আপনিও তাদের সাথে তাহলে ইংরেজিতেই কথা বলেন?"
- "হ্যাঁ।"
- "আপনি যখন ছেলের সাথে কথা বলেন তখন কি বাংলাতেই বলেন?"
- "(উঃ, কী মুশকিল!) হ্যাঁ, যখন আমরা দুজনে কথা বলি, বাংলাতেই বলি। (বাপরে, আর কতক্ষণ চলবে এই অকারণ জেরা? এবার তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বে। কিন্তু মহিলার কৌতূহলের তো সীমা নেই!)..."

তৃতীয় দফা –

- "আপা, আপনার ছেলের বৌ কোন ধর্মের?"
- "আমাদের দেশে আমাদের ধর্ম মতেই তো বিয়ে হয়েছে।"
- "এখন কি সে আপনার ধর্ম মেনে চলে?"
- "জানি না, আমি সে খবর রাখি না। আমরাই বা ক'জন ধর্ম মেনে সবকিছু করি? তাছাড়া ধর্ম মেনে চললেই কি সবাই ভাল পথে চলতে শেখে? যারা খারাপ কাজ করে, মিথ্যা বলে, মানুষ ঠকায়, অত্যাচার করে, তাদের ধর্ম মেনেই বা কী লাভ?"
- "আপনার নাতিরা কি আপনার ধর্মে চলে?"
- "জানি না। ওদের নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে, ভাল মানুষ হতে শেখানো হয়েছে। ওসবই তো সব ধর্মের মূল কথা। আমার নাতিদের সে সবই শেখানো হয়েছে। বাকিটা আমি জানি না।"

বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেবা অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। পরীর মা একটু থেমে নড়েচড়ে বসলেন। রেবা ভাবল হয়তো তাঁর প্রশ্ন করার পালা এবার শেষ হ'ল। কিন্তু না; দেখা গেল বুক ভরে এক লম্বা নিঃশ্বাস টেনে তিনি তাঁর কৌতূহলের পরবর্তী সেশন চালু করলেন।

চতুর্থ দফা –

- "আপা, আপনার বয়স কত?"

রেবা আর তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না। এই প্রশ্নটা তার মোটেই পছন্দ নয়। আরে, তুমি নিজের বয়সের চিন্তা করো, কোনো সমস্যা থাকলে তাই নিয়ে আলাপ করো, অন্যের বয়স শুনে কী হবে? তাদের জন্য কি আবার পাত্র খুঁজতে হবে নাকি? তাই এবার একটু অপছন্দের সুরেই সে জবাব দিল,

- "কেন, আমার বয়স জেনে কী হবে?"
- "না, আপনাকে দেখে তো মনে হয় না বেশী বয়স হয়েছে! এখনো কেমন সাজগোজ করে চলাফেরা করছেন।"

আচ্ছা, কেমন লাগে এ ধরনের মন্তব্য শুনলে!

- "আমাকে দেখে কি বয়সে আপনার চাইতে ছোট মনে হয় নাকি? আপনার চাইতে আমি বয়সে বড়ই হব।"
- "হ্যাঁ, আপনাকে দেখে মনে হয় নিজেকে ভালই রেখেছেন।"
- "আমার কি শারীরিক সমস্যা নেই নাকি? সাজগোজ করলে মন ভাল থাকে। তাই বোধহয় দেখে বয়স বোঝা যায় না।"
- "আমার তো ষাট পার হয়ে গেছে।"
- "তাহলে তো তোমাকে তুমি করেই বলা যাবে।"

রেবা আলাপের মোড় একটু অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করল যাতে মহিলার জেরা থেকে একটু রেহাই পাওয়া যায়।

- "হ্যাঁ, নিশ্চয়।"
- "ঠিক আছে। আর নাম ধরেও ডাকা যাবে।"
- "হ্যাঁ।"
- "তোমার নাম কী?"
- "সবাই ডাকে সোমা।"

নাঃ, রেবার চেষ্টার গুড়ে বালি! পরীর মায়ের কৌতূহলের ভান্ডার যে বিশাল! আবার প্রশ্নের তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন তিনি।

পঞ্চম দফা –

- "আপনার স্বামী এখন কোথায়?"
- "কয়েক বছর হ'ল মারা গেছেন।"
- "আপনি কবে এখানে এসেছেন?"
- "চার বছর হ'ল। তার আগে মাঝে মাঝে বেড়াতে এসেছি।"
- "আপনার স্বামী কি আমেরিকায় এসেছেন?"
- "উনি তো এদেশেই পড়াশোনা করেছেন।"
- "আপনার স্বামী কী করতেন?"
- "প্রফেসর।"
- "কোথায়?"
- "দেশে-বিদেশে।"

ষষ্ঠ দফা –

- "আপনার ছেলেমেয়ে কজন?"
- "এই তো একটিই।"
- "একটিই ছেলে? আর হয়নি?"
- "না, হয়নি।"
- "হয়নি, না হতে দেননি?"
- "দুটোই।"
- "কীভাবে?"
- "প্রথম সন্তানের জন্মের পর আমরা দুজনেই বিদেশে পড়তে যাই। তারপর আর সুযোগ হয়নি।"

সপ্তম দফা –

- "আপনার বৌ কী ধরনের খাবার খায়?"

আবার বৌয়ের খবর – হায়রে, মহিলার কৌতূহল আজ আর শেষ হবে না!...

- "সবরকমই খায়।"
- "বাসায় কে রাঁধে?"
- "আমিও রাঁধি, সেও রাঁধে।"
- "আপনি কীরকম রাঁধেন?"
- "আমি আমার মতো রাঁধি।"
- "আপনার রান্না বৌ খায়?"
- "হ্যাঁ, খুব পছন্দ করে খায়।"
- "সে আপনার জন্য রান্না করে?"
- "হ্যাঁ, ওর মতো রেঁধে দেয়।"
- "আপনার মতো রান্না সে করতে পারে?"
- "না।"
- "আপনি তাকে শেখান না কেন?"
- "তার শেখবার শখ হলে শেখাব।"
- "আপনি বলেন না কেন শিখতে?"

কী জ্বালাতন রে বাবা! এমন সেকেলে ভাবনা তো আমার মাথাতেই আসে না!

- "ও শিখতে না চাইলে আমি কী করে শেখাব?"
- "আপনি বলবেন শিখতে।"

রেবার মনে হ'ল এরপর ভবিষ্যতে এখানে আসা পুরোপুরিই বন্ধ করতে হবে।

- "না আমি তা বলি না, আর বলতেও পারব না। ওর যদি ভাল না লাগে, কেন মিছিমিছি ওকথা বলতে যাব? যখন যা খেতে ইচ্ছে করে আমি তো এখনো রেঁধে নিতে পারি। আমি কোনো ব্যাপারেই তার সাথে জোরাজুরি করতে চাই না। ঝগড়াঝাঁটি বাঁধাবার ইচ্ছে আমার নেই। নিজেরটা নিজেই যতদিন পারি করে নেওয়া ভাল। মন কষাকষি হলে তো একসাথে থাকা সম্ভব হয় না। কী দরকার অযথা অশান্তি ডেকে আনার!"

কী মুশকিলে যে পড়া গেছে তা কেবল রেবাই বুঝতে পারছে।

অষ্টম দফা –

- "আপনার বৌ কী ধরনের পোশাক পরে?"
- "কেন, এদেশে সবাই যেমন পরে তেমনই।"

এইসব অবান্তর প্রশ্নের কোনও মানে হয়!

- "শাড়ি কিংবা সালোয়ার-কামিজ পরে না?"
- "না, শুধু বিয়ের দিন পরেছিল। সে গহনা পরতেও পছন্দ করে না।"
- "আপনি বলেন না?"
- "না, ঐ যে বললাম, ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কোনো কথাই বলি না। পাকাদেখার সময় যে আংটি পরিয়েছিলাম, সেটাও কোনোদিন ওর আঙুলে দেখিনি। বিয়ের শাড়ি, সালোয়ার স্যুট, গহনা যা দিয়েছিলাম, কোনোদিন তাকে পরতে দেখিনি। ওর ভাল না লাগলে, কী করা যাবে? ওর ছেলেরা ছোটবেলায় আমার সাজগোজ দেখে বলত, আমার মা তো ওসব ব্যবহার করে না, তুমি কেন করো?"
- "আপনি কি বললেন?"
- "বললাম, তোমার মায়ের ওসব ভাল লাগে না, আমার যে ভাল লাগে! তবে একটা কথা ঠিক যে ওর পোশাক আশাক সবসময়ই শালীনতা বজায় রাখে। শরীর দেখানো কাপড়চোপড় সে কখনো পরে না তাতেই আমি সন্তুষ্ট।"

নবম দফা –

- "ঢাকায় আপনার কে আছে?"
- "অনেকেই আছে। তবে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। এক ভাই আছে। খুব অসুস্থ। ওর স্ত্রীর পুরো চার বছর অচলাবস্থার সময় তাকে সুস্থ করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেও সুস্থ করতে না পেরে নিজেই হাত পা ছেড়ে অসুস্থ হয়ে গেল। স্ত্রীকে সঙ্গ দেবার জন্য সারাদিন তার হাত ধরে বসে থাকত। এখন স্ত্রী চলে গেছে, এক ভক্ত বন্ধু এসে তাকে দেখাশোনা করে। নিজের বাসায় নার্সদের সেবায় সে একাই আছে।"
- "ঢাকায় গেলে আপনি কোথায় থাকেন?"
- "আমার ফ্ল্যাট বাসায়।"
- "ওখানে কে থাকে?"
- "কেউ না।"
- "কে দেখাশোনা করে?"
- "একটি ছেলে ছোটবেলা থেকে আমার মায়ের কাছে বড় হয়েছে, সে-ই প্রয়োজনমতো দেখাশোনা আর বাসার তদারকি করে।"
- "বাসাটা রেখেছেন কেন?"
- "কী জানি, যদি কখনো যেতে হয়, তখন থাকব কোথায়?"
- "গাড়ি রাখেন?"
- "হ্যাঁ।"
- "কেন?"
- "আমি গেলে তখন নিজের গাড়িতে যাতায়াত করতে সুবিধে হয়। তাছাড়া, পুরনো ড্রাইভার তো, সে বাসার টুকটাক এটাসেটা মেরামত করা ইত্যাদি করে দিতে পারে। তবে জানি না, আর কতদিন তাকে রাখতে পারব?"
- "গাড়িটা বিক্রি করে দেন। ট্যাক্সিতে চলাফেরা করেন।"
- "আমিও তাই ভাবি। আমার বোনরা বলে এই বয়সে গাড়ি ছাড়া আমার কষ্ট হবে, তাই বিক্রি করতে বারণ করে। কিন্তু এখন ওই ড্রাইভার বেতন বাড়াবার জন্য দাবী করছে। সব ড্রাইভারদেরই এখন অনেক বেতন। বসে থাকলেও সে অন্যের সমান বেতন চায়। কী করি বুঝে পাই না। অবসরকালীন অবস্থায় কোথা থেকে তাকে এত টাকা দিই?"

রেবার আর বসে বসে পরীর মায়ের কৌতূহল নিবারণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু এদের কেউ তো এখন তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবে না। তাই উবার ডেকে ফিরে যাওয়া যায় কিনা চিন্তা করে বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

রেবার কাছে এই গল্প শুনে কৌতূহলী বিড়ালের মৃত্যুর কথা মনে পড়ল। এটুকু বুঝলাম যে ভবিষ্যতে রেবার এ ধরনের পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছেয় ভাঁটা পড়ে গেল। রেবার কাহিনী শুনে ভাবলাম অন্যের সাথে একটু চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে-শুনে কথা বলা ভাল। অপরের সম্বন্ধে জানার কৌতূহল আমাদের সবারই কমবেশি থাকে। কিন্তু সে কৌতূহল যতটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়, ততই সবার মঙ্গল।

এদেশের মানুষের বেশ ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও সখ্যতার পরেও দু'পক্ষই ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় সম্বন্ধে অনবহিত থাকে। সম্ভবতঃ তাতেই দু'পক্ষের সদ্ভাব অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

লালিমার হারজিত

শান্তনু চক্রবর্তী

লালিমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা একটি ছোটখাটো দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেদিন জ্যাকিকে স্কুলে নামাতে এসেছিলাম আমরা দুজন – আমরা অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া আর আমি। অন্বয় হঠাৎ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমার স্ত্রী সুনেত্রা একেবারে ভেঙে পড়েছিল; ওর আর এদেশে থাকার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমাকে তো পেটের দায়ে থাকতে হবে! তাই আমি রয়ে গেলাম আর সুনেত্রা দেশে চলে গেল। সুনেত্রা ফিরে যাওয়ার পর আমি কয়েক মাস একাই ছিলাম, তারপর ভিক্টোরিয়াকে বলি আমার সঙ্গে এসে থাকতে। সে প্রায় ছ-সাত বছর আগের কথা; তখন থেকে ভিক্টোরিয়া রয়েছে আমার সঙ্গে। ইতিমধ্যে আমাদের একটি মেয়ে হয়েছে – ওর নাম জ্যাকলিন ওরফে জ্যাকি। গত জুন মাসে জ্যাকির পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে তাই ওকে ফ্রেডি গঞ্জালেস স্কুলে কিন্ডারে ভর্তি করে দিয়েছি। আর স্কুল শুরু হওয়ার দু'হফতা পরে এই ঘটনা।

গাড়ি পার্ক করে জ্যাকিকে ক্লাস অবধি পৌঁছে দিয়ে ভিক্টোরিয়া গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। আমি জ্যাকির ক্লাস টিচার মিসেস কান্তর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলছিলাম। এই করতে গিয়ে আমার হয়তো বেরোতে মিনিট ৬-৭ দেরী হয়ে গিয়ে থাকবে। এসে দেখি এই কান্ড! ভিক্টোরিয়া অন্য একটি মেয়ের ওপর চেঁচিয়ে চোটপাট করছে আর মেয়েটি অধোবদনা হয়ে নীরবে সব শুনছে। এমনিতেই ২০০ পাউন্ড ওজনের ভিক্টোরিয়া দেখতে বড়সড়, আর ছিপছিপে চেহারার অন্য মেয়েটিকে মনে হচ্ছে ভয়ে জড়সড়। অকথ্য গালিগালাজ বেরুচ্ছে ভিক্টোরিয়ার মুখ দিয়ে, যা আগে কখনো শুনিনি। তবু অন্য মেয়েটি চুপ, নিশ্চয়ই তার দোষ।

আমি ভিক্টোরিয়াকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?" ভিক্টোরিয়া নানান বিশেষণে মেয়েটিকে ভূষিত করে যা বলল, তার মর্মার্থ হ'ল – মেয়েটি একটি বড় ভ্যান রিভার্স করতে গিয়ে আমাদের গাড়িতে লাগিয়েছে। আমার ক্লিনিকে যাওয়ার দেরী আছে বলে ও আমাকে বাড়িতে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে 'বের্নাল ড্রাইভিং স্কুল'-এ যাবে ভেবেছিল। সকাল নটায় একজন অ্যাডাল্ট ড্রাইভারকে ভিক্টোরিয়ার লেসন দেওয়ার কথা। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। ড্রাইভিং স্কুলে ফোন করে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে দিল সে। এরপর পুলিশের জন্য অপেক্ষার পালা। ইতিমধ্যে আমি ভিক্টোরিয়ার গাড়ি ও সেই মেয়েটির গাড়ি দেখে নিয়েছি। কোনো গাড়িতেই খুব বেশী স্ক্র্যাচ পড়েনি। এর জন্য মা-বাপ তুলে গালাগাল দেওয়ার মতো কিছু হয়নি। যাইহোক, যথা সময়ে পুলিশ এসে জিজ্ঞাসাবাদ করল। যেহেতু পার্কিংলটে, তাই পুলিশের কাছ থেকে টিকিটের কোনো ব্যাপার নেই। দেখে মনে হ'ল মেয়েটির বয়স ভিক্টোরিয়ার থেকে বেশী, প্রথমে বুঝতে পারিনি। প্রথমত কোভিডের শেষ পর্যায় হলেও মেয়েটি মাস্ক পরেছিল। আর দ্বিতীয়ত চোখমুখের এই ভয়ভয় ভাবও ওর বয়স অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল। আর যেটা মুখের আদল দেখে মনে হয়েছিল, সেটা সত্যি। মেয়েটি শুধু ইন্ডিয়ান নয়, আমারই মতো বাঙালি। নাম লালিমা সেনগুপ্ত। যখন পুলিশ পেশার কথা জিজ্ঞেস করল, তখন সে জানাল যে সে হাউসওয়াইফ, ওর স্বামী ইউ.টি আর জি.ভি-তে ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। প্রথম দিনের জন্য এইটুকুই। এর বেশী জানা গেল না, কারণ পুলিশ চলে যাওয়ার পর আমরা কেউই আর সেখানে ছিলাম না। লালিমার আগেই ভিক্টোরিয়া আর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে আমি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম লালিমাকে। আর কোথাও দেখা হবার প্রশ্ন নেই। আমাদের বাঙালি কমিউনিটির মাসে এক-দুবার গেট টুগেদার হয়, কিন্তু সেখানে ওকে দেখতে পাই না। যাইহোক, অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের গোড়ায় আর আমি লালিমাকে পরেরবার দেখলাম অক্টোবরের শেষে। সামনে হ্যালোউইন, সব স্কুলে, ক্লাসে নানান অ্যাক্টিভিটি চলছে, জ্যাকিদের ক্লাসেও নিশ্চয়ই চলছে। আজ শুক্রবার, আর পরের সোমবার হ্যালোউইন। আমাদের ক্লিনিকে শুক্রবার বিকেলে কোনো পেশেন্ট দেখা হয় না। তাই শুক্রবারগুলোতে লাঞ্চ সেরে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে আমিই জ্যাকিকে স্কুল থেকে নিয়ে আসি। তাই আজ এসেছিলাম। গাড়ি পার্ক করে স্কুলে ঢুকবার ঠিক আগে চমক। দেখলাম লালিমা আর সঙ্গে চারটি বাচ্চা ছেলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে। কারুরই মাস্ক নেই। সামনের ছেলেদুটি একটু বড় আর পেছনের দুটি একটু ছোট। বাচ্চাগুলো কলকল করে কথা বলতে বলতে আসছে, সব কথাই আসন্ন

হ্যালোউইনকে কেন্দ্র করে | লালিমাই আমাকে দেখে প্রথম চিনতে পেরে কথা বলল | হেসে বলল, "কী ডাক্তারবাবু! চিনতে পারছেন?"

- "নিশ্চয়ই! এরা সব তোমার ছেলে?"

লালিমা একটু লাজুক হেসে বলল, "আর বলবেন না, আমার স্বামী দেবতাটি মেয়ে চেয়েছিলেন ,আর দুবারের চেষ্টায় দুজোড়া যমজ ছেলে জুটল | যাইহোক, আপনাকে আটকাব না | আপনি মেয়েকে নিয়ে আসুন গিয়ে!"

লালিমার কথাবার্তায় আমি আরও হতবাক, মনে হাজারো প্রশ্ন | কিন্তু আপাতত জ্যাকিকে তুলতে হবে, তাই ওদের 'বাই' বলে স্কুলে গিয়ে ঢুকলাম | জ্যাকিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর আজকের অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম | পার্কিংলটে এসে দেখি লালিমা তখনও রয়েছে | বললাম, "তোমরা যাওনি এখনও?" -

- "যাব | ওদের নিয়ে হ্যালোউইনের জন্য কিছু ক্যান্ডি, আর কিছু ডেকোরেটিভ আইটেমস কিনতে হবে | এছাড়া শুক্রবার হলে ওরা বাইরে খাবার আবদার করে | সেজন্যও যেতে হবে | কিন্তু ডাক্তারবাবু, যেজন্য অপেক্ষা করছি, তা হ'ল – আপনার নিজের তো একটি ক্লিনিক আছে, তাই না?"

- "হ্যাঁ, আছে, মুনলাইট পেডিয়াট্রিকস! আগে আমি এলিসা পেডিয়াট্রিকসে ছিলাম, কিন্তু ওদের হালচাল আমার ভাল লাগত না তাই সরে এসেছি |"

- "আমি বাচ্চাদের আপনার ক্লিনিকে নিয়ে যেতে চাই, নেবেন ওদের? সামনে ওদের জন্মদিন; বড় দুজনের ২৮শে নভেম্বর আর ছোট দুজনের ১১ই ডিসেম্বর | আমার ইচ্ছে ওদের ফিজিক্যাল আপনার ওখানেই হোক |"

- "খুব ভাল কথা | নভেম্বরে ওদের নিয়ে এসো | আর ভ্যাকসিন কার্ডগুলোও এনো | কিন্তু, ওদের নামগুলো জানা হ'ল না তো! কোন ক্লাসে পড়ে?"

লালিমা ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল, "এই কিলু-খিলু-চিলু-ছিলু ডাক্তার আঙ্কল নাম জানতে চাইছেন, তোদের নাম বল |" কিলু বলল, "আমার নাম লোহিত সেনগুপ্ত | আমি ক্লাস ফোরে |" খিলু বলল, "আমি ললিত সেনগুপ্ত | আমিও ক্লাস ফোরে |" চিলু বলল, "আমি লেখন সেনগুপ্ত | আমি ক্লাস টুতে!" ছিলু বলল, "আমি লালন সেনগুপ্ত | আমিও ক্লাস টুতে |"

- "বাহ্, ওরা তো বেশ ভাল বাংলা বলে! মায়ের নামের সঙ্গে মিল আছে, সবাই 'এল' দিয়ে | যাইহোক, এই আমার কার্ড | আসবার আগে ফোন করে এসো |"

- "হ্যাঁ, এখন যাই | দেরী হয়ে যাচ্ছে; পরে কথা হবে | নভেম্বর পড়লেই ফোন করব |"

জ্যাকিকে কারসিটে বসিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে লালিমার ছেলেদের মায়াময় মুখগুলো চোখে ভাসছিল | চেহারায় মিল রয়েছে ছেলেগুলোর – মায়ের মতোই শ্যামলা গায়ের রং, তবে মুখের আদলে মিল নেই | মনে হয় বাপের সাথে মিল | খুবই ছটফটে প্রাণোচ্ছল বাচ্চা | ওদের দেখলে মনে স্নেহের সঞ্চার হয় | অন্বয়ও ছোটবেলায় ঠিক এমনটাই ছিল | সবাই ওকে দেখলে আদর করত | আর অন্বয়ও সবার সঙ্গে মিশে যেত | আজ আট বছর হ'ল অন্বয় নেই | বাইশ বছরের তরতাজা ছেলে একটা অ্যাক্সিডেন্টে শেষ হয়ে গেল | এমনিতে ওর ড্রিংক করার অভ্যেস ছিল না; কিন্তু সেদিন ওর প্রিয়বন্ধু জনাথনের জন্মদিনে সবার অনুরোধ ফেলতে পারেনি ও | আর 'ডোন্ট ড্রিংক এন্ড ড্রাইভ' জানা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানপাপীর মতো ফেরার সময় ড্রাইভ করেছে | একটা টেনহুইলারকে ওভারটেক করতে গিয়ে কন্ট্রোল হারিয়ে সব শেষ!

অন্বয় চলে যাবার পর আমরা চার থেকে তিন হয়ে গেলাম; নীপা, সুনেত্রা আর আমি | নীপা তখন সবে হাইস্কুল পাশ করেছে | মা আর মেয়ে দুজনেই বলল, এখানে থেকে অন্বয়ের দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়ানো খুবই কষ্টকর | তাই এক বছরের মধ্যেই ওরা দেশে ফিরে গেল | নীপা ইতিমধ্যে এখানকার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল | কিন্তু ওর মা যখন চাইল, তখন আর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে না করতে পারেনি | ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে আমার আলাপ দশ বছর আগে, যখন সুনেত্রা হঠাৎ ঠিক করেছিল ড্রাইভিং শিখবে | ভিক্টোরিয়া কয়েক মাস চেষ্টা করেছিল, পরে একই ভুল সুনেত্রাকে বারবার করতে দেখে ধৈর্য হারিয়ে হাল ছেড়ে দেয় | সুনেত্রার তাই আর ড্রাইভিং শেখা হয়নি | তবে এই সূত্রে ভিক্টোরিয়া আমাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে গিয়েছিল | সুনেত্রা আর নীপাকে কয়েকবার ও লা প্লাজা মলে শপিং-এ নিয়ে গেছে | আমার সঙ্গেও ভাল বন্ধুত্ব হয়েছিল | মেক্সিকোয় গেলে আমাদের জন্য মেক্সিকান মিষ্টি আনত | কয়েকবার আমার ক্লিনিকে নিজের বোনপোকে দেখাতেও এনেছিল | এসব নানান কারণে আমার ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ভালই

আলাপ ছিল। তাছাড়া প্রথম যখন ভিক্টোরিয়াকে দেখি তখন সে সবে ইউনিভার্সিটি থেকে আন্ডারগ্র্যাড কমপ্লিট করেছে, দেখতেও বেশ ভালই ছিল। এখনকার মতো এতটা মুটিয়ে যায়নি। সেজন্য সুনেত্রা চলে গেলে নিজের একাকীত্ব দূর করবার জন্য আমার ভিক্টোরিয়ার কথাই মনে হয়েছিল। ভিক্টোরিয়ারও তখন সদ্য ব্রেক-আপ হয়েছে। আমার প্রস্তাবে সাড়া দিতে তাই সে দুবার ভাবেনি। আটান্ন বছর বয়সে আমি জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম আটাশ বছর বয়সী তরুণী ভিক্টোরিয়াকে। তবে ওকে বিয়ে করবার কথা আমি ভাবিনি। তা, এই সাত বছরে আমার পাকা চুলের পার্সেন্টেজ ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশ হয়েছে আর ভিক্টোরিয়ার ওজন ১২০ পাউন্ড থেকে বেড়ে হয়েছে ২০০ পাউন্ড। দুটো বৃদ্ধির হারই সমান! সুনেত্রা আর নীপার সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা হয় অল্পস্বল্প। সুনেত্রার মানসিক কষ্ট ওর শরীরে নানান ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। তাই নীপাকে দ্রুত পড়াশুনো শেষ করে মা'র এবং সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। একটি টিউটোরিয়াল হোমে জিআরই আর টোয়েফলের কোচিং করায় নীপা। এতেই মা ও মেয়ের চলে যায়। আমিও যে প্রতি মাসে টাকা পাঠাই না বা পাঠাতে চাই না, তা আদৌ নয়। কিন্তু মা-মেয়ের তাতে কিছু আসে যায় না। আমি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ঘর বাঁধবার পর ওরা অনেকটাই নিস্পৃহ হয়ে গেছে আমার প্রতি। স্বাভাবিক। যাইহোক, এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ভিক্টোরিয়া এ সময় বাড়িতে থাকে না। ওর পরপর ৪-৫ জন টীন ড্রাইভারের লেসন থাকে, ফিরতে ফিরতে সেই আটটা। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে জ্যাকিকে পড়তে বসাই। রিও গ্রান্দে ভ্যালিতে যেরকম আন্ডারপ্রিপেয়ার্ড ছেলেমেয়েদের গল্প শুনতাম অন্বয় আর নীপার কাছে, তাই থেকে আমার মনে সবসময় ভয়। আমি চাই না আমার জ্যাকি এমনটা হোক।

যথা সময়ে নভেম্বর এলে লালিমা ফোন করল। তারপর একদিন স্কুল ছুটির পর ভ্যাকসিন কার্ডসহ বাচ্চাদের নিয়ে চলে এল আমার ক্লিনিকে। আমার এই নতুন ক্লিনিকের কথা বেশী লোকজন জানে না। তাই লালিমারা ছাড়া আর কোনো পেশেন্ট সেদিন ক্লিনিকে ছিল না। অনেক কথাবার্তা হ'ল। আমি লালিমাকে ওর স্বামীর ব্যাপারে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। অ্যাক্সিডেন্টের দিন লালিমা ওর বরের নাম বলেছিল, তবে আমার খেয়াল ছিল না। এবারে জিজ্ঞেস করাতে জানলাম হিল্লোল সেনগুপ্ত। লালিমা বলল, "ওর নাম হিল্লোল, কিন্তু আমি 'হিলু' ডাকি। হিলুর সঙ্গে নাম মিলিয়ে রেখেছি কিলু-খিলু-চিলু-ছিলু। ছেলেদের ভাল নামগুলো অবশ্য হিলুই রেখেছে। আসলে সত্যি বলতে, আমার যেন চারটে নয়, পাঁচটি ছেলে। বলতে গেলে হিলুও একই রকম অবুঝ। কীসে ওর ভাল আর কীসে ওর মন্দ, সেসবের কোনো পরোয়া নেই। সব খেয়াল আমাকেই রাখতে হয়। তবুও কি আর ঠিক পেরে উঠি? একবার ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলে চলে গেলে ওকে আর পায় কে? তখন যদি একবার অঙ্ক করতে বসে যায়, তাহলে আর কোনোদিকে খেয়াল থাকে না। আগে আমি লাঞ্চ নিয়ে যেতাম; কোভিড একটু কমবার পর বলেছে আর আনতে হবে না, লাঞ্চে ও আশেপাশে কোথাও খেয়ে নেবে। আশেপাশে বলতে তো বুঝতেই পারছেন! যত্তোসব জাংক ফুডের ভিড়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তবে একটা জিনিস ঠিক – ওর রিসার্চ নিয়ে কিছু বলবার নেই। পিএইচডি করতে করতেই ওর একটা পেপার হাই কোয়ালিটি জার্নাল, 'অ্যালজেব্রা অ্যান্ড নাম্বার থিওরি'-তে বেরিয়েছিল। তারপর পিএইচডি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর আরেকটা কাজ পাবলিশড্ হয় 'রিসার্চ ইন নাম্বার থিওরি'-তে। সেটাও বেশ ভাল জার্নাল। ওর পিএইচডি শেষ হয় ২০১১-তে, আর সেই বছর অগাস্টে আমাদের বিয়ে হয়। '১২-তে বড় দুটির আর '১৪-তে ছোট দুটির জন্ম। ভালই চলছিল। আই আই টি মুম্বাইতে লেকচারারের চাকরিও পেয়ে গিয়েছিল হিলু। কিন্তু ওর এক গোঁ – এত কোর্স পড়ালে ও রিসার্চটা কখন করবে? তাই '১৬ থেকেই এদেশে আসার চেষ্টা শুরু হ'ল। '১৭-তেই এখানে প্রায় পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে হয়ে ওঠেনি, শেষমেশ পেল '১৮-য়। তখনই আমরা সবাই মিলে এখানে এলাম। আর এসে কি কম ঝামেলা? দুজনের কেউই ড্রাইভিং জানি না। আমি হিলুকে বললাম, তুমি বাপু রিসার্চটাই করো, এইচ-ফোরে তো ড্রাইভিং করায় আপত্তি নেই! আমিই লেসন নিয়ে ড্রাইভিং শিখলাম অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। দু-একবার ফেল করে তারপর পাস্ করলাম। খুবই মামুলি ড্রাইভার আমি। হাইওয়েতে পারি না, তবে গ্রোসারি, বাচ্চাদের আর হিলুকে ড্রপ করা, পিক আপ করা, এসব করতে পারি। আর কী চাই বলুন?"
- "এখানে এসে হিল্লোল খুশী? কাজকর্ম ঠিকঠাক করছে?"

- "হ্যাঁ, মানে, প্রথম দুবছর তো খুবই ভাল কাজ হয়েছে। কোর্স লোড কম ছিল। আরও দুটি পেপার বেশ ভাল দুটো জার্নালে বেরিয়েছে। একটা তো কোভিডের ঠিক আগে পাবলিশড্ হ'ল, আর একটা হ'ল গত বছর '২১-এর অগাস্টে। আমি ওকে বললাম সেটা আমাদের অ্যানিভার্সারি গিফট। অ্যানুয়াল ইভালুয়েশনে লিখতে পারল এটার কথা। কিন্তু সমস্যা কী হ'ল জানেন? থার্ড ইয়ার থেকে টিচিং লোড বেড়ে গেল! যদি একটা গ্র্যান্ট পেত, তাহলে হয়তো টিচিং লোডটা কম রাখা যেত, কিন্তু দুটো গ্র্যান্ট লিখেছিল, একটাও ফান্ডেড্ হয়নি। ওর যখন ক্লাস শেষ হয় তখন যদি ওকে ফোন করি, ওর মেজাজ খাপ্পা হয়ে থাকে। বলে, 'যেসব জিনিস স্কুলে শিখে আসার কথা, সেটাও যদি এরা না জানে, আমি কি ওদের স্কুলের পড়াও পড়াব নাকি! বিশ্বাস করবে না লালি, এদের কারুর কারুর ওয়ান থেকে পয়েন্ট থ্রী সাবট্র্যাক্ট করতেও ক্যালকুলেটর লাগে!' আমি হেসে বলি, খুব তো আমেরিকায় আসার সখ ছিল! এখন এসে এদের পড়াতে কেমন লাগছে? হিলু আর কিছু বলে না, শুধু মাথা ঝাঁকায়। তারপর বলে, 'এখানে রিসার্চ করার অনেক সুযোগ এবং সময় পাওয়া যায়। সেটা ভুলি কী করে?' তা অবশ্য মেনে নিতেই হয়।"

ইতিমধ্যে বাচ্চাগুলোর অ্যালার্জি টেস্ট হয়ে গেল। কারুরই তেমন সিরিয়াস কোনো অ্যালার্জি নেই; এক ওই এখানকার কিছু গাছগাছালি ছাড়া – ওক ট্রি, মেসকিট ট্রি এইসব। ঠিক হ'ল স্কুলে ক্রিস্টমাসের ছুটি পড়লেই লালিমা বাচ্চাদের নিয়ে আসবে ফিজিক্যালের জন্য, সম্ভবত ডিসেম্বরের একুশ-বাইশ তারিখে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এবার কি সোজা বাড়ি?"

- "না, আগে হিলুকে ডিপার্টমেন্ট থেকে আনতে যেতে হবে, তারপর বাড়ি। বাড়িতে পৌঁছেই ডিনার। খাবার দুপুরে বানিয়ে রেখেছি, শুধু গরম করতে হবে। তারপর বাচ্চাদের ঘন্টাখানেক একটু পড়াব। ন'টা বাজলে সোজা বিছানায়। সকালে নিজে ছ'টায় উঠে সাড়ে ছ'টা বাজলে বাচ্চাদের ডেকে তুলতে হয়। চারজনকে তৈরী করতেও সময় লাগে।"

- "তুমি আর হিল্লোলও কি বাচ্চারা শুলে শুয়ে পড়ো?"

- "পাগল? রাত ন'টা তো হিলুর সকাল! ও তখন একটু কফি খাবে, ইন্টারনেটে নিউজ দেখবে, তারপর দশটা বাজলে ডিনার; তাও গিভেন দ্য চয়েস, ও হয়তো এগারোটা-বারোটায় খাবে। আমিও তাই ওর সাথে দেরীতেই খাই। এরপর আমি বেশীক্ষণ জাগতে পারি না। সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হয় তো! হিলু যে ক'টায় ঘুমোবে কেউ বলতে পারে না। ডিনারের পর ওর আবার শুরু হয় রিসার্চ, পড়াশুনো। কোনোদিন টায়ার্ড থাকলে বা মন ভাল না থাকলে বারোটার মধ্যে শুয়ে পড়ে, কিন্তু শরীর-মন ভাল থাকলে রাত দুটো-তিনটে-চারটে কোনো ঠিক নেই! সকালে উঠবে সেই সাড়ে নটা-পৌনে দশটায়। আমি বাচ্চাদের স্কুলে ছেড়ে এসে নিজে ব্রেকফাস্ট করে ওকে তুলি। এগারোটার আগে ওর ক্লাস থাকে না। তাই উঠে চা আর টোস্ট খেয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ ও তৈরী হয়ে নেয়। ওকে ছেড়ে এসে রান্নাবান্না করি। বিকেল ছ'টার আগে ওকে আনতে যেতে হয় না। আজ প্রায় সাতটা হয়ে গেল! ওর অবশ্য মজা, যতক্ষণ ডিপার্টমেন্টে থাকা যায়, ততই শান্তি। ঠিক আছে, চলি!"

লালিমারা চলে গেলে ভাবলাম নিজের স্বামী যাতে ঠিকঠাক টেনিওরটা পেয়ে যায় তার জন্যে কত কষ্ট করে যাচ্ছে মেয়েটা! যা শুনলাম, তাতে তো মনে হ'ল, হিল্লোলকে বাড়িতে কিচ্ছু করতে হয় না। বাচ্চাদের জন্যও কিছু করে বলে তো মনে হ'ল না! লালিমা নিজের কথা বিশেষ কিছু বলে না। ওর পড়াশুনো কদ্দুর, ওর এখানে কিছু করবার প্ল্যান আছে কিনা – এইচ-ফোর ভিসায় তো দিব্যি আছে মনে হ'ল! এখনো গ্রীন কার্ড করায়নি নাকি? কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল, কিন্তু অনেক প্রশ্নের উত্তর অজানাই থেকে গেল। চারটে বাচ্চাকে নিয়ে একজনের আয়ে ওদের চলছে কী করে? ওরা কি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে না বাড়ি কিনেছে? মেয়েদের যে শপিং-এর শখ থাকে, লালিমার সেরকম কিছু আছে বলেও তো মনে হ'ল না। তিনবার সামনাসামনি কথা হওয়া ছাড়া পার্কিংলটে ওকে অনেকবারই দেখেছি, বেশীরভাগ সময় দুজনেরই তাড়া থাকে বলে দূর থেকে হাত নেড়েই চলে গেছি। মনে হয় বড় জোর তিন-চার সেট কাপড়ই ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরতে দেখেছি। তার মানে পরিশ্রমের সঙ্গে স্যাক্রিফাইসও রয়েছে বলতে হয়! আরেকটা জিনিস যেটা বলবার, তা হ'ল আসল যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, সেই হিল্লোলকেই তো আজ অবধি দেখলাম না! এমনকি ছবি পর্যন্ত না! ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের যে ওয়েবসাইট, সেখানে অনেকের ছবি থাকলেও হিল্লোলের ছবি নেই। যে প্রশ্নগুলো মনে রয়েছে, তার মধ্যে একটি বড় প্রশ্নের উত্তর আমি

পেলাম জানুয়ারিতে নিউ অরলিনসে একটা পেডিয়াট্রিক কনফারেন্সে গিয়ে। তার আগে অবশ্য ডিসেম্বর মাসে ছুটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে লালিমা বাচ্চাদের নিয়ে এসে ফিজিক্যাল করিয়ে গেছে। সেদিন বিশেষ কথা হয়নি, কারণ সকালের দিকে এমনিতেই একটু ভিড় থাকে, আর ছুটি পড়ে যাওয়ায় দলে দলে বাচ্চারা এসেছে। ফিজিক্যালের জন্য কিছু গৎবাঁধা প্রশ্ন করতে হয়, সেগুলো করলাম, লালিমা ঠিকঠাক উত্তর দিল। শুধু একটাই এক্সট্রা কথা হ'ল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সামনের সামারে ওদের ইন্ডিয়ায় যাবার প্ল্যান আছে কিনা। লালিমা ম্লান হেসে বলেছিল, "না, নেই। টেনিওর হওয়ার আগে হিলু এসব ভাবতে চায় না।"

এবারে বড় প্রশ্নটির উত্তরে যে বড় চমকটি রয়েছে, তার কথা বলি। সেদিন কনফারেন্সের সেই বিশেষ সেশনটিতে আমার একটি ছোট্ট টক্ ছিল। এবং তারপর আরও অনেকেরই টক্ ছিল। কিন্তু সেশন শেষ হওয়ার পর দেখলাম একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে ইন্ডিয়ানই মনে হ'ল। এসে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "স্যার, আপনি কি এডিনবার্গ থেকে এসেছেন?" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। তখন বলল, "আপনার নামটা কী যেন, স্যার?" আমি বললাম, "আমি ডক্টর অক্রূর চৌধুরী!" তখন ছেলেটি বলল, "নমস্কার, আমি ডক্টর কবীর বিশ্বাস। স্যার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।" ছেলেটির বয়স ৪০-৪২-এর বেশী হবে না। আমি বললাম, "হ্যাঁ, বলুন!" কবীর বলল, "স্যার, আমার এক ক্লাসমেট এডিনবার্গে আছে। ডক্টর লালিমা চ্যাটার্জী। চেনেন?" কয়েক সেকেন্ড লাগল কথাটা হজম করতে। বললাম, "লালিমাকে চিনি। কিন্তু ও তো সেনগুপ্ত!" কবীর বলল, "হ্যাঁ, জানি স্যার। ওটা ওর বিয়ের পরের লাস্ট নেম।" এবারে সত্যিই চমকালাম আমি। একদিনের জন্যও লালিমা আমাকে বুঝতে দেয়নি যে ও ডাক্তার! নীরবে আর পাঁচটা হাউসওয়াইফের মতো ওর দায়িত্ব পালন করে চলেছে দিনের পর দিন! কী হ'ল ওর ডাক্তারির? আমি প্রায় আধ মিনিট বাদে কথা বললাম, "ও তাহলে লালিমা তোমার ক্লাসমেট? ও তো এখন ডাক্তারি করছে না!" কবীর ম্লান হেসে বলল, "হ্যাঁ, জানি স্যার, দেখবেন ওর ছবি?" বলে ও ওর ফোন বার করে, ফেসবুক খুলে একটা ছবি দেখাল। বলল, "স্যার, এটা আট বছর আগের ছবি। একটা কনফারেন্সের, পন্ডিচেরীতে। টু থাউজ্যান্ড ফিফটিন।" দেখলাম লালিমা, কবীর আর গোটা চার-পাঁচজন একই বয়সের ছেলেমেয়ে। লালিমাকে একইরকম দেখতে, শুধু চেহারায় আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি, যা এখন নেই। আমি ফোনটা কবীরকে ফেরৎ দিলাম। আমার হতবাক মুখের দিকে তাকিয়ে কবীর বলল, "আমার কথা ওকে বলবেন স্যার! চলি।" কবীর চলে যাওয়ার পরও আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সেখান থেকে বেরিয়েছিলাম। সত্যিই, বেশ বড় চমক, যা আমার একটা বড় প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছিল।

এডিনবার্গে ফেরার পর লালিমার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তিন-চারদিনের মধ্যেই সুযোগ এসে গেল। জ্যাকিকে স্কুলে ছেড়ে আমি পার্কিংলটে পৌঁছাতেই দেখলাম লালিমা বেরিয়ে আসছে। আমি ওকে থামালাম। লালিমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। আমি কাছে গিয়ে বললাম, "একটা কথা বলবার ছিল। তুমি কি একজন ডাক্তার?"

লালিমা 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছু না বলে একবার ফোনে সময় দেখে নিয়ে বলল, "আপনার সময় হবে?"

আমি ভেবে দেখলাম, আজ মঙ্গলবার। আজ সকালে যাওয়ার তাড়া নেই। নতুন একজন নার্স প্র্যাক্টিশনারকে রেখেছি। একটু দেরী হলেও চলবে। আমি লালিমাকে 'হ্যাঁ' বলায় ও বলল, "আজ হিলুর সাড়ে বারোটায় ক্লাস। দেরী আছে। চলুন তাহলে কফি জোনে।"

- "সেটা কোথায়?"

- "ওটা ম্যাকোলে, ফ্রেডি আর সুগারের মাঝখানে। নর্থওয়ার্ডস যাবার পথে ডানদিকে পড়বে।"

আমি গুগল ম্যাপ ভরে নিলাম। তারপর লালিমাকে আগে যেতে দিয়ে ওর পিছু পিছু বেরোলাম স্কুল থেকে। কী বলবে লালিমা!

কফি জোনে দু কাপ কফি আর দু প্লেট স্যান্ডউইচ নিয়ে মুখোমুখি বসে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ কাটল। তারপর লালিমা বলতে শুরু করল, "সেটা ২০০৮ সাল। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর হবে। আমার বাবা রিজার্ভ ব্যাংকে চাকরি করতেন, মুম্বাইতে পোস্টেড্। আমিও তখন ডাক্তারী পাস্ করে এম ডি করব ভেবে প্রিপেয়ার করছি আর দুবছর ধরে একটা ক্লিনিকে রোজ সকালে দশটা থেকে একটা অবধি বসছি। একদিন একটি লম্বা ছিপছিপে ছেলে সদ্য টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে পিএইচডি-তে ঢুকেছে, এল আমার কাছে। ভাইরাল ফিভার

হয়ে গলা বসে গেছে | আমি ওকে দেখলাম, ওষুধ দিলাম | আবার তিনদিন বাদে ফলোআপে আসতে বললাম | ও এল | আমার বলা সব কথা দেখলাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে | এরপর কারণে অকারণে প্রায়ই আসত | কোনোদিন ওর পিঠে টান ধরেছে, কোনোদিন হয়তো বা ফল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে গেছে, কোনোদিন বা পড়ে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে | আমি তখনই বুঝলাম ডালমে কুছ কালা হ্যায়! তারপর একদিন চেপে ধরলে বলেই ফেলল, 'আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি ডাক্তার ম্যাডাম!' আমার যে ওকে খারাপ লাগত, তা নয়! ভালই লাগত | তবে ভাবলাম আমার থেকে তিন বছরের ছোট একজনকে বিয়ে করব সেটা আমাদের ফ্যামিলি কীভাবে নেবে! পরে দেখলাম সেটা কোনো সমস্যাই হ'ল না | আমি শুধু বললাম, আগে পিএইচডি-টা শেষ করে নাও | তাই ২০১১-য় পিএইচডি কমপ্লিট হতেই বিয়ে | ভালই চলছিল | মুম্বাইতেই দুজনে কেরিয়ার করব ঠিক ছিল | কিন্তু ওই যে বললাম ২০১৬ থেকে ওর মাথায় ভূত চাপল বাইরে আসবে | ওর তো সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, টেনিওর ট্র্যাক পেয়ে গেল | কিন্তু আমার পক্ষে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ইউনাইটেড স্টেটস মেডিক্যাল লাইসেন্সিং এক্স্যাম দেওয়া, তারপর রেসিডেন্সী করা সম্ভব হতো না | তাই ভাবলাম আগে হিলু টেনিওরটা পেয়ে যাক, আমি ততদিন বাচ্চাদের দেখি | এরপর ও টেনিওর পেয়ে গেলে যদি বাচ্চাদের একটু সময় দেয় আর ভগবানের ইচ্ছে থাকে তখন এসব করা যাবে | তাই আপাতত আমি এক'শ ভাগ হাউসওয়াইফ!" বলে থামল লালিমা, একটু হাসল | তারপর বলল, "সেজন্য আমি হিলুকে একদম ডিস্টার্ব করতে চাই না | ও যেমনটা করতে চায়, তেমনটা ওকে করতে দিই | যতটা রিসার্চ করতে চায়, ততটা সময় ওকে দিই | রিসার্চ নিয়ে চিন্তা নেই, চিন্তা হ'ল টিচিং | ওর পড়াতে ভাল লাগে না আর স্টুডেন্টরাও ওর ওপর খুশী নয় | ইভ্যালুয়েশনও তাই খুব ভাল বলা যায় না | কয়েকবার নাকি স্টুডেন্টরা কমপ্লেনও করেছে! আশাকরি সব ভালয় ভালয় উৎরে যাবে | এই লড়াইটা আমাকে জিততেই হবে |"

আমি সব শুনলাম, বুঝলাম লালিমার একাগ্রতা কতটা | এজন্যই এত পরিশ্রম, এত স্যাক্রিফাইস! হিল্লোল নিশ্চয়ই ধন্য ওকে পেয়ে | উঠি উঠি করছি, এমন সময় লালিমা বলল, "ডাক্তারবাবু, একদিন আপনার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে চলে আসুন না আমাদের বাড়িতে | হিলুর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব |"

- "নিশ্চয়ই যাব" বলে বেরিয়ে পড়লাম |

বাড়ি যেতে যেতে আমি ভাবছিলাম আমেরিকায় এরকম অনেকে আছে, যারা নিজের স্পাউসকে দাঁড় করানোর জন্য স্যাক্রিফাইস করে যায় | শুধু স্ত্রীরাই নয়, স্বামীরাও | আমি ২০০৩ সালে রিও গ্রান্দে ভ্যালিতে আসবার আগে নিউ ইয়র্কে ছিলাম | তখন এরকম অনেক দেশী পরিবার চোখে পড়েছিল | এখানে এসেও যে এমন দেখব, ভাবিনি | আর যেহেতু লালিমার ছেলেদের চিকিৎসা করি, তাই লালিমাকে আরও কাছ থেকে দেখতে পেলাম | সেজন্যই ব্যাপারটা একটু বেশী নাড়া দিল | আশাকরি ঈশ্বরের কৃপায় লালিমার ইচ্ছেপূরণ হবে | লালিমা বলেছিল ওদের বাড়িতে যেতে, যাতে হিল্লোলের সঙ্গে আলাপ হয় | 'যাচ্ছি যাব' করে আমি আর গিয়ে উঠতে পারছিলাম না | শেষমেশ একদিন ট্রেন্টন এইচইবি গ্রোসারি স্টোরে হিল্লোলের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল | শুধু হিল্লোল নয়, সারা পরিবার | বাচ্চাগুলোর মধ্যে ছোট দুটি বসেছে কার্টে আর বড় দুটি কার্ট ঠেলছে | হিল্লোল-লালিমা পেছন পেছন | লালিমা হেসে বলল, "ডাক্তারবাবু, আপনার খুব ইচ্ছে ছিল না হিল্লোলের সঙ্গে আলাপ করবার? দেখে নিন ভাল করে! আজ জোর করে বার করে এনেছি | স্প্রিং ব্রেক না হলে বোধহয় সেটা সম্ভব হতো না!" হিল্লোল বলল, "তাছাড়া অন্য উপলক্ষ্যটাও বলো |" লালিমা বলল, "তুমি বলো |" হিল্লোল বলল, "আজ ওর জন্মদিন |"

- "তাই? হ্যাপি বার্থডে লালিমা!"

- "হ্যাঁ, আজ থেকে আমি ৪১ বছরের বুড়ি | আর এর সামনের মাসে ৩৮ পূর্ণ হবে, তার আগেই এত্তো বুড়ো |"

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম হিল্লোলকে | সত্যিই তো, কে বলবে ও লালিমার থেকে বয়সে ছোট! লালিমা বলেছিল ২০০৮ সালের লম্বা ছিপছিপে তরুণটির কথা | কিন্তু লালিমার পাশে এ তো লম্বা-চওড়া এক দশাসই দানব! মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি! লালিমা কৌতুকের সঙ্গে বলল, "কী বুঝছেন ডাক্তারবাবু?"

আমি বললাম, "চোখের পাওয়ার কত তোমার? আর চুল-দাড়ি সব পেকে গেল কী করে?" তাই শুনে হিল্লোল হাসতে শুরু করল | আর লালিমা বলল, "দিনরাত যার বইয়ে বা কম্পিউটারে

চোখ, তার তো এরকম চশমা হবেই! আর সিগারেট খেয়ে চুল-দাড়ি সব অকালে পাকিয়ে ফেলেছে।" এই বলে লালিমা হাত উঁচু করে হিল্লোলের চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলল, "এই মাথায় যত রাজ্যের অঙ্ক কিলবিল করছে আর –" বলে মাথা থেকে হাত সরিয়ে হিল্লোলের ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে, "এখানে যত সব বার্গার, পিৎজা, আর কোক" বলে আবার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "এখানে অঙ্ক", তারপর আবার ভুঁড়িতে হাত দিয়ে "এখানে কোক" বলে যেই আবার মাথায় হাত দিতে গেছে, অমনি হিল্লোল লালিমার হাতদুটো ধরে ফেলে ওকে বুকে টেনে নিল। তারপর বলল, "জানেন ডাক্তারবাবু, মাঝে মাঝে আমি ভাবি কে বেশী চঞ্চল? মা না ছেলেরা?"

আমি ওদের অন্তরঙ্গ হতে দেখে ভদ্রতাবশতই চোখ সরিয়ে ফেলেছিলাম, তাই বলতে পারলাম, "এই মুহূর্তে বোধহয় ছেলেরা; ওই দেখুন!"

দেখা গেল কিলু-খিলু কার্ট ঠেলে চিলু-ছিলুকে নিয়ে দুধের রেফ্রিজারেটর, ডিমের শেলফ, জল-টল পেরিয়ে চিকেন শেল্ফের কাছে চলে গেছে আর আমরা তখনও দুধের রেফ্রিজারেটরের কাছে দাঁড়িয়ে। লালিমা "একী!" বলে হিল্লোলের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল। হিল্লোল বলল, "সত্যি ডাক্তারবাবু, ও আছে বলে আমি বেঁচে গেছি। নাহলে আমেরিকায় এখন টেনিওর পাওয়া সহজ নয়!" তারপর লালিমার মতোই বলল, "একদিন চলে আসুন না আমাদের বাড়িতে!" আমি "নিশ্চয়ই আসব" বলে বিদায় জানালাম।

এরপর একদিন হিল্লোল-লালিমার বাড়ি গেলাম। একাই গেলাম। সত্যিই বেশ বড় বাড়ি। তিনটে বড় বড় বেডরুম। একটাতে ওরা দুজন, একটাতে কিলু-খিলু আর একটাতে চিলু-ছিলু। কথা অবশ্য ড্রয়িংরুমে বসেই হ'ল। একার চাকরিতে এত বড় বাড়ি মেন্টেন করা বেশ কষ্ট। টেনিওর পাওয়ার আগেই অনেকে এরকম বাড়ি কিনে নেয়। কিছু ক্ষেত্রে এসব অনেক সময় রিস্কি হয়ে যায়, তবে লালিমার কাছে হিল্লোলের কাজকর্মের যে বর্ণনা শুনেছি, তাতে তো মনে হয় হিল্লোলের জন্য টেনিওরটা কোনো সমস্যা নয়। এত বড় বাড়ির মর্টগেজ তো অনেক! তার ওপর গাড়ির ইএমআই, ইনসিওরেন্স, অত বড় বাড়ির ইলেকট্রিক বিল, জলের বিল সবই বেশি হবে। টাকা-পয়সার সমস্যা নিয়েই বেশীরভাগ সময় কথা হ'ল। তবে সুখের বিষয় পাঁচ বছর শেষ হয়ে এসেছে। সেপ্টেম্বর পড়লেই হিল্লোল টেনিওরের জন্য অ্যাপ্লাই করবে।

এর অল্পদিনের মধ্যেই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ রিও গ্রান্দে ভ্যালির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হ'ল এডিনবার্গ সিটি হলে। সেদিন আবার হিল্লোল-লালিমার সঙ্গে দেখা হ'ল। জানলাম হিল্লোলের আরো দুটো পেপার পাবলিশ হয়েছে 'জার্নাল অফ নাম্বার থিওরী'-তে। লালিমা আর হিল্লোলকেই শুধু দেখতে পেলাম। শুনলাম বাচ্চারাও নাকি বেশ কয়েকটি কোরাসে অংশ নেবে, ওরা স্টেজের পেছনে রয়েছে। দুজনকেই ভাল দেখতে লাগছিল। আজ লালিমাকে প্রথম শাড়িতে দেখলাম আর হিল্লোলও চুলদাড়ি ছেঁটে আসায় দেখতে ভদ্রস্থ লাগছে। বোঝা গেল টেনিওর নিয়ে বোধহয় লালিমার লড়াইয়ের দিন শেষ হতে চলেছে। কিন্তু আমার তখনও অনেককিছু জানবার-বুঝবার বাকি ছিল। হিল্লোলের কথাটা মনে পড়ল – আজকাল টেনিওর পাওয়া সহজ নয়!

নতুন অ্যাকাডেমিক ইয়ার শুরু হওয়ার পর প্রথম প্রথম কয়েকবার দেখা হয়েছিল লালিমার সাথে। মাঝখানে অনেকদিন ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। তারপর নভেম্বরের ১৫/১৬ তারিখে হঠাৎ একদিন দেখলাম হিল্লোল বাচ্চাদের নিতে এসেছে। কবে ড্রাইভিং শিখল ও?

আমি কাছে গিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি বাচ্চাদেরে নিতে এসেছ?"

- "হ্যাঁ, এই সামারেই ড্রাইভিং শিখলাম। লালিমা শেখাল।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে বলল, "ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে কথা ছিল, ইউনিভার্সিটিতে একটু আসতে পারবেন?"

- "এখন?"

- "না, এখন না। আগে বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে আসি। এই ধরুন আধঘন্টা বা পয়তাল্লিশ মিনিট পর।"

- "কাল সকালে গেলে হয় না? এখন তো মেয়েকে নিয়ে বাড়ি যাব।"

- "ঠিক আছে। সকাল দশটায় আসতে পারবেন? আমাকে ফোন করে দিলে আমি নীচে থাকব।"

- "ঠিক আছে।" কী বলবে হিল্লোল? কোনো সমস্যা? লালিমা কোথায়? ও কেন আসছে না? মনে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে জ্যাকিকে নিয়ে রওনা হলাম।

বহুদিন পরে এলাম ম্যাথ বিল্ডিং-এ | শেষ এসেছিলাম যখন নীপা এক বছর পড়েছিল এখানে, তখন | তখন বোধহয় সদ্য ইউটিপিএ থেকে ইউটিআরজিভি হয়েছে | এরপর কেটে গেছে এতগুলো বছর | হিল্লোল লিফ্টের কাছে অপেক্ষা করছিল; আমি পৌঁছালে দুজনে লিফ্টে ঢুকলাম | লিফ্ট থেকে বেরনো অবধি হিল্লোল কোনো কথা বলল না | তারপর আমারা হিল্লোলের ঘরের সামনে এলাম | হিল্লোল দরজা খুলতে খুলতে বলল, "আমি যখন প্রথম এলাম, তখন আমাকে কেউ বলেছিল এই রুমে আগে যে ছিল তার নাকি টেনিওর হয়নি | এখন মনে হচ্ছে আমিও সেই ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে চলেছি |"

কথাটা শুনে বুকটা ধ্বক করে উঠল | ওর মুখোমুখি বসে বললাম, "কেন, কী হয়েছে?"

এরপর হিল্লোল যা বলল তা শুনতে শুনতে আমার উত্তেজনার পারা চড়তে শুরু করল | হিল্লোল বলল, "ডাক্তারবাবু, আমার টিচিং বরাবরই এদের বিচারে খারাপ | এখানকার গরুদের পড়ানোর জন্য কীসব নাকি টেকনিক আছে আমার সেভাবেই পড়ানো উচিত | আমি তো সেসব জানি না! সেজন্য আমার টিচিং ইভালুয়েশন বরাবরই খারাপ | খুব ভাল যদি কখনো হয় তো ৭০% | নাহলে ৫৫% থেকে ৬০%-এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে | লালিমা বোধহয় আপনাকে বলেছে যে আমার নামে স্টুডেন্ট কমপ্লেনও হয়েছে | সেসব আমি জানি; কিন্তু রিসার্চে আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না | চারটে পাবলিকেশনের একটা কিউ ওয়ান আর তিনটে কিউ টু জার্নালে | আর সবকটার সিঙ্গল অথর আমি | ক'জনের এরকম হয়? এরা বলছে আমার নাকি পাঁচ বছরে অন্তত পাঁচটা পেপার বার করা উচিত ছিল | বলেছিলাম আমার পেপারের কোয়ালিটি দেখতে হবে তো! তখন এরা বলে আমি কি ডিপার্টমেন্টের প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া পড়িনি নাকি? আমি ভাবতাম সিরিয়াসলি কাজ করলে ওসব ক্রাইটেরিয়া-ফাইটেরিয়ার দরকার হয় না! এখন দেখি এরা আমাকে রিসার্চেও মেরে রেখে দিচ্ছে | আরে, যারা অ্যাপ্লায়েড ম্যাথ করে, ওদের তো উঠতে বসতে পেপার হয়ে যায় | আর এক একটা পেপারে তিনটে চারটে করে অথর | সব আমার জানা আছে; তাদের সঙ্গে আমার তুলনা করলে হয়?"

আমি বললাম, "তাহলে?"

- "স্কুল কমিটি ও স্কুল ডিরেক্টর তো নেগেটিভ রিমার্ক লিখেছে, ডিনও সেটাকে ওভাররুল করেনি | এখন একমাত্র ভরসা প্রভোস্ট | প্রভোস্ট যদি ওভাররুল করে তো কিছু হতে পারে!"

আমি বললাম, "লালিমা কী বলছে?"

- "এখনও ওকে বলিনি | আমার টেনিওর হবে ধরে নিয়ে ও আনন্দের সঙ্গে নিজের পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছে | সে ইউএসএমএলই পরীক্ষা দিতে চায় | তাই আমি এখন বাচ্চাদের আনা-নেওয়া করছি | আমি ওকে এখনো কিছু বলিনি |"

- "প্রভোস্ট লেভেলে চান্স আছে?"

হিল্লোল নার্ভাস হেসে বলল, "কী জানি, কী করে বলব?"

বললাম, "তার মানে চান্স আছে | এখন ওকে কিছু বলো না | প্রভোস্টের ডিসিশন কবে আসবে?"

- "ফেব্রুয়ারীতে |" আমি বললাম, "তাহলে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দেখে নাও | তারপর বলো | শেষ পর্যন্ত বলতে তো হবেই!"

- "থ্যাংক ইউ; এইজন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম |"

এরপর থ্যাংক্সগিভিং, ক্রিস্টমাস, নিউ ইয়ারের ছুটি – এই করেই আরো দুমাস কেটে গেল | এর মধ্যে হিল্লোলই এসে বাচ্চাদের ফিজিক্যাল করিয়ে গেল | এরপর স্প্রিং সেমেস্টার শুরু হ'ল | আমি মনে মনে ভাবলাম এইবার অপেক্ষার পালা শেষ হবে | প্রভোস্ট জানাবেন | জ্যাকিকে স্কুল থেকে পিক আপ করতে গেলে মাঝে মাঝে হিল্লোলের সঙ্গে দেখা হতে লাগল | তারপর ফেব্রুয়ারী পড়লে একদিন হিল্লোলকে জিজ্ঞেস করায় ও বলল, "আর দুদিনের মধ্যে জানব |" এর পরে প্রায় পনেরো দিন আমি আর হিল্লোলকে দেখতে পাইনি | ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে একদিন ওই আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল | আমি দেখলাম ওর চোখেমুখে ভীষণ অস্থিরতা | বলল, "ডাক্তারবাবু, লালিমাকে আপনি বাঁচান | ও খাওয়াদাওয়া, ঘুম সব ছেড়ে দিয়েছে | সারাদিন বিছানায় থাকে আর কাঁদে | আপনি আজই চলুন আমাদের বাড়ি |"

আমিও শুনে স্তম্ভিত | এত পরিশ্রম আর স্যাক্রিফাইসের শেষে এই পরিণতি? মন খুব খারাপ হয়ে গেল | দেখলাম আজ যখন শুক্রবার, যাওয়াই যায় | বললাম, "ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও | আমি আধঘন্টা পরে যাচ্ছি |"

আমাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে হিল্লোল ভেতরে গিয়ে লালিমাকে ডাকল, "এসো, ডাক্তারবাবু এসেছেন |" লালিমা কয়েকবার 'না না' করে অবশেষে এল | লালিমাকে দেখে সত্যিই চমকে যেতে

হয়! কী চেহারা হয়েছে ওর! মুখের হাড়-টাড় দেখা যাচ্ছে। দু চোখের তলায় এতটা কালি! আমি বললাম, "এ কী অবস্থা তোমার, লালিমা? চোখের তলায় কালি!" লালিমা ম্লান হেসে বলল, "ডাক্তারবাবু, অনেক আশা ছিল। সব আশায় জল পড়ে গেছে। এভরিথিং ইজ ফিনিশড্!" আমি বললাম, "এইভাবে বলো না। দেখো না, অন্য জায়গায় গেলে হয়তো হিল্লোলের ভালই হবে। হয়তো ছেলেরা আরও ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে।" লালিমা বলল, "অনেক আশা নিয়ে পড়াশুনো শুরু করেছিলাম। আমার এখন সব উৎসাহই চলে গেছে।"

আমি বললাম, "পড়াশুনো বন্ধ করবার তো কারণ দেখি না। হিল্লোল ওর মতো রিসার্চ করবে, তুমিও তোমার মতো পড়বে। দুজনে মিলে বাচ্চাদের দেখবে। দেখবে সব হবে।"

লালিমা কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল। মনে হ'ল ওর শরীরের সব শক্তি শেষ।

চলে যাবার আগে আমি আবার বললাম, "যা বললাম মনে রেখো, দেখো, সব ঠিক হবে।"

দেখতে দেখতে মে মাস এসে গেল। জ্যাকির স্কুল শেষ। মাঝে মাঝে হিল্লোলের সাথে দেখা হলে লালিমার কথা জিজ্ঞেস করেছি। হিল্লোল বলল একইরকম – এই ভাল তো এই খারাপ। এদিকে দেশ থেকে খবর এল যে সম্পত্তি ভাগাভাগি হবে। মা মারা গেছেন গত বছর, আমি যেতে পারিনি। কিন্তু এখন কোর্টে হাজিরা দেবার জন্য যেতেই হবে। প্রায় আঠারো বছর আগে শেষবার দেশে গিয়েছিলাম। ঈশ্বরের কাছে হিল্লোল-লালিমা আর তাদের ছেলেদের জন্য প্রার্থনা করে দেশে যাবার প্লেন ধরলাম। ভিক্টোরিয়া জ্যাকিকে নিয়ে এডিনবার্গেই থাকবে, ওর আর ইন্ডিয়ায় গিয়ে কাজ নেই।

ইন্ডিয়ায় গিয়ে দেখলাম সবকিছুই কমপ্লিকেটেড্; যে কোনো জিনিসের জন্য বড় বড় ফর্ম ভরা আর অনেক মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হবে। দুমাস দেখতে দেখতে কেটে গেল। এসবের মধ্যে সুনেত্রা আর নীপার সঙ্গে ভালভাবে সময় কাটাতে পারিনি। সুনেত্রা বাপের বাড়িতে, আর আমাকে নিজেদের পৈতৃক ভিটেতেই থাকতে হচ্ছিল। অবশেষে অনেকবার কোর্টে ছোটাছুটি, অনেক খরচাপাতি, আর অনেক বহুমূল্য সময় নষ্ট করার পর সম্পত্তি হস্তান্তর হ'ল। সেসব কাজ সেরে আমেরিকায় ফিরলাম।

দেখতে দেখতে টু-তে উঠল জ্যাকি। মাঝখান থেকে লালিমাদের কী হ'ল সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে। ওদের বাড়িতে যাব-যাব করছি, এমন সময় একদিন দারুণ চমক।

ছেলেদের নিয়ে বহুদিন পর আমার ক্লিনিকে এল লালিমা। অনেকদিন বাদে ওকে ফ্রেশ লাগছে। চোখেমুখে খুশীর দীপ্তি। আর সবচেয়ে যেটা চোখে পড়বার, তা হ'ল ছেলেদের আর লালিমার পরনে একই পোশাক – রয়্যাল ব্লু পোলো শার্ট আর খাকি প্যান্ট। লালিমা হেসে বলল, "এখানে থাকলে চিলু-ছিলু এবারে ক্যান্টারবেরিতে পড়ত। ওরা গিফ্টেড্ অ্যান্ড ট্যালেন্টেড্ প্রোগ্রামে পেয়ে গিয়েছিল। ক্যান্টারবেরিতে পড়া না হলেও সেখানকার ইউনিফর্মটা যাতে পরতে পারে তাই কিনে দিলাম। কিলু-খিলুর জন্যও একই ইউনিফর্ম কিনলাম। আর নিজেও এবারে ছাত্রী হব। পড়াশুনো করব, পরীক্ষা দেব, তাই নিজের জন্যও কিনলাম।"

অবাক হয়ে বললাম, "তোমরা চলে যাচ্ছ?"

লালিমা বলল, "হ্যাঁ, হিলু টেক্সাস এ অ্যান্ড এম-এ লেকচারার-শিপ পেয়ে গেছে। আমি ওকে বলেছি এবারে আর স্টুডেন্টদের গরু বলে সরিয়ে রেখো না। ভাল করে পড়িও। কারণ এখন টিচিংটাই তোমার আসল কাজ। মেনেছে আমার কথা।"

- "আর তোমাদের ভিসা?"

লালিমা অবাক হেসে বলল, "ও আপনি জানেন না? আপনি তো দেশে চলে গেলেন আর আমাদেরও গ্রীন কার্ড হয়ে গেল। হিলু সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ার টিকিট কাটল। বলল, 'অনেক কষ্ট করেছি, আর না।' ইন্ডিয়ায় গিয়ে কিছুদিন বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর খেলাম। শরীর পুরো ঝরঝরে, যাকিছু অসুস্থতা সব গায়েব! চোখের কালি উধাও। প্রচুর এনার্জি নিয়ে ফিরেছি ডাক্তারবাবু। আরও পাঁচ বছর এই এনার্জির জোরে ফাইট করতে পারব। হিল্লোলের সামার ক্লাস আছে। তাই আসতে পারেনি। পরে এসে দেখা করে যাবে। আপাতত চলি। বিয়াল্লিশ বছর বয়সটা নতুন করে পড়াশুনো শুরু করবার জন্য খুব বেশী নয়, তাই না, ডাক্তারবাবু?"

আমি হাসলাম, বললাম, "সব হবে।"

ওরা চলে গেল। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, লালিমা হারল না জিতল ওর লড়াইয়ে? আপনাদের কী মনে হয়?

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪৩১ (2024)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word**-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030-2802
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর পনেরো দিন আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ
শারদীয়া
শুভেচ্ছা